১২

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের
শহীদ স্মারক

# ২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

দ্বাদশ খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

বাংলাদেশ

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

# ২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

দ্বাদশ খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

বুলেটের
রাজনীতি
চলবে
না
LIA
LONG LIVE

# দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা

জুলাই-২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

সম্পদ ও সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ প্রিয় বাংলাদেশ বিগত সাড়ে ১৫ বছরেরও বেশি সময় ফ্যাসিবাদী শাসনের নিপীড়নে জর্জরিত ছিল। দুঃসহ এই পরিস্থিতি থেকে জাতিকে মুক্ত করে জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এ ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান। এ অভ্যত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। আন্দোলন স্তব্ধ করতে নির্বিচারে গুলি চালানোর আদেশ দেন ফ্যাসিস্ট সরকারের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই জেরে শত শত ছাত্র ও নানা পেশার মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১০ হাজারের বেশি মানুষ কোনো না কোনো অঙ্গহানির শিকার হয়েছেন। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে কোনো সরকারের এভাবে নির্বিচারে হত্যাকান্ড ঘটানোর দৃষ্টান্ত যেমন নজিরবিহীন, তেমনি ফ্যাসিবাদ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা যে সাহসী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে এমন কোনো নজির বিশ্বে বিরল। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্র-জনতার এই অবিশ্বাস্য ত্যাগ ও কুরবানিগুলো তথ্য আকারে সংগ্রহে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

এই বাস্তবতায়, জুলাই-আগষ্ট মাসের গণঅভ্যুত্থানে দেশের বিভিন্ন জেলায় শাহাদত বরণকারী ভাই-বোনদের তথ্য নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র উদ্যোগে প্রথম পর্যায়ে দশ খন্ড ও দ্বিতীয় পর্যায়ে একাদশ ও দ্বাদশ খন্ডে "দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা" শীর্ষক এই স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, প্রয়োজনীয় ডিজাইনসহ সম্পাদনা করেছেন এবং ছাপার কাজ সম্পন্ন করেছেন, তাদের সকলের পরিশ্রম ও সময়দান আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন।

সময়কে ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে আমরা কিছুটা তাড়াহুড়ো করেই কাজটি করেছি। তাই মুদ্রণ সংক্রান্ত ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরবর্তী সংস্করণে আপনাদের পরামর্শ ও মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযোজিত হবে। এখানে আরো একটি সীমাবদ্ধতাও প্রসঙ্গত স্বীকার করা প্রয়োজন। আমরা যখন পুস্তকাকারে এই বইটি প্রকাশ করছি, তখনও জুলাই বিপ্লবের শহীদের তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। যারা আহত ছিলেন তাদের অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করায় তারা আহতের তালিকা থেকে এখন শহীদের তালিকায় চলে আসছেন। এ তালিকা সামনের দিনে আরো দীর্ঘ হবে বলে আমাদের আশংকা। কেননা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেশ কিছু আহতের অবস্থা এখনো আশংকাজনক। তাই আগামীতেও বইটির কলেবর ও তথ্য স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত হতে পারে।

দেশকে ফ্যাসিবাদের কালো থাবা থেকে মুক্ত করার জন্য; দেশের মানুষগুলোকে মুক্ত পরিবেশে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করলেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। যারা আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আল্লাহ তাদের দ্রুত সুস্থতা দান করুন। আমিন।

বাংলাদেশ
জামায়াতে ইসলামী

# আমীরে জামায়াতের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ বিগত প্রায় দুই দশক ধরে আইনের শাসন, সুশাসন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সাথে প্রতারণা করে একটি সমঝোতার নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসে ২০০৮ সালে। এরপর থেকেই তারা পরিকল্পিতভাবে দেশকে বিরাজনীতিকরণ ও বিরোধীমতশূণ্য করার অপপ্রয়াস শুরু করে।

বিগত ১৫ বছরের আওয়ামী দুঃশাসনে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে অসহনীয় নির্যাতন করে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, রিমান্ডের নামে অত্যাচার, ক্রসফায়ার, বিতর্কিত বিচারের মাধ্যমে বিরোধী নেতাদের হত্যা, গুম, খুন, আয়নাঘর, অপহরণ, বাক স্বাধীনতা হরণ, সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া, বিরোধী দলগুলোর অফিস অবরুদ্ধ করা, রাষ্ট্রীয়ভাবে নাগরিকদের কোণঠাসা করা কিংবা আইন সংশোধন করে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে বিচারের মুখোমুখি করার মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশ জুড়ে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি তৈরি করে রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি, আলেম-ওলামাসহ সমাজের শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর চরিত্রহনন, দেশকে একদলীয় কায়দায় শাসন, বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার, দেশের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস বা দুর্বল করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ এই অন্যায্য কর্মকান্ডগুলো বাস্তবায়ন করেছে। এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ অন্য সব বিরোধী দল সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় জামায়াতের শীর্ষ ১১ নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।

তিনটি প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে জোরপূর্বক ক্ষমতা ধরে রেখেছে। নিজেদের দুর্নীতি ও অনাচার আড়াল করার জন্য ক্ষমতা ধরে রাখার কোনো বিকল্পও তাদের সামনে ছিল না। আর সে কারণেই জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেও তারা কার্পণ্য করেনি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেই বিডিআর বিদ্রোহের নামে দেশপ্রেমিক ৫৭ জন সেনা অফিসারকে হত্যা করেছিল। ট্রাইবুনালে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে রায়কে কেন্দ্র করে জনঅসন্তোষ দমাতে সারা দেশে গুলি করে একই দিনে দুশোরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের ওপর আওয়ামী সরকার গণহত্যা চালিয়েছিল। এর বাইরে পুরো ১৫ বছর জুড়ে নিয়মিতভাবেই দেশজুড়ে তাদের হত্যা, অপহরণ ও ক্রসফায়ার চলমান ছিল।

দেশের মানুষ আওয়ামী অনাচারের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বারবার। কিন্তু আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে জনগণের সেই স্বতঃস্ফুর্ত আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছে। এভাবেই সময়ের চাকার আবর্তনে ২০২৪

সাল আমাদের মাঝে উপনীত হয়। এ বছরের একদম ২০২৪-এর শুরুর দিকে আওয়ামী লীগ বিতর্কিত ডামি নির্বাচন সম্পন্ন করে চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসে। তারা ধরেই নিয়েছিল স্বঘোষিত ভিশন অনুযায়ী ২০৪১ সাল পর্যন্ত এভাবেই তারা মসনদে থেকে যাবে।

কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন। প্রাথমিক অবস্থায় সরকারি চাকুরিতে কোটা পদ্ধতির সংস্কারের দাবিতেই শুরু হয়েছিল এ আন্দোলন। কিন্তু সরকার বরাবরের মতোই দমন পীড়নের মাধ্যমে এই আন্দোলনটিও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। তারা ছাত্রলীগের গুন্ডাদের দিয়ে ক্যাম্পাসগুলো থেকে আন্দোলনকারীদের বিতাড়িত করে। আর পুলিশ, র‍্যাব ও আইন শৃংখলা বাহিনী দিয়ে নির্বিচারে আন্দোলনরত ছাত্রজনতার ওপর গুলি বর্ষণ করে। এতে শতশত মানুষ নিহত হয় আর আহত হয় ২৫ হাজারের বেশি মানুষ। অঙ্গহানি হয় ১০ হাজারের বেশি মানুষের।

এত রক্ত, এত লাশ এই জনপদ কোনো আন্দোলনের ইতিহাসে আর দেখেনি। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে একটি সরকার যেভাবে গুলি করেছে, নির্যাতন করেছে, লাশ পুড়িয়ে আলামত গায়েব করেছে তেমনটা অনেক যুদ্ধাক্রান্ত দেশেও দেখা যায় না। শেখ হাসিনার সরাসরি হুকুমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো দলীয় কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে নির্যাতন অব্যাহত রাখে এবং "দেখামাত্র গুলি" নীতি প্রয়োগ করতে থাকে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকারদলীয় মিডিয়াগুলো এই অমানবিক কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি আড়াল করে যায়। সরকারের পোষ্য এ মিডিয়াগুলো বরং সরকারি বয়ানের আলোকে কথিত স্থাপনা ধ্বংসের ছবি ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে মায়াকান্না দেখায়। ফলে, এই জুলুম ও জুলুমের ভিকটিমদের দুর্বিষহ নির্যাতনের বিবরণীগুলো মূলধারার অনেক মিডিয়াতেই পাওয়া যায়নি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই কেবল এই ফুটেজ ও বর্বরতার দৃশ্যগুলো মানুষ দেখার সুযোগ পেয়েছে। যদিও দফায় দফায় ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের মাধ্যমে সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপরও খড়গ চাপিয়ে দিয়েছিল।

এই বাস্তবতায় জুলাই বিপ্লবের শহীদ ও আহতদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমরা একটি সংকলন বের করার সিদ্ধান্ত নেই। যেহেতু এসব তথ্য ও ছবি অনেক গণমাধ্যমই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এড়িয়ে গিয়েছে, তাই আমাদেরকে পৃথক টিম ও দল তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রেরণ করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এরপরও সাংগঠনিক দিকনির্দেশনার আলোকে আমাদের নেতাকর্মীরা সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এবং কষ্ট সহ্য করে ৩৬ জুলাই'র আত্মত্যাগের ঘটনাগুলো পুস্তকবন্দী করার উদ্যোগ নিয়েছে। সমগ্র বিশ্বকে এই আওয়ামী সরকারের শেষ সময়ের এই হত্যাকান্ড ও জুলুম সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে অবহিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এ সংকলনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে মুদ্রণ সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সময় ও সুযোগের অপর্যাপ্ততার কারণে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত করাও সম্ভব হয়নি। আশা করি, এই বইয়ের মধ্য দিয়ে সংকলিত বিষয়গুলো জানার পাশাপাশি শহীদ, আহত-পঙ্গু, নির্যাতিত ও কারারুদ্ধ ভাই-বোনদের এবং তাদের পরিবারের কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলেই এগিয়ে আসবেন।

আল্লাহ আমাদের সমস্ত নেক আমল ও দোয়া কবুল করুন। আমাদের ছাত্র-ছাত্রী ও জনতার কুরবানিকে আল্লাহ কবুল করুন। এত ত্যাগের বিনিময়ে যে দুঃশাসন বিদায় নিয়েছে, তা যেন আবার ভিন্ন কোনো মোড়কে ফিরে না আসে। সকলে একতাবদ্ধ থেকে যেন আমরা দেশ ও জাতিকে সব ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করতে পারি। এত ত্যাগের বিনিময়ে আসা 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' সফল ও স্বার্থক হোক। আমিন।

**ডা. শফিকুর রহমান**
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

# সূচিপত্র


| ক্রমিক | নাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| | **১২তম খন্ড** | |
| ৭৬৩ | শহীদ মো: জাহিদুল হাসান | ০৭-১০ |
| ৭৬৪ | শহীদ মো: হৃদয় | ১১-১৪ |
| ৭৬৫ | শহীদ মো: মনিরুল ইসলাম | ১৫-২০ |
| ৭৬৬ | শহীদ মো: আব্দুন নুর | ২১-২৫ |
| ৭৬৭ | শহীদ মো: সালাউদ্দিন সুমন | ২৬-৩০ |
| ৭৬৮ | শহীদ মো: রানা তালুকদার | ৩১-৩৫ |
| ৭৬৯ | শহীদ মো: আব্দুল্লাহ সিদ্দিক | ৩৬-৪২ |
| ৭৭০ | শহীদ মো: সাফকাত সামির | ৪৩-৪৬ |
| ৭৭১ | শহীদ মো: লেবু শেখ | ৪৭-৫১ |
| ৭৭২ | শহীদ মো: মনিরুল ইসলাম অপু | ৫২-৫৬ |
| ৭৭৩ | শহীদ মো: নয়ন | ৫৭-৬১ |
| ৭৭৪ | শহীদ মো: নাজমুল কাজী | ৬২-৬৬ |
| ৭৭৫ | শহীদ সাইফুল ইসলাম শান্ত | ৬৭-৭০ |
| ৭৭৬ | শহীদ মো: রেজাউল করিম | ৭১-৭৪ |
| ৭৭৭ | শহীদ মো: রায়হান | ৭৫-৭৮ |
| ৭৭৮ | শহীদ মো: সাইদুল ইসলাম ইয়াসিন | ৭৯-৮২ |
| ৭৭৯ | শহীদ রথিন বিশ্বাস | ৮৩-৮৫ |
| ৭৮০ | শহীদ মো: হাসান | ৮৬-৯০ |
| ৭৮১ | শহীদ মো: সোহান শাহ | ৯১-৯৪ |
| ৭৮২ | শহীদ মো: আসিফ | ৯৫-৯৯ |
| ৭৮৩ | শহীদ মো: হাছান মিয়া | ১০০-১০২ |
| ৭৮৪ | শহীদ মো: ইসমাইল মোল্লা | ১০৩-১০৬ |
| ৭৮৫ | শহীদ হৃদয় মিয়া | ১০৭-১১০ |
| ৭৮৬ | শহীদ মো: বিপ্লব | ১১১-১১৩ |
| ৭৮৭ | শহীদ মো: শাহজাহান মিয়া | ১১৪-১১৮ |
| ৭৮৮ | শহীদ মো: আবুল বাশার | ১১৯-১২২ |
| ৭৮৯ | শহীদ মো: রিয়াজুল ইসলাম | ১২৩-১২৬ |
| ৭৯০ | শহীদ মো: হাসান | ১২৭-১৩৩ |
| ৭৯১ | শহীদ রকিবুল ইসলাম | ১৩৪-১৩৮ |
| ৭৯২ | শহীদ মহিউদ্দিন | ১৩৯-১৪২ |
| ৭৯৩ | শহীদ জাহিদ-এ-রহীম | ১৪৩-১৪৮ |
| ৭৯৪ | শহীদ মো: ইমরান হোসেন | ১৪৯-১৫২ |
| ৭৯৫ | শহীদ মো: সাইফ আরাফাত শরীফ | ১৫৩-১৫৬ |
| ৭৯৬ | শহীদ মো: কামরুজ্জামান | ১৫৭-১৬০ |
| ৭৯৭ | শহীদ মায়া ইসলাম | ১৬১-১৬৪ |
| ৭৯৮ | শহীদ মো: হৃদয় | ১৬৫-১৭২ |
| ৭৯৯ | শহীদ রাইফা | ১৭৩-১৭৭ |
| ৮০০ | শহীদ মো: রমজান মিয়া জীবন | ১৭৮-১৮১ |

বিভাগ ভিত্তিক শহীদের তালিকা
ঢাকা সিটি-১৪৪
সিলেট বিভাগ-৩৪
ঢাকা বিভাগ-১৬১
রাজশাহী বিভাগ-৫৫
বরিশাল বিভাগ-৮৭
খুলনা বিভাগ-৬৫
চট্টগ্রাম বিভাগ-১১৭
রংপুর বিভাগ-৫৫
ময়মনসিংহ বিভাগ-৮২
মোট : ৮০০
০৫ পঞ্চগড়
০৪ ঠাকুরগাঁও
০৪ নিলফামারী
১০ লালমনিরহাট
০৪ কুড়িগ্রাম
০৯ দিনাজপুর
১৭ রংপুর
রংপুর ৫৫
গাইবান্ধা
০৪ জয়পুরহাট
০৭ নওগাঁ
১৫ বগুড়া
০১ চাঁপাইনবাবগঞ্জ
রাজশাহী ৫৫
০২ রাজশাহী
০৮ নাটোর
১০ সিরাজগঞ্জ
০৭ পাবনা
১৮ শেরপুর
১৬ জামালপুর
৮২ ময়মনসিংহ
১২ নেত্রকোনা
৩৫ ময়মনসিংহ
০১ সুনামগঞ্জ
সিলেট ৩৪
১৫ সিলেট
১৬ হবিগঞ্জ
০১ মৌলভীবাজার
১১ টাঙ্গাইল
১০ কিশোরগঞ্জ
২৫ গাজীপুর
১৬১ ঢাকা
১৯ নরসিংদী
৩১ ঢাকা জেলা
০৩ মানিকগঞ্জ
০১ রাজবাড়ী
২১ নারায়ণগঞ্জ
১৪৪ ঢাকা সিটি
০৭ ফরিদপুর
১০ মুন্সিগঞ্জ
০৬ শরীয়তপুর
১১ মাদারীপুর
০৫ গোপালগঞ্জ
১২ কুষ্টিয়া
মেহেরপুর
০২ চুয়াডাঙ্গা
০২ ঝিনাইদহ
০৮ মাগুরা
২৬ যশোর
নড়াইল
খুলনা ৬৫
০৪ সাতক্ষীরা
০৬ খুলনা
০৪ বাগেরহাট
২৩ বরিশাল
০৪ পিরোজপুর
বরিশাল ৮৭
২৫ ভোলা
০৫ ঝালকাঠি
২২ পটুয়াখালী
০৮ বরগুনা
০৭ ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৩০ কুমিল্লা
২০ চাঁদপুর
০৮ লক্ষ্মীপুর
২৩ নোয়াখালী
১২ ফেনী
০১ খাগড়াছড়ি
রাঙ্গামাটি
১৩ চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম ১১৭
বান্দরবন
কক্সবাজার

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

# ২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

# বিদ্যুৎ ছোঁয়া শরীরে বিপ্লব ছুঁয়ে দিল -শহীদ মোঃ জাহিদুল হাসান

**শহীদ মোঃ জাহিদুল হাসান**

ক্রমিক : ৭৬৩

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৭৮

### শহীদ পরিচিতি

জন্ম তার ২০০৮ সালের ১ জুন জামালপুর জেলার চাঁদপুর গ্রামে, এক মেঘলা দুপুরে, যখন মাঠে ধান পাকার সুবাস আর ঘরে নতুন অতিথির কান্না একসাথে বাতাসে মিশেছিল। নাম রাখা হয় জাহিদুল হাসান। পিতা জিয়াউল হক, মাঠঘাটের চেনা মুখ, একজন কৃষক; মা জাহানারা বেগম, দুই বেলা রান্না করেন, মেয়ের জামা সেলাই করেন, ছেলের চোখে ভবিষ্যৎ খোঁজেন। পরিবারে দুই ভাইবোন জাহিদ বড়, বোন জান্নাতুল ফেরদৌস শেফা, সদ্য এইচএসসি পাস করেছে।

জীবনের সবচেয়ে কোমল বয়সে মাত্র ১৪ বছরের এক কিশোরী, ফারজানা আক্তারকে বিয়ে করেন জাহিদ। না, প্রেমের গল্প ছিল না, ছিল দরিদ্র সংসারের উপরে টিকে থাকার একটা প্রচেষ্টা। বাল্যবিয়ের দায় নয়, বরং এ ছিল দু'টি কিশোর হৃদয়ের একটা আশ্রয় খোঁজার লড়াই। ফারজানা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন, চোখে ছিল স্বপ্ন, একটা নিজস্ব ঘর, চারপাশে শান্তি আর বারান্দায় ছেলেমেয়ের দৌড়ঝাঁপ। কিন্তু দারিদ্র্য ততদিনে ফেড়ে ফেলেছে বইয়ের পাতা, চুরি করে নিয়েছে খেলার মাঠ, আর খোলা আকাশের নিচে রেখে দিয়েছে তাঁদের স্বপ্ন। জাহিদ স্কুল ছাড়েন, বই ফেলে হাতে তুলে নেন টেস্টার, স্ক্রু ড্রাইভার, বৈদ্যুতিক তার। ঢাকায় এসে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ নেন, চাকরি নয়, একপ্রকার যুদ্ধ, যেখানে প্রতিদিন বিদ্যুতের তার বেয়ে উঠে আসে জীবনধারণের আকুতি। তাঁর পায়ের ছাপ থাকে কাঁচা সিমেন্টে, রঙিন তারের মধ্যে লুকিয়ে থাকে নিঃশব্দ এক প্রতিজ্ঞা, এই দেশের প্রতিটি ঘরে আলো জ্বলবে, তবে শুধু বৈদ্যুতিক নয়, ন্যায়ের আলো, বেঁচে থাকার আলো। যে আলো তাঁর নিজের ঘরে ছিল না, তা তিনি অন্যের ঘরে দিতে চেয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন না কোনো রাজনীতিক দলের ব্যানারে, পোস্টারে তার ছবি ছিল না, কোনো মিছিলে শ্লোগানের মুখ নন। তিনি ছিলেন নিরীহ, গরিব, চুপচাপ। কিন্তু এই চুপচাপ তরুণটির হৃদয়ে ছিল এক আগ্নেয়গিরি। অন্যরা যখন ঘরে বসে ফোন স্ক্রল করত, জাহিদ তখন রাস্তায় নামতেন মোবাইল হাতে অন্যায়ের ভিডিও করতেন, সেগুলো অনলাইনে ছড়িয়ে দিতেন। মুখে কখনো কিছু বলতেন না, কিন্তু চোখে এক অব্যক্ত প্রতিজ্ঞা এই দেশ একদিন বদলাবে।

জুলাই বিপ্লব যখন ঘূর্ণিঝড় হয়ে উঠছে, তখন জাহিদ তাতে ছিলেন নিঃশব্দ সৈনিক হয়ে। গুলির শব্দে তাঁর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় কিন্তু তাঁর কণ্ঠ থেমে যায়নি। মৃত্যু তাঁকে থামায়, কিন্তু থামাতে পারে না তাঁর বিশ্বাসকে। ছোট একটি জীবনে এতটা সাহস, এতটা নির্লোভ দেশপ্রেম তা রাষ্ট্র হয়তো এড়িয়ে যায়, মিডিয়া ভুলে যায়, কিন্তু ইতিহাস তা ভুলে না। ইতিহাস জানে, এক ইলেকট্রিশিয়ানের হাতে নয়, হৃদয়ে ছিল আলো; আর সেই আলো দিয়েই তিনি রচনা করে গেছেন বিপ্লবের নীরব ছায়া। জাহিদ মারা যান, কিন্তু তাঁর নাম হয়ে ওঠে সেই প্রশ্নবোধক চিহ্ন যে প্রশ্ন করে, কেন একটা সমাজ একজন গরিব কিশোরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না? কেন সত্যভাষীদের জায়গা হয় কেবল কবরস্থানে?

**আন্দোলনের প্রেক্ষাপট: রক্তে লেখা জুলাইয়ের আগুন**

২০২৪ সালের জুলাই মাস। শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা সবকিছু থেকে বঞ্চিত একটি প্রজন্ম তখন চোখ তুলে তাকিয়েছিল রাষ্ট্রের দিকে। কিন্তু রাষ্ট্র তখন আকাশের মতো দেখা যায়, ছোঁয়া যায় না। এই অদৃশ্য নিপীড়নের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ জন্ম নেয়, তা আর ছাত্র আন্দোলন ছিল না তা হয়ে ওঠে এক নতুন মুক্তিযুদ্ধ, এক অসম যুদ্ধ, যেখানে অস্ত্র ছিল না, ছিল বুকের সাহস। এই আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল তারা, যারা কোনোদিন গণমাধ্যমের হেডলাইন হয় না যেমন জাহিদুল হাসান। উত্তরা রাজলক্ষ্মী মোড়, ৪ আগস্টের সকাল সেই ঘনঘোর সকালেই কাউকে কিছু না বলে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েন জাহিদ। মা জাহানারা বেগম আঁচলে টেনে ধরেছিলেন, বাবা জিয়াউল হক বলেছিলেন, “তুই গরিব মানুষ, বিপ্লব তোর কাজ না।” কিন্তু একটি বুকের ভেতর যে আগুন জ্বলে, তা কী আর ঠান্ডা হয় নিষেধের জলে?

উত্তরার রাজলক্ষ্মী মোড় তখন ঢলেপড়া মানুষের সমুদ্র হাতে পোস্টার, গলায় স্লোগান, চোখে অভিমান। জাহিদ সেখানে ছিলেন একা না পোস্টারধারী, না বক্তা তবুও চোখে ছিল এমন এক প্রত্যয়, যা অনেক ব্যানারের চেয়ে ভারী। রাষ্ট্র বুঝে গিয়েছিল এরা শুধু চিৎকার করে না, এরা চুপ থেকেও বিপ্লব ঘটায়। তাই শুরু হয় দমনযজ্ঞ সাঁজোয়া গাড়ি, কালো পোশাক, হেলমেটের নিচে লুকোনো ভাড়াটে দানবরা নামে পথে। একে একে স্লোগান থেমে যায়, মানুষ ছত্রভঙ্গ হয়, কিন্তু জাহিদ দাঁড়িয়ে থাকেন । যে এক গরিব কিশোর, যাঁর কোনো দল নেই, কিন্তু আছে দেশের জন্য নিবেদিত জীবন। দুপুর ১২টা ২০ মিনিট একটি শব্দ হয়, তারপর আরেকটি। দুইটি গুলি এসে ছিন্ন করে দেয় তাঁর স্বপ্নের শরীর। প্রথম গুলি ডান উরুর পাশ ছুঁয়ে তাঁর অণ্ডকোষ বিদ্ধ করে, মুছে দেয় পিতৃত্বের সম্ভাবনা। রাষ্ট্র শুধু তাঁর জীবনই নেয়নি, কেড়ে নিয়েছে

এক অসম্ভব ভবিষ্যৎ। দ্বিতীয় গুলি ঠোঁট ভেদ করে ঢুকে যায় দাঁতের ভেতর দিয়ে তাঁর ভাষা থেমে যায়, কিন্তু তাঁর চোখ তখনও বলে যাচ্ছিল, “আমি বাঁচবো না, কিন্তু তুমিও পার পাবে না।”

মাটিতে লুটিয়ে পড়েন জাহিদ। রক্তে ভেসে যেতে থাকে তাঁর মুখ, তাঁর শরীর, তাঁর স্বপ্ন। বন্ধু সিয়াম আর এক অচেনা পথচারী মিলে তাঁকে তুলে নেন কাঁধে করে নিয়ে যান উত্তরা উইমেন্স মেডিকেল, কলেজ হাসপাতালে। তিনি বাঁচেন না। একদিন মৃত্যুর সাথেও লড়েন, কিন্তু হার মানেন না, বরং অক্ষরে অক্ষরে হয়ে যান এক প্রতীক এক গরিব কিশোর, যিনি অন্যায়ের মুখে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন না। সেই “না” শব্দটাই হয়ে ওঠে জুলাইয়ের সবচেয়ে সাহসী উচ্চারণ। রাষ্ট্র তাঁকে চুপ করিয়ে দেয়, কিন্তু ইতিহাস জাহিদের গুলিবিদ্ধ ঠোঁটকে ইতিহাসের সবচেয়ে স্পষ্ট উচ্চারণ হিসেবে লিখে রাখে।

**শেষ মুহূর্ত ও একটি পরিবারের ধ্বংস: মৃত্যুর ভিতরেও দাঁড়িয়ে থাকা এক সাহসী প্রাণের গল্প**

জীবনের সঙ্গে লড়াই কখনও একা হয় না বিশেষ করে যখন তা মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শেষ আলিঙ্গনের জন্য অপেক্ষা করে।

জাহিদুল হাসানের শেষ মুহূর্তগুলো ছিল না কোনো সিনেমার মতো বীরত্বে মোড়া ছিল কেবল রক্ত, ঘাম, শূন্যতা আর একধরনের অসীম বিশ্বাস, যে তিনি কিছু ভুল করেননি। যখন তাঁকে উত্তরা উইমেন্স মেডিকেল কলেজে আনা হয়, তখন তাঁর দেহে রক্ত নেই, ঠোঁট ফেটে চুপসে গেছে, মুখে আর ভাষা নেই, কিন্তু চোখ তখনও ছিল খোলা যেন বলতে চাইছে, "আমি তো ঠিক কাজটাই করেছিলাম, তাই না?"

ডাক্তাররা লড়লেন, রক্ত খোঁজা হলো, লাইফ সাপোর্টে রাখা হলো এক নবীন বিপ্লবীর দেহ কিন্তু রাষ্ট্র যখন শরীরে গুলি চালায়, তখন চিকিৎসাও থেমে যায় । ৫ আগস্ট, দুপুর ২টা ২০ মিনিট একটি তরুণ প্রাণ থেমে যায়, যার হৃদয় ছিল আর দশটা ছেলে-মেয়ের মতো, কিন্তু সাহস ছিল হাজারের চেয়েও বেশি। এই মৃত্যুর খবর তখনও ভাইরাল হয়নি, পোস্ট হয়নি ফেসবুকের প্রোফাইলে, টুইটারে ট্রেন্ডিং হয়নি তাঁর নাম তবে এক মা বুঝেছিলেন, তাঁর বুক ফাঁকা হয়ে গেছে, এক বাবা বুঝেছিলেন, কাঁধটা চিরদিনের মতো ভারী হয়ে গেল।

শহর তখন কারফিউর দখলে, রাস্তায় টহল দিচ্ছে গর্জে ওঠা হেলমেটধারীরা। গুলির ভয়, পুলিশের দমন, কাঁদানে গ্যাসের দমক সবকিছু মিলে এক নিঃসঙ্গ ভয়াবহতা। কোনো অ্যাম্বুলেন্স নেই, কোনো লাশবাহী গাড়ি নেই জাহিদের দেহ পড়ে থাকে, ঠাণ্ডা হয়ে আসে, কিন্তু রাষ্ট্রের জন্য তা কেবল এক মৃত শরীর। রাত ১০টায় অনেক চেষ্টায় একটি গাড়ি মেলে। চাঁদপুর গ্রামে ফিরিয়ে নেওয়া হয় শহীদের নিথর দেহ মিরপুর থেকে জামালপুরের ভাঙা সড়কে কাঁপতে কাঁপতে, এক অসহনীয় যাত্রা। রাত ২টায় পৌঁছায় তাঁরা, ততক্ষণে গ্রামে কান্নার আওয়াজ বাতাসের সঙ্গে মিশে গেছে।

৬ আগস্ট, সকাল ১০টা । একটি কবর খোড়া হয় না, শুধু মাটি খোঁড়া হয়নি, খোঁড়া হয়েছে একটি পরিবারের ভবিষ্যৎ, একটি দেশের বিবেক। সেই কবরে ঘুমিয়ে যান জাহিদুল, একজন বিদ্রোহী, যার হাতে অস্ত্র ছিল না, ছিল শুধু মোবাইল ফোন আর সাহস। তাঁর মা আজও সেই কবরের মাটি ছুঁয়ে থাকেন যেন ছেলের গায়ে হাত রাখছেন। বাবা কথা হারিয়ে ফেলেছেন। ভেঙে পড়েছেন শারীরিক ও মানসিকভাবে। ছোট বোন জান্নাতুল আর কথা বলে না কারো সঙ্গে। স্ত্রী ফারজানা, মাত্র ১৪ বছর বয়সেই বুঝে ফেলেছে 'শহীদের বউ' হওয়া মানে সারাজীবন মরা মানুষের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা, নিজের বেঁচে থাকাটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা।

এখন এই পরিবারে নেই কোনো আয়, নেই কোনো ভরসা। রাষ্ট্র কেবল একজনকে মেরেই থামে না, রাষ্ট্র একেকটি পরিবার ধ্বংস করে, ধ্বংস করে তাদের স্বপ্ন, শান্তি, ভবিষ্যৎ। আর আমরা? আমরা হয়তো ভুলে যাব, পোস্টের নিচে নতুন ট্রেন্ডের কথা বলব। কিন্তু যে দেখেছে তাঁর রক্ত গড়িয়ে পড়তে, যে শুনেছে সেই গুলির শব্দ, তার হৃদয়ে জাহিদ চিরকাল বেঁচে থাকবে। কারণ কেউ না বললেও, আমরা জানি তিনি মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্ত পর্যন্তও মুখ ফিরিয়ে নেননি অন্যায়ের সামনে।

**পারিবারিক অবস্থা**

পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। শহীদের পিতা বর্তমানে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি এবং ছেলের মৃত্যুতে তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। শহীদের বোন জান্নাতুল ফেরদৌস শেফা নিজের পড়াশোনার খরচ চালানো এবং পরিবারের সহায়তার জন্য একটি চাকরির আবেদন জানিয়েছেন।

**প্রস্তাবনা**

১) জান্নাতুল ফেরদৌস শেফার জন্য স্থানীয়ভাবে একটি সম্মানজনক চাকরি, যাতে তিনি পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারেন

২) শহীদের স্ত্রীর জন্য নিরাপত্তা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান

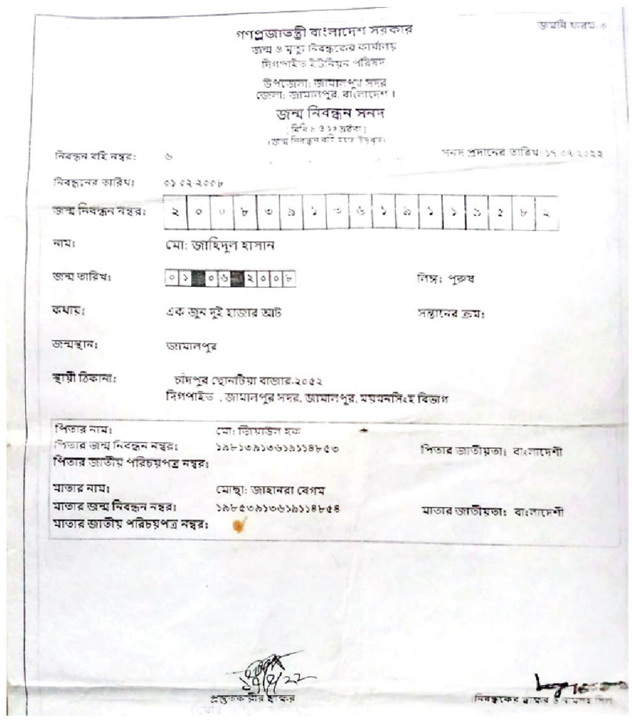

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
দিগপাইত ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: জামালপুর সদর
জেলা: জামালপুর, বাংলাদেশ।

জন্ম নিবন্ধন সনদ

নিবন্ধন বহি নম্বর: ৬
সনদ প্রদানের তারিখ: ১৭.০৭.২০২২
নিবন্ধনের তারিখ: ০১.০২.২০০৮
জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ২০০৮৩৯১৩৬১৯১১৯৫৮২
নাম: মো: জাহিদুল হাসান
জন্ম তারিখ: ০১ ০৬ ২০০৮
লিঙ্গ: পুরুষ
কথায়: এক জুন দুই হাজার আট
সন্তানের ক্রম:
জন্মস্থান: জামালপুর
স্থায়ী ঠিকানা: চাঁদপুর হোনাটিয়া বাজার-২০৫২ দিগপাইত, জামালপুর সদর, জামালপুর, ময়মনসিংহ বিভাগ

পিতার নাম: মো: জিয়াউল হক
পিতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ১৯৮১৩৯১৩৬১৯১১৪৮৫৩
পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী
পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:
মাতার নাম: মোছা: জাহানরা বেগম
মাতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ১৯৮৫৩৯১৩৬১৯১১৪৮৫৪
মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:

প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর
নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সিল

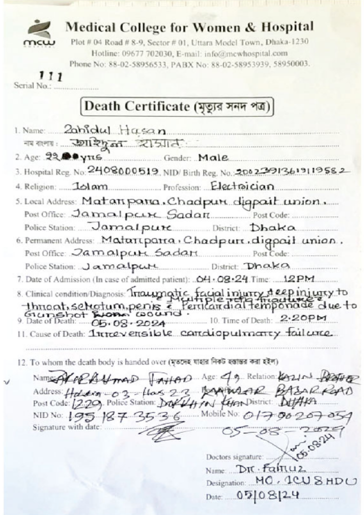

Medical College for Women & Hospital
Plot # 04 Road # 8-9, Sector # 01, Uttara Model Town, Dhaka-1230
Hotline: 09677 702030, E-mail: info@mcwhospital.com
Phone No: 88-02-58956533, PABX No: 88-02-58953939, 58950003.

Serial No.: 111

**Death Certificate (মৃত্যুর সনদ পত্র)**

1. Name: Zahidul Hasan
   নাম বাংলায়: জাহিদুল হাসান
2. Age: 22[redacted]yrs Gender: Male
3. Hospital Reg. No: 2408000519 NID/ Birth Reg. No.: 20082391361911958 2
4. Religion: Islam Profession: Electrician
5. Local Address: Mataripara, Chadpur digpait union,
   Post Office: Jamalpur Sadar Post Code:
   Police Station: Jamalpur District: Dhaka
6. Permanent Address: Mataripara, Chadpur, digpail union,
   Post Office: Jamalpur Sadar Post Code:
   Police Station: Jamalpur District: Dhaka
7. Date of Admission (In case of admitted patient): 04.08.24 Time: 12PM
8. Clinical condition/Diagnosis: Traumatic facial injury, deep injury to throat, scrotum, penis ē Multiple rib fracture ē Pericardial temponade due to Gunshot wound.
9. Date of Death: 05.08.2024 10. Time of Death: 2.20PM
11. Cause of Death: Irreversible cardiopulmonary failure
12. To whom the death body is handed over (মৃতদেহ যাহার নিকট হস্তান্তর করা হইল)
   Name: AKIB AHMAD FAHAD Age: 49 Relation: KAZIN BROTHER
   Address: Holding-03-House 23 KAWLAR BAZAR ROAD
   Post Code: 1229 Police Station: DAKKHIN KHAN District: DHAKA
   NID No: 195 187 3536 Mobile No: 01790207054
   Signature with date: 05-08-2024

   Doctors signature: 05.08.24
   Name: Dr. Fairuz
   Designation: MO, ICU & HDU
   Date: 05/08/24

## এক নজরে শহীদ পরিচিতি

| | | |
|---|---|---|
| নাম | : | মো: জাহিদুল হাসান |
| জন্ম তারিখ | : | ১ জুন, ২০০৮ |
| বয়স (শাহাদাতের সময়) | : | ১৬ বছর |
| পিতার নাম, বয়স ও পেশা | : | মো: জিয়াউল হক (বয়স ৪৫); পেশা: কৃষক/দিনমজুর |
| মাতার নাম, বয়স ও পেশা | : | মোছা: জাহানারা বেগম (বয়স ৪০); পেশা: গৃহিণী |
| বোন | : | বোন: জান্নাতুল ফেরদৌস শেফা (বয়স ১৯); এইচএসসি পাশ (২০২৪) |
| স্ত্রী | : | ফারজানা আক্তার (বয়স ১৪); পেশা: গৃহিণী; অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন |
| স্থায়ী ঠিকানা | : | গ্রাম: চাঁদপুর (মাতানপাড়া), ইউনিয়ন: দিগপাইত, উপজেলা: জামালপুর সদর, জেলা: জামালপুর |
| বর্তমান ঠিকানা (ঢাকায়) | : | ঢাকায় পরিবারের সাথে থাকতেন (২০১৯ সাল থেকে) |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শৈশব | : | শৈশবে ১১১ নং চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামান্য লেখাপড়া করেন (প্রাথমিক পর্যন্ত)। কৈশোরে ক্রিকেট, ফুটবল এবং ব্যাডমিন্টন খেলতে ভালোবাসতেন |
| পেশা ও কর্মজীবন | : | পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণে ২০১৯ সালে মা-বাবার সাথে ঢাকায় আসার পর পড়ালেখা বাদ দিয়ে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজে যোগ দেন। |
| আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও প্রেরণা | : | জুলাই বিপ্লবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার উপর নির্যাতন তার মনকে ব্যথিত করে। ৩ আগস্ট পর্যন্ত তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছাত্রদের পক্ষে সক্রিয় ছিলেন। মা-বাবার নিষেধ সত্ত্বেও ৪ আগস্ট ভোরে কাউকে না জানিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে উত্তরায় ছাত্রদের সাথে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন |
| শাহাদাতের স্থান | : | রাজলক্ষ্মী কমপ্লেক্সের মোড়, উত্তরা, ঢাকা |
| আহত হওয়ার তারিখ ও সময় | : | ০৪ আগস্ট, ২০২৪ (রবিবার), আনুমানিক দুপুর ১২:২০ থেকে ১২:৩০ মিনিট |
| মৃত্যুর তারিখ ও সময় | : | ০৫ আগস্ট, ২০২৪ (সোমবার), দুপুর ২:২০ মিনিট |
| আহত হওয়ার বিবরণ | : | শরীরে দুইটি গুলি লাগে। একটি গুলি ডান উরুর কোণায় (রানের চিপায়) লেগে অণ্ডকোষ ভেদ করে বেরিয়ে যায়; অন্য একটি গুলি ঠোঁট বরাবর লেগে দাঁত ভেঙ্গে মুখের ভেতরে প্রবেশ করে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়। |
| আঘাতকারী | : | স্বৈরাচারী সরকারের লেলিয়ে দেওয়া পেটুয়াবাহিনী ও পুলিশের আক্রমণে শহীদ হয়েছেন। |
| হাসপাতাল ও চিকিৎসা | : | আহত অবস্থায় তার সাথে থাকা ২ জন বন্ধু এবং একজন পথচারী তাকে উদ্ধার করে উত্তরা ১নং সেক্টরে অবস্থিত "মেডিকেল কলেজ ফর উইমেন্স এন্ড হসপিটাল"-এ (উত্তরা মহিলা মেডিকেল) নিয়ে যায়। সেখানে তাকে আইসিইউতে ভর্তি করে লাইফ সাপোর্টে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হয়। চিকিৎসকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি এবং ০৫ আগস্ট দুপুর ২:২০ মিনিটে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর কারণ হিসেবে "অপরিবর্তনীয় কার্ডিওপালমোনারি ফেইলিওর" উল্লেখ করা হয়েছে। |
| দাফন | : | ০৫ আগস্ট রাতে শহীদের মরদেহ গ্রামের বাড়ি জামালপুরে আনতে গাড়ির অভাবে বিলম্ব হয়; রাত ২টায় মরদেহ পৌঁছায়। ০৬ আগস্ট, ২০২৪ (মঙ্গলবার), সকাল ১০টায় গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। |
| পরিবারে বর্তমানে ৪ জন সদস্য | : | পিতা, মাতা, স্ত্রী ও বোন |

**কলিজার রক্তে রাঙানো জুলাই-**
**হৃদয় ছিল না কোনো বক্তা, না ছিল ব্যারিকেডে নেতৃত্ব দেওয়া নেতা।**
**তবু সে শহীদ, কারণ সে সত্যের পক্ষে নিহত, অন্যায়ের গুলিতে রক্তাক্ত।**
**একটি রাষ্ট্র যাকে বাঁচাতে পারেনি, সেই রাষ্ট্রের বিবেক যেন অন্তত লজ্জিত হয়।**

**মোঃ হৃদয়**
ক্রমিক : ৭৬৪
আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ: ১১৩

### শহীদ পরিচিতি

জুলাই মাসের মধ্যভাগ। বাংলাদেশ তখন আগুন হয়ে জ্বলছে। রাজধানীর বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ, রাস্তায় মানুষের আহাজারি। আন্দোলন ও সরকার পতনের দাবিতে তরুণ-যুবা-শ্রমিক-ছাত্র সবাই একাট্টা। ঢাকা শহরের অলিগলিতে তখন বারুদের ঘ্রাণ। এই উত্তাল ঢাকার বুকে, এক মানুষ পাড়ি জমাচ্ছিল ফার্মেসির খোঁজে। তার হাতে ছিলো ছেলের জন্য ওষুধ কেনার ব্যাগ, চোখে ছিলো উদ্বেগের ছায়া, রাজনৈতিক নয়, নিছক পিতৃত্বের দায়। সে মানুষটির নাম ছিলো হৃদয়। কুমিল্লার রাফেরদিয়া গ্রামে জন্ম নেওয়া এ তরুণ জীবন যুদ্ধ করেছিলো ছোটবেলা থেকেই। বাবার মৃত্যু, সংসারের হাল ধরা, দিনমজুরি করে মাকে আর স্ত্রী-সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখা সবই ছিলো তার প্রতিদিনের বাস্তবতা। বস্তির ঘরে ঘাম ঝরিয়ে, ঢাকার রোদে-ধুলায় ইস্পাতের শাটারে হাত চালিয়ে সে গড়ত নিজের ভাগ্য নয়, বরং স্ত্রী মুক্তা বেগম আর দুই ছেলেকে একটু ভালো রাখার স্বপ্ন। তাঁর মা মরিয়ম বেগম, একজন কারখানার শ্রমিক, বার্ধক্য আর ব্যথা নিয়ে প্রতিদিন সকালে যখন কাজে বের হতেন, হৃদয় তখন বলতো,"মা, তুমি একদিনও কাজ কইরো না। আমি আছি না?"

২০২৪ সালের জুলাই: বাংলাদেশের ইতিহাসে এক রক্তাক্ত অধ্যায়
জুলাই মাসটি বাংলাদেশের ইতিহাসে এক ভয়াবহ ও রক্তাক্ত সময় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই মাসে সংঘটিত "জুলাই গণহত্যা" এবং "জুলাই বিপ্লব" দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবাধিকার পরিস্থিতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

**আন্দোলনের সূচনা**

জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে, সরকার কর্তৃক বিতর্কিত কোটা পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ শুরু করেন। এই আন্দোলন দ্রুত সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলনে রূপ নেয়। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সাধারণ জনগণ, রাজনৈতিক কর্মী এবং বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলন দমন করতে তৎকালীন আওয়ামী সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নিরাপত্তা বাহিনী, পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনগুলো আন্দোলনকারীদের উপর ব্যাপক দমন-পীড়ন চালায়। খুনি হাসিনার নির্দেশে সারা বাংলাদেশে গণহত্যা চালায় স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার ও তার পেটুয়া বাহিনী।

**খুনি শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও অন্তর্বর্তী সরকার**

আন্দোলনের চাপে পড়ে ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেন এবং ভারতে পালিয়ে যান। এরপর নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়, যা দেশের পুনর্গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

**আওয়ামী লীগের নিষিদ্ধ ঘোষণা**

আন্দোলন দমনে ভূমিকার জন্য আওয়ামী লীগকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। দলটির নিবন্ধন স্থগিত করা হয় এবং নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। ২০২৪ সালের জুলাই মাস বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গভীর ক্ষতচিহ্ন হয়ে থাকবে। এই সময়ের ঘটনাবলি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন, রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন এবং গণআন্দোলনের এই অধ্যায় থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে একটি গণতান্ত্রিক, মানবিক ও সহনশীল সমাজ গঠনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

**সংক্ষেপে:**

আন্দোলনের সূচনা: কোটা পদ্ধতির বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, সরকারী দমন-পীড়ন, নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে প্রায় ১,৪০০ মানুষ নিহত চানখারপুল হত্যাকাণ্ড: ৫ আগস্ট পুলিশের গুলিতে ৭ জন নিহত শেখ হাসিনার পদত্যাগ, আন্দোলনের চাপে পড়ে পদত্যাগ ও ভারতে পালিয়ে যাওয়া আওয়ামী লীগের নিষিদ্ধ ঘোষণা, সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতায় দলটি নিষিদ্ধ।

**ঘটনার বিবরণ**

১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার। বিকেল সাড়ে পাঁচটা। ছেলে জ্বর এসেছে, কিন্তু আশেপাশে কোনো ওষুধের দোকান খোলা নেই। চারপাশে গুঞ্জন "আন্দোলনকারীরা রাস্তায়", "পুলিশ গুলি ছুঁড়ছে"। তবু হৃদয় তো আন্দোলনকারী নয়। সে তো একজন পিতা, যার একটাই উদ্দেশ্য: ওষুধ এনে ছেলের জ্বর নামানো। কিন্তু রাষ্ট্রের চোখে সে এক 'দেখা গেলেই সন্দেহজনক'। সে হাঁটছিলো ওভারব্রিজের নিচে, রায়েরবাগ বাজারের দিকে। তখনই গর্জে উঠলো গুলি।

একটি ছুটে আসা বুলেট বিদীর্ণ করলো তার পিঠ, ছিঁড়ে গেলো কলিজা, বুক দিয়ে বেরিয়ে গেল রক্তের গলাপ্রপাত। মুহূর্তেই শহীদ মোহাম্মদ হৃদয় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পথচারীরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলো। ঠিক রাত ৮টা, ঢাকা মেডিকেলের করিডোরে নিঃশব্দে থেমে গেলো এক জীবন।

হৃদয় যুদ্ধ করেছিল পরিবার বাঁচাতে, রাষ্ট্র পাল্টাতে নয়। তার স্ত্রী এখন অনেক রাতে বিছানার কোণে বসে বলেন,"সে তো শুধু ওষুধ

আনতে গেছিলো, এই কি ছিল তার অপরাধ?" তাঁর মা বয়সের ভারে নুয়ে যাওয়া এক মানুষ। কারখানার কাজ আর করতে পারেন না, কোমরের ব্যথায় কাতর। চোখে শুধু ছেলের মুখ, শেষ দেখার মুহূর্তের সেই রক্তাক্ত বুক। মৃত্যুকালে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন হৃদয়। মা বর্তমানে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন। স্ত্রী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। পরিবার এখন চরম আর্থিক সংকটে মানবেতর জীবনযাপন করছে

**শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় এর বক্তব্য**

শহীদ হৃদয়ের বড় বোন মোছাম্মৎ সুরমা আক্তার বলেন, আমার ভাইয়ের মত মানুষই হয় না।আমার ভাই একজন অত্যন্ত সৎ মানুষ ছিল। সে সব সময় সত্য কথা বলতো এবং অন্যায় থেকে দূরে থাকতো। একজন মানবিক এবং পরোপকারী মনের মানুষ ছিল। আমার ভাই অত্যন্ত বিনয়ী এবং অহংকারহীন ছিলেন। সে সদা সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকা পছন্দ করত এবং ছোটদের স্নেহ করতো। সে বড়দেরকে যথেষ্ট সম্মান করতো এবং দেখলেই সালাম দিত।

পরিবারের প্রতিটি মানুষের প্রতি ছিল তার দায়িত্বশীল আচরণ। আমরা কখনো রাগ করলেও সে রাগ করত না। অভাবের সংসারে যখন আমরা ধৈর্য হারা হয়ে যাই তখন সে কঠিন পরিস্থিতিতেও নিজের ধৈর্য ধরে রাখত। এবং আমাদেরকে সান্ত্বনা দিত। বাবার মৃত্যুর পর পুরো পরিবারের দায়িত্ব যখন তার কাঁধে আসে, তারপরেও সে দায়িত্ব পালনে কোনদিনও অবহেলা করেনি। সুরমা আক্তার বলেন, আমার ভাইয়ের মত আর ভাই হয় না। সে পরিবারের জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যাইত, কিন্তু অভাবের সংসার বলে নিজের জন্য কিছুই করতো না। সে ছোটবেলা থেকে অনেক কষ্ট করে বড় হইছে, এর জন্য সে পরিবারের কাউকে কষ্ট দিতে চাইত না।

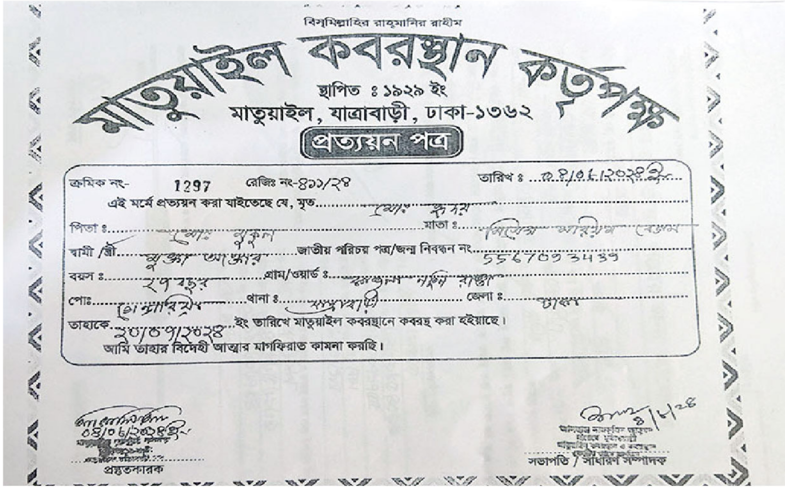

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মাতুয়াইল কবরস্থান কর্তৃপক্ষ

স্থাপিত ঃ ১৯২৯ ইং

মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২

প্রত্যয়ন পত্র

ক্রমিক নং- 1297 রেজিঃ নং-৪১১/২৪ তারিখ ঃ ০৪/০৮/২০২৪ ইং

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মৃত মোঃ হৃদয়

পিতা ঃ মোঃ মুকুল মাতা ঃ মিসেস মরিয়ম বেগম

স্বামী /স্ত্রী মুক্তা আক্তার জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন নং 5587093439

বয়স ঃ ২৭ বছর গ্রাম/ওয়ার্ড ঃ

পোঃ থানা ঃ যাত্রাবাড়ী জেলা ঃ ঢাকা

তাহাকে ২০/০৭/২০২৪ ইং তারিখে মাতুয়াইল কবরস্থানে কবরস্থ করা হইয়াছে।

আমি তাহার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রস্তুতকারক

সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক

## শহীদ মোহাম্মদ হৃদয়: একনজরে প্রোফাইল

| | |
|---|---|
| নাম | : মো: হৃদয় |
| জন্ম তারিখ | : ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ |
| জন্মস্থান | : রাফের দিয়া, দৌলতপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা |
| পেশা | : দিনমজুর (শাটার মিস্ত্রি) |
| পিতা | : মো: মুকুল (মৃত, বয়স ৫৭) |
| মাতা | : মরিয়ম বেগম (কারখানা শ্রমিক, বয়স ৫৪) |
| স্ত্রী | : মুক্তা বেগম (গৃহিণী, বয়স ২৫) |
| সন্তান | : মোহাম্মদ রাজিব আহমেদ আফরান (বয়স ৫) ও মোহাম্মদ আব্দুর রহমান (বয়স ১) |
| স্থায়ী ঠিকানা | : কাজিমুদ্দিন প্রধানিয়া বাড়ি, রাফেরদিয়া, দৌলতপুর ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ৫, দাউদকান্দি, কুমিল্লা |
| বর্তমান ঠিকানা | : গফুর মিয়ার বাড়ি, ২৫/১, রইসনগর (বায়তুল মামুর মসজিদের উত্তর পাশে) |
| | : কদমতলী, ঢাকা সিটি দক্ষিণ, ওয়ার্ড ৬০ |
| আহত হওয়ার তারিখ ও সময় | : ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৫:৩০ মিনিট |
| মৃত্যুর তারিখ ও সময় | : ১৯ জুলাই ২০২৪, রাত ৮ মিনিট |
| ঘটনার স্থান | : রায়েরবাগ, কদমতলী থানার সামনে |
| হত্যাকারী | : বাংলাদেশ পুলিশ |
| কবরস্থান | : মাতুয়াইল কবরস্থান, ঢাকা |

**প্রস্তাবনা**

শহীদ মো: হৃদয়ের দুই সন্তান এবং পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা হোক। রাষ্ট্র যেন এক পিতার মৃত্যুতে আরেক সন্তানকে অনাথ করে না তোলে।

# যিনি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অন্যায়কে না বলেছিলেন শহীদ মোঃ মনিরুল ইসলাম

**শহীদ মোঃ মনিরুল ইসলাম**

ক্রমিক : ৭৬৫

আইডি : ঢাকা সিটি ১২৮

### শহীদ পরিচিতি

মোঃ মনিরুল ইসলাম। এই নামটার আড়ালে লুকিয়ে আছে এক অদম্য, নিঃশব্দ প্রতিবাদের চিরন্তন সুর। ২৫ আগস্ট, ১৯৮৩ সালে জন্ম নেওয়া মনিরুলের জীবন ছিল স্রোতের বিপরীতে এক অস্পষ্ট যুদ্ধের মতো। পিতা মোজাহের উদ্দিন সর্দার, মা বেগম রাবেয়া। তাদের মাটির সন্তান, যে কখনো রাজনীতির ঝাঁঝালো বক্তৃতায় নিজেকে ঢেকে রাখেনি, নয় কোনো মিছিলে পোস্টারে চমকানো মুখ ছিলেন। তার অস্তিত্ব ছিল এক বিনয়ী, কিন্তু অবিচল আত্মার চেতনায় বোনা। যে চেতনা সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জ্বলজ্বল করতো।

একটি প্রতীক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক বিশাল প্রতিবাদের অঙ্গীকার। তার শহীদত্বের মর্মস্পর্শী নিঃশ্বাস যেন গোটা জুলাই বিপ্লবের আত্মাকে স্পর্শ করে, যা কখনো নীরব হয়নি, কখনো নিশ্চুপ হয়নি। প্রতি পদক্ষেপে বাজে সেই বেদনার সুর, যে সুরে এক একটি জীবন বদলে গেছে, যা একাকার হয়েছে গণমানুষের আশা আর সংগ্রামের গল্পে।

মো: মনিরুল ইসলাম শুধু একজন শহীদ নন, তিনি আমাদের সকলের মধ্যে সেই যোদ্ধা, যিনি নিঃশব্দেই ইতিহাসের পাতা উল্টিয়েছেন। একে একে গুলি হয়েছে তার শরীরে, কিন্তু তার আত্মার আগুন কখনো নেভেনি। সেই আগুন আজ আমাদের হৃদয়ে জ্বলছে, আমাদের প্রত্যেকের বুক চিরে প্রবাহিত হচ্ছে "অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াও, নিঃশব্দ হলেও প্রতিবাদ করো।"

জুলাই বিপ্লবের সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলো থেকে উঠে আসা মনিরুলের আত্মত্যাগ আমাদের জন্য এক শিখা, এক আলোকবর্তিকা। আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যে সত্য ও ন্যায়ের পথে যাত্রা কখনো সহজ নয়, কিন্তু তা অপরিহার্য। তার নাম কেবল এক জীবনের সমাপ্তি নয়, এটি এক নতুন সূচনা, নতুন এক আন্দোলনের, নতুন এক প্রত্যয়ের।

মনিরুলের কথা আমাদের কানে বলে যায় "নির্ভয়ে দাঁড়াও, নিঃশব্দ হলেও বলো, কারণ তবেই জাগবে নতুন সকাল।" শহীদ মনিরুলের আত্মার এই জ্বলন্ত লীলায় আজ আমাদের প্রত্যেকেরই অংশ নেওয়া দরকার, যেন তার মৃত্যুর গূঢ় অর্থ মাটি থেকে উঠে ঘরে ঘরে, হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই জুলাই বিপ্লবের স্পন্দন জীবিত থাকবে চিরকাল।

মনিরুল কখনো শাসকদের কূটনীতির নামে কণ্ঠস্বর বাড়ায়নি, কিন্তু তার হৃদয়ের গভীরে বসবাস করত এক অদম্য আগুন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদের জ্বালা। ২০০৬ সালে প্রবাসের স্বপ্ন নিয়ে ইতালির মাটিতে পা রাখলেও, ২০১১ সালে এক দুর্ঘটনার পর ফিরে আসেন নিজের দেশের মাটিতে। স্ত্রী ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় প্রহরী, যিনি যেতে দেননি আবার প্রবাসে পা বাড়াতে। সংসার ছিল এক ভাড়াবাড়ির ছোট্ট কোণে, সামান্য টাকার অভাবে কাটে দিনগুলো, কিন্তু মনিরুলের মন ছিল মহাসাগরের মত বিশাল। স্বপ্ন আর আশা দিয়ে ভরা। আন্দোলনের ময়দানে মনিরুল ছিল সজাগ, সক্রিয়, অবিচল। তিনি জানতেন, শহীদ হওয়ার জন্য রাজনৈতিক পরিচয় জরুরি নয়, প্রয়োজন মাত্র একটি বিবেকের, যা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শেখায়। সেই বিবেকই তাঁকে করেছিল জনতার নিরলস অভিভাবক, তাদের যন্ত্রণার নীরব কণ্ঠ। সেই বিবেকই তাঁকে দাঁড় করিয়েছিল গুলির সামনে, যখন অজানা গুলির আওয়াজ একরাশ অন্ধকার ছড়িয়ে দেয় তার জীবনের পথে।

মনিরুলের নাম আজ আর শুধু একটি পরিচয় নয়, এটা হয়ে উঠেছে এক অবিচ্ছেদ্য প্রশ্ন "আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?" এটা

**আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও তাঁর অংশগ্রহণ-শহীদ মনিরুলের শেষ লড়াই**

২০২৪ সালের জুলাই মাস, এমন এক সময়, যখন ঢাকা শহরের বাতাসে শুধুই ধুলো আর ধোঁয়া ছিল না, ছিল প্রতিরোধের উত্তাপ, ছিল অপমানিত মানুষের সম্মিলিত আর্তনাদ। এই মাসে প্রতিটি জানালার ওপাশে লুকিয়ে ছিল আতঙ্ক, কিন্তু তার ভিতরেও ফুটে উঠছিল এক নতুন প্রত্যয়ের আলো। কোটা সংস্কার আন্দোলন তখন কেবল ক্যাম্পাসে আটকে ছিল না; সেটি ছড়িয়ে পড়েছিল গলির মাথায়, পাড়ার চায়ের দোকানে, বস্তির খুপরিতে, এবং মধ্যবিত্ত ঘরের ড্রইংরুমে। আর সেই আন্দোলনের প্রাণ হয়ে উঠেছিলেন এমন মানুষরাই, যাদের নাম কোনো ব্যানারে থাকে না যেমন মো: মনিরুল ইসলাম।

তিনি ছিলেন না কোনো ছাত্রনেতা, ছিলেন না কোনো পোস্টার-বিপ্লবের মুখ। কিন্তু ছিলেন একটি জেগে থাকা বিবেক। ১৮ জুলাই, ২০২৪, যেদিন রাজধানীজুড়ে গুলির শব্দ

ছড়িয়ে পড়ে, সেই দিনেও তিনি মাঠে ছিলেন। তাঁর উপস্থিতি ছিল নিঃশব্দ, কিন্তু তা ছিল অনন্য এক সাহসিকতার বহিঃপ্রকাশ। আন্দোলনের একদল শিক্ষার্থী বলেছিল প্রিন্টার দরকার, ব্যানার ছাপাতে হবে। মনিরুল চুপচাপ প্রিন্টার নিয়ে হাজির। কারও কাছে সেটা হয়তো তুচ্ছ কাজ, কিন্তু তা ছিল সেই আন্দোলনের রক্তচলাচলের মতোই অপরিহার্য।

ছেলে বলেন, “আব্বু বলত, আমি নেতা না হতে পারি, কিন্তু যেহেতু আমি মানুষ, তাই এ লড়াইটা আমারও।” মনিরুল বুঝতেন, ন্যায়বিচারের জন্য রাস্তায় নামা মানেই মাইক হাতে চিৎকার করা নয়; কখনো তা হয় পেছনে দাঁড়িয়ে সাহস জুগিয়ে যাওয়া, কখনো কারো ব্যানারের কাপড় ধুয়ে আনা, কখনো আবার শুধু পাশে দাঁড়িয়ে বলা “তোমরা একা নও।”

সেদিন বিকালে জমির কাগজের কাজ শেষ করে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন, কিন্তু বাড়িতে যাননি। কারণ তিনি শুনেছিলেন মিরপুরে গোলাগুলি হচ্ছে, আন্দোলনকারীদের দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, “চলো দেখি আন্দোলন কোন দিকে যায়।” যেন ভেতরের এক শক্তি তাঁকে থামতে দেয়নি। কীসের এত দায়বোধ? কীসের এত তাড়না? সেটা বুঝতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হয় সেই আগুনঘেরা জুলাইয়ের দিকে, যেখানে হাজারো চেনা-অচেনা মানুষ উঠে এসেছিল তাদের ন্যায্য অধিকারের জন্য। মনিরুল ছিলেন তাদেরই একজন, যিনি মুখে উচ্চারণ না করলেও হৃদয়ে ধারণ করতেন প্রতিবাদের মন্ত্র।

তিনি ছিলেন সেই জনতার প্রতিনিধি, যারা ভীতু নয়, কেবল ক্লান্ত। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, আমরা এখনো নিঃশব্দ হলেও ভয়ে নিশ্চুপ নই। তার দাঁড়িয়ে থাকাই ছিল এক শান্ত, দৃঢ় উচ্চারণ “আমি আছি।” গুলি তাকে থামিয়ে দিলেও থামাতে পারেনি তার বার্তা, যা এখনো ঢেউ তোলে প্রতিটি সজীব বিবেকের বুকে।

এই সাহসিকতার ছবি, এই নীরব উপস্থিতির ইতিহাস, আমাদের শেখায়- প্রতিবাদ শুধু চিৎকারে নয়, একজন নিরীহ মানুষের শান্ত দৃঢ়তায়ও লেখা যায়। শহীদ মনিরুল সেই দৃঢ়তার নাম, সেই বিবেকের প্রতিচ্ছবি, যার নিরব পদচিহ্ন আজও রাজপথে বাজে, ধ্বংসের বুক চিরে বলে “জুলাই বেঁচে আছে, আমিও আছি।”

**শহীদ হওয়ার করুণ কাহিনি: রক্তে লেখা একটি নিঃশব্দ বিপ্লবের শেষ অধ্যায়**

মৃত্যু সবসময়ই হঠাৎ আসে না। কখনো তা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে একটি জাতির নীরবতার ফাঁকে, পুলিশের বুটের শব্দে, আর রাষ্ট্রের নির্লজ্জ সন্ত্রাসের ছায়ায়। শহীদ মো: মনিরুল ইসলামের মৃত্যু ছিল তেমনই একটি আগুনে লেখা প্রস্থান, যেখানে প্রতিটি গুলির শব্দ ছিল গণতন্ত্রহীনতার ঘোষণা, আর প্রতিটি রক্তবিন্দু ছিল এক অনুচ্চারিত শপথের সাক্ষর।

১৯ জুলাই, ২০২৪। সময়টা ছিল বিকাল পাঁচটা। ঢাকার মিরপুর তখন রূপ নিয়েছে এক যুদ্ধক্ষেত্রে, অথচ কোনো যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। ২২ নম্বর রোডের আশেপাশে হঠাৎই ছড়িয়ে পড়ে গুলির শব্দ। প্রথমে একবার, তারপর একের পর এক। আগে থেকেই মোতায়েন ছিল পুলিশ। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে প্রবেশ করে বিজিবির গাড়ি, আর শুরু হয় এলোমেলো, দিকভ্রষ্ট গুলিবর্ষণ। কারা চালিয়েছিল এই গুলি? পুলিশ? বিজিবি? নাকি ক্ষমতাসীন দলের মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা, যারা পুলিশের ছায়ায় নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালায়? প্রশ্নগুলোর উত্তর আজও রয়ে গেছে ধোঁয়াটে, কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট, সেই দিন একজন নিষ্পাপ মানুষ হারিয়ে যান, রাষ্ট্রীয় হিংসার বলি হয়ে।

মনিরুল ইসলামের ছেলে বলেন, “আমার বন্ধু জানাইছিল যে বিজিবির গাড়িও দেখা গেছে, কিন্তু পুলিশ ছিল এটা নিশ্চিত।” আর অনেক প্রত্যক্ষদর্শী মনে করে, আসলে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা পুলিশি ছত্রছায়ায় গুলি চালিয়েছিল। দুপুর তিনটার পর, একের পর এক মোটরসাইকেল আসে, ১০ থেকে ১৩ নম্বর এলাকায় হইচই করে, এবং তারপর ছোঁড়ে গুলি। সেই গুলিতেই বিদ্ধ হন মনিরুল। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা, নিরস্ত্র, কেবল বিবেকের আহ্বানে আন্দোলনের পাশে থাকা এক মানুষ।

তাঁকে তড়িঘড়ি করে নিয়ে যাওয়া হয় আলোক হাসপাতালে। কিন্তু মাগরিবের আজান উঠার আগেই হাসপাতালে ঘোষণা আসে মনিরুল আর নেই। নিঃশব্দ, গভীর, অন্ধকার এক মৃত্যু। সেই রাতের স্তব্ধতা আজও থেমে নেই। রাতের বাতাসে যেন আজও ভেসে আসে মনিরুলের ছায়া। যিনি গুলি খেয়েছিলেন, কিন্তু মাথা নিচু করেননি।

মনিরুলের মৃত্যু ছিল কেবল একটি প্রাণের নিভে যাওয়া নয়, ছিল এক আদর্শের, এক সাম্যের স্বপ্নের আত্মাহুতি। কোনো রাজনৈতিক পরিচয়ের আবরণ ছিল না তাঁর গায়ে, ছিল না কোনো মিছিলের মাইক হাতে চিৎকার। কিন্তু তাঁর রক্ত আমাদের বলে তিনি ছিলেন বিপ্লবের এক নিঃশব্দ কণ্ঠ। একা দাঁড়িয়ে থাকা একজন সাধারণ মানুষ, যিনি নিজের অবস্থান থেকে অন্যায়ের সামনে মাথা নত করেননি।

এই মৃত্যু আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, রাষ্ট্র তার নিরীহ নাগরিকের গায়ে গুলি চালায়, সে রাষ্ট্র নিজের পতনের সুর বাঁজায়। শহীদ মোঃ মনিরুল ইসলামের নাম এখন আর কেবল একটি পরিচয় নয়; তা হয়ে উঠেছে একটি প্রশ্ন, একটি ঘৃণা, একটি চেতনা। তাঁর রক্ত এখন রাজপথের মাটি চষে বেড়ায়, বলে "আমরা ভুলবো না, আর ক্ষমা করবো না।"

এই মৃত্যু আমাদের একা করে দেয় না বরং আমাদের জাগিয়ে তোলে। মনিরুল আমাদের শিখিয়ে গেছেন, বিপ্লব গর্জে উঠে না সবসময়, অনেক সময় তা হয় নিঃশব্দ এক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লেখা এক সাহসিকতার ইতিহাস।

**পরিবার ও বেদনাগাঁথা: নিঃসঙ্গতার ছায়ায় লেখা এক অসমাপ্ত জীবনচিত্র**

শহীদ মনিরুল ইসলামের মৃত্যু যেন শুধু একটি গুলির নয়, একটি পরিবারের প্রতিটি শিরা উপশিরায় ছড়িয়ে পড়া এক দীর্ঘশ্বাসের গল্প। একটি বাড়ি এখন আর বাড়ি নয়, যেন নিঃশব্দ ময়দান, যেখানে প্রতিটি দেয়াল, প্রতিটি জানালা শহীদের স্মৃতির ভারে ঝুঁকে আছে। তাঁর স্ত্রী, যাঁর চোখে আজো ছায়া নামে সন্ধ্যার আগেই, ২০১২ সাল থেকেই মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। ডাক্তার বলেন, "মস্তিষ্কের রগ শুকিয়ে গেছে।" এই বাক্য শুনতে ছোট, কিন্তু তাতে লুকিয়ে আছে এক নারীর প্রতিদিনের আত্মসংঘাত, হারানো সম্বিৎ আর কষ্টের উপত্যকা।

তিনি চেষ্টা করেন রান্না করতে, সন্তানদের খাবার দিতে, ঘর সামলাতে কিন্তু তা যেন একজন সৈনিকের যুদ্ধ, যার শরীর ক্লান্ত, মন অবসন্ন, তবুও তিনি হেরে যান না। পাশে আছেন একজন মামী, যিনি নিজের ছায়া বিস্তার করে এই পরিবারকে আগলে রাখেন। অথচ এই সহানুভূতির রেখায়ও ছুঁয়ে আছে এক বিশাল শূন্যতা। যা কোনো শব্দে, কোনো সান্ত্বনায় পূরণ হয় না।

মনিরুল ইসলামের ছেলে এখনো কাঁদে, কিন্তু সে কান্না চোখে নয়, সে জমে থাকে কথার ভিতর, থেমে যায় হঠাৎ, গলায় আটকে থাকা হাহাকারে। সে বলে, "আব্বু ক্রিকেট খেলতেন, বিয়ের সময়ও নাকি শ্বশুরবাড়িতে খেলতে নেমে পড়েছিলেন।" এই সহজ স্মৃতির ভেতরেই লুকিয়ে থাকে এক অসহনীয় ক্ষরণ। যে মানুষ একদিন বল নিয়ে দৌড়েছিলেন মাঠে, সেই মানুষ আজ কবরের স্তব্ধতায় শুয়ে আছেন রাষ্ট্রের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে। এই স্মৃতিগুলো তার জন্য আনন্দের নয়, এগুলো কাঁটার মতো। যা রোজ হৃদয়ে বিঁধে।

আত্মীয়রা বলেন, "মনিরুল ভাই খুবই অমায়িক ছিলেন, সবার খোঁজ নিতেন।" তিনি ছিলেন সেই মানুষ, যার দরজা সবার জন্য ছিল খোলা, যার হাসিতে গলে যেত ক্লান্তি। তাঁর ঘর আজ নিঃসঙ্গ, নিস্তব্ধ, কিন্তু প্রতিটি ইটে আজো রয়ে গেছে তাঁর হাসির প্রতিধ্বনি, প্রতিটি চৌকাঠে যেন লেখা আছে, "মানবতা এখনও বেঁচে ছিল এখানে।"

তাঁর মৃত্যু কেবল এই পরিবারেরই ক্ষতি নয়। আমাদের প্রত্যেকের বুকেই আজ একটা ফাটল রেখে গেছে। মনিরুল ছিলেন সেই সাধারণ মানুষ, যাঁরা দেশের মেরুদণ্ড বিনয়ী, কিন্তু ন্যায়ের পক্ষে অবিচল। এমন মানুষ হারানো মানে একেকটা দীপ্ত স্বরের থেমে যাওয়া, একেকটা আলোর নিভে যাওয়া।

এখন সেই কণ্ঠস্বর আর নেই। তাঁর স্ত্রী স্তব্ধ, তাঁর ছেলে অনাথ, তাঁর বাড়ির বাতাস ভারী। কিন্তু এই রক্ত কেবল মাটি রাঙায়নি, আমাদের কণ্ঠে আগুন ঢেলে দিয়েছে। মনিরুলের মৃত্যু আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আমরা বুঝে গেছি, অন্যায় যখন

চুপিচুপি আসে, তখন প্রতিবাদ করতে হয় ছায়া হয়ে, দাঁড়াতে হয় গুলির মুখেও।

এই পরিবার এখন যন্ত্রণার প্রতিমা। প্রতিটি দিন যেন নতুন করে শোকের জন্ম দেয়। কিন্তু মনিরুলের রক্ত এখনো বলে- আমি আছি, আমি হবো, যতদিন তোমরা প্রতিবাদ করবে, ততদিন আমার মৃত্যু বেঁচে থাকবে তোমাদের বিবেকে।

**প্রস্তাবনা ও উত্তরাধিকারের দায়: শহীদের নামেই রাষ্ট্রের পুনর্জন্ম**

মনিরুল ইসলামের মৃত্যু নিছক একটি রাজনৈতিক সহিংসতা নয়। এটি একটি জাতির আত্মার ছেঁড়া চিঠি, যেখান থেকে প্রতিটি শব্দে ঝরে পড়ে রাষ্ট্রের নীরবতা, আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থতা। তিনি কেবল রাস্তায় গুলি খেয়ে মরে যাননি। তিনি আমাদের ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে দিয়ে গেছেন। আজ তাঁর পরিবারের চোখে শুধু কান্না নয়, প্রতিবাদের দাবিও জ্বলছে। এই পরিবার এখন আর শুধুমাত্র ব্যক্তিগত শোকের ভার বইছে না। তারা বহন করছে একটি উত্তরাধিকার, যা রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করে, "তোমরা কোথায় ছিলে, যখন একজন সাধারণ মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ন্যায়ের পাশে থাকায় প্রাণ হারাল?"

প্রথমত, তাঁর স্ত্রী মানসিকভাবে অসুস্থ ২০১২ সাল থেকে। এই পরিবার কোনো দিন ভিক্ষা চায়নি, আজও চায় না। তারা চায় দায়িত্ব, চায় ন্যায়। তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য সরকারের উচিত স্থায়ী ও সম্মানজনক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এটি যেন করুণা নয়, বরং জাতির পক্ষ থেকে একটি ঋণপরিশোধ।

১৪

যুগান্তর

কোটা সংস্কার আন্দোলন রাজধানীসহ সারা দেশে নিহত যারা

আংশিক

'প্রার্থনা ও ছাত্র-জনতার গণমিছিল' কর্মসূচি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে নিহতদের স্মরণে বিশেষ দোয়া ও গণমিছিল

দ্বিতীয়ত, মনিরুলের সন্তানেরা যেন অন্ধকারে না হারিয়ে যায়। তাঁদের জন্য পূর্ণ শিক্ষাবৃত্তি চালু করা হোক, এমনভাবে যাতে তারা শুধু লেখাপড়া না শিখে, শিখে কীভাবে মানুষের জন্য বাঁচতে হয়, লড়তে হয়, সৎ থাকতে হয়, যেমন তাঁদের বাবা ছিলেন। এই শিশুরা যেন বেড়ে উঠে বাবার মতোই সাহসী, মানবিক, এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে একা দাঁড়ানোর শক্তি রাখে। শহীদ সন্তানদের লালনপালন যদি জাতি নিজ হাতে না নেয়, তবে জাতি কাকে লালন করবে?

এখন সময় আমাদের, বেঁচে থাকার দায় আমাদের। শহীদের মৃত্যু যে বার্তা রেখে গেছে, তা কেবল মোমবাতি জ্বালিয়ে পালন করলে হবে না। তাঁর অসমাপ্ত লড়াইকে শেষ করতে হবে আমাদের হাতে। প্রতিটি শহীদের নামে রাষ্ট্রকে পুনর্গঠন করতে হবে, যেন আর কোনো মনিরুলকে রক্ত দিতে না হয় শুধু বিবেকের জন্য।

তাঁর রক্ত জমাট বেঁধেছে শুধু কবরের মাটিতে নয়, আমাদের হৃদয়ে। যদি আমরা তা ভুলে যাই, তবে আমরাই হবো পরবর্তী হত্যার সাক্ষরকারী। অতএব জাগো, দাবি করো, এবং গড়ো এক বাংলাদেশ, যেখানে একজন মনিরুল হারিয়ে গেলেও তার স্বপ্ন বেঁচে থাকে প্রতিটি রাস্তায়, প্রতিটি শিশুর হাসিতে।

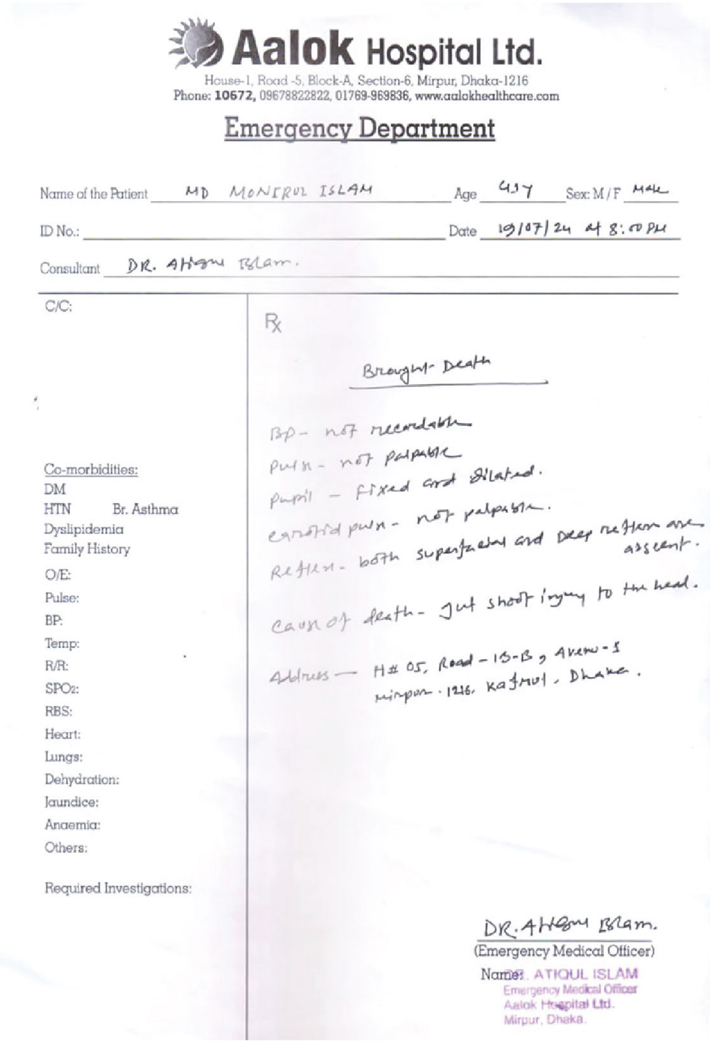

**Aalok Hospital Ltd.**
House-1, Road -5, Block-A, Section-6, Mirpur, Dhaka-1216
Phone: **10672**, 09678822822, 01769-969836, www.aalokhealthcare.com

Emergency Department

Name of the Patient: MD MONIRUL ISLAM Age: 41Y Sex: M / F: Male
ID No.:
Date: 19/07/24 at 8:00 PM
Consultant: DR. Atiqul Islam.

C/C:

Co-morbidities:
DM
HTN Br. Asthma
Dyslipidemia
Family History
O/E:
Pulse:
BP:
Temp:
R/R:
SPO2:
RBS:
Heart:
Lungs:
Dehydration:
Jaundice:
Anaemia:
Others:

Required Investigations:

Rx

Brought Death

BP - not recordable
Pulse - not palpable
Pupil - fixed and dilated.
carotid pulse - not palpable.
Reflex - both superficial and Deep reflex are absent.

Cause of death - gut shoot injury to the head.

Address — H# 05, Road - 13-B, Avenue-1 Mirpur - 1216, Kafrul, Dhaka.

DR. Atiqul Islam.
(Emergency Medical Officer)
Name: DR. ATIQUL ISLAM
Emergency Medical Officer
Aalok Hospital Ltd.
Mirpur, Dhaka.

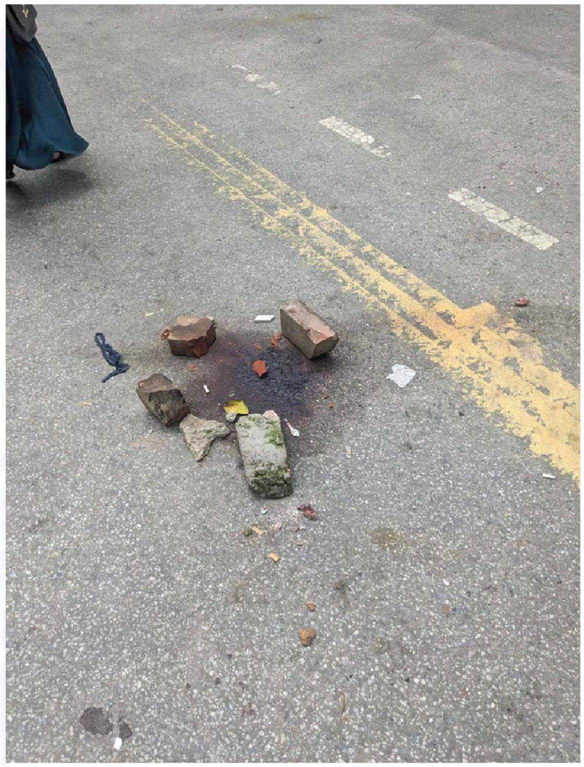

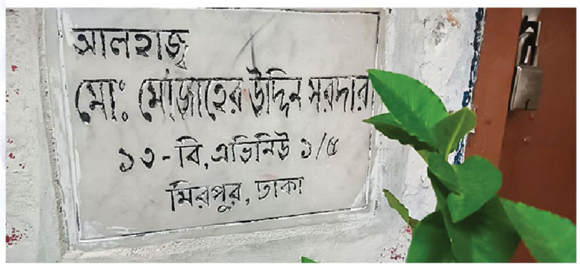


## এক নজরে শহীদ পরিচিতি

| | |
|---|---|
| নাম | : মো: মনিরুল ইসলাম |
| জন্ম তারিখ | : ২৫ আগস্ট ১৯৮৩ |
| বয়স | : ৪১ বছর |
| পেশা | : ব্যবসা |
| পিতা | : মোজাহের উদ্দিন সর্দার |
| মাতা | : বেগম রাবেয়া |
| বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা | : এভিনিউ১/৫ ,রোড-১৩বি, সেনপাড়া, মিরপুর-২, ঢাকা |
| শহীদ হওয়ার তারিখ | : ১৯ জুলাই ২০২৪ |
| মৃত্যুর সময় | : রাত ৮:৫০ |
| ঘটনার স্থান | : মিরপুর ২২ নম্বর রোডের আশেপাশে |
| মৃত্যুর স্থান | : মিরপুর ২২ নম্বর রোডের আশেপাশে |
| মৃত্যুর প্রেক্ষাপট | : গুলিবিদ্ধ হয়ে, আন্দোলনে অংশগ্রহণের সময় |
| মৃত্যুর কারণ | : গুলি বিদ্ধ হয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত |
| দাফন | : পরিবারের তত্ত্বাবধানে দাফন সম্পন্ন |

# যার রক্ত দিয়ে লেখা হলো আওয়ামী নিষিদ্ধ প্রতিবেদন

**শহীদ মো: আব্দুল নুর**

ক্রমিক : ৭৬৬

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৭৯

**শহীদের পরিচিতি**

মো: আব্দুন নুর, এক নাম, এক জীবন, এক অসমাপ্ত গল্প। বাবা মো: আবুল বাসার, মা মোসাম্মৎ আসমা খাতুন। দু'জনেই জীবিত, কিন্তু বেঁচে আছেন এক ছায়াচাপা শোকের নীচে, যেন প্রতিটি শ্বাসে মনের ভেতর রক্তের টানকার শব্দ শোনা যায়। নুর পেশায় সংবাদকর্মী ছিলেন। সত্যের অনুসন্ধানী, মানুষের জন্য তথ্যের পথিক। দুই সংবাদপত্রে তাঁর কলমের ছাপ, তাঁর চিন্তার তরঙ্গ অজস্র পাঠকের হাতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল শক্তি, জানাশোনা, যত্নের শব্দ। কিন্তু জুলাইয়ের বিদ্রোহ এসে বদলে দিলো সব। যখন রাস্তায় নেমে পড়ল শত শত বুক স্বাধীনতার তৃষ্ণায়, তখন নুর নেমে পড়লেন মাইক্রোফোন হাতে, আইডি কার্ড ঘাড়ে ঝোলাতে ঝোলাতে। তাঁর পরিচয়পত্রটি ছিল স্বাধীন সাংবাদিকতার শিলালিপি, সেটি আজ রক্তের সাক্ষী।

যুদ্ধ কীভাবে সঙ্গীত হয়ে ওঠে? প্রশ্নটা যেন কান্নায় মিশে গিয়েছিল সেদিন, যখন নুরের মাইকে ধরা পড়ল গুলির আওয়াজ, আর তাঁর আর্তনাদ হয়ে উঠল প্রতিবাদের নতুন স্লোগান। সেই ছোট্ট ক্যামেরা ফ্ল্যাশ, ঐ ডাস্টকোটের পকেটে থাকা পেন্সিল, সব বদলে গিয়েছিল রক্তের ছাঁচে। পরিবারের ভাষ্যে, "রক্তের দাগ এখনো যায়নি, অনেকবার ধোয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু রক্ত তো কেবল তরল নয়, তা তো ইতিহাস।" এই দাগ শুধু জামার নয় এগুলি এক মায়ের বুকের ভেতর চিরস্থায়ী ছবি হয়ে ওঠেছে।

নুরের ঘর আজ শূন্য, তার কণ্ঠস্বর শোনা যায় না, তার স্নিগ্ধ হাসি আর নেই, শুধুই স্মৃতির অবয়ব ভাসে দেয়ালে। স্ত্রী আগেই আলাদা হয়ে গেছেন। মেয়ে, হয়তো দিনের পর দিন মাদ্রাসার বোঝা সামলাচ্ছে, তার বুঝে ওঠা থেকে অনেক আগে হারিয়েছে বাবার সুর, বাবার সুরক্ষা।

**আন্দোলনের প্রেক্ষাপট – লাল জুলাইয়ের ইতিহাস**

২০২৪ সালের জুলাই, বাংলার রাজপথে ইতিহাস গড়ে উঠছিল, কিন্তু সে ইতিহাস রক্ত দিয়ে লেখা, কান্না দিয়ে ধুয়ে ফেলা। শহরের আকাশ যেন প্রতিদিন আরও লাল হয়ে উঠছিল। সূর্যাস্ত নয়, বরং আগুনের ধোঁয়া, গ্রেনেডের ঝাঁজ আর মানুষের আর্তনাদের ছায়া তাকে রাঙাচ্ছিল। কোটা সংস্কার আন্দোলন যা শুরু হয়েছিল ১ জুলাই এক ন্যায্য দাবি নিয়ে, তা ১৫ জুলাইয়ের পরই রূপ নেয় এক ভয়াবহ দমন-পীড়নের নাটকে। আর এ নাটকের মঞ্চে নামল ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, আর পুলিশের রক্তচক্ষু। যে চোখে ছিল রাষ্ট্রের শাসনের ভাষা, তাতে নেমে এল একটাই নির্দেশ- ভয় দেখাও, থামাও, নত করো।

কিন্তু প্রতিরোধ তো পাথরের মতো জমে উঠেছিল বহুদিন ধরে। তাই, রামপুরা থেকে মিরপুর, বনশ্রী থেকে তেজগাঁও সব জায়গা একটাই মুখোশ পড়ে ফুঁসে উঠল: প্রতিবাদের। ছাত্ররা দাঁড়িয়ে গেল খালি হাতে, বুক চিতিয়ে, যেন তারাই ছিল বুলেটপ্রুফ মানবপ্রাচীর। যারা গণতন্ত্রের পাঠ পড়ছিল বইয়ে, তারাই রাস্তায় শেখাতে লাগল কিভাবে সাহস শব্দের প্রতিরূপ হয়। সাধারণ মানুষ পর্যন্ত নেমে এল রাস্তার পাশে, কেউ খাবার দিল, কেউ পানি, আর কেউ স্রেফ চিৎকারে সঙ্গ দিল প্রতিবাদী ছাত্রদের। এ এক এমন সময়, যখন ভয় আর চুপ করে থাকার যুগ শেষ হচ্ছিল; শুরু হচ্ছিল লাল জুলাই নামক এক ব্যর্থ নয়, বরং বীরত্বময় বিপ্লবের সময়চিত্র।

আর ঠিক এই সময়েই উঠে এলেন আব্দুল নুর। একজন সংবাদকর্মী নন শুধু, এক জীবন্ত দলিল, এক ক্ষুদ্র কলম যিনি হয়ে উঠলেন সময়ের আয়না। তাঁর হাতে ছিল না অস্ত্র, ছিল একখানা নোটবই, একটা মাইক্রোফোন, আর গলায় ঝোলানো এক সাংবাদিকের পরিচয়পত্র, যেটা হয়ে উঠল রক্তের দলিল। তিনি শুধু ভিডিও করছিলেন না; তিনি গল্প জড়ো করছিলেন, বঞ্চিতদের কণ্ঠ তুলে ধরছিলেন, আর রাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন সত্যকে কবর দেওয়া যায় না।

আব্দুল নুর জানতেন, যে রাষ্ট্র সত্যের ভয় পায়, সে রাষ্ট্র সবচেয়ে হিংস্র। তিনি জানতেন, সাংবাদিকতা এক যুদ্ধ, যেখানে কলমই বন্দুক। তাই তিনি থামেননি। গুলি এসেছিল তাঁর দিকেও হয়তো তাঁকে থামাতে, হয়তো তাঁকে ভয় দেখাতে। কিন্তু তাঁর ক্যামেরা ছিল চালু, তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল দৃঢ়। যখন তিনি পড়ে গেলেন, তাঁর রক্ত ভিজিয়ে দিলো সেই রাস্তাটিকে, যেখান দিয়ে হাজারো প্রতিবাদী পা ফেলেছিল।

সে রক্ত মুছে ফেলা যায়নি, কারণ তা কেবল দেহ থেকে আসা রক্ত নয় তা ছিল সাহসের, চেতনার, এক নতুন স্বাধীনতার রক্ত, যা স্মার্টফোনের স্ক্রিন পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল দেশজুড়ে। মানুষ দেখেছিল সাংবাদিকদেরও গুলি করা হয়, সত্য বললেও মারা যেতে হয়। আর মানুষ ভুলেনি।

আজ লাল জুলাই শুধু আন্দোলনের দিন নয় এটা এক চেতনার নাম। সেটা কখনো অনলাইনের ট্রেন্ডিং নয়, সেটা হৃৎপিণ্ডে জেগে থাকা আগুন। আব্দুল নুর সেই আগুনে পুড়েছিলেন, জ্বলে উঠেছিলেন। আর সে আলোর তাপ আজো যারা বেঁচে আছে, তাদের বুকে জ্বলে, ছাই হয়ে যায় না।

লাল জুলাইয়ের ইতিহাস একদিন কেউ লিখবে ঠিকই কিন্তু শহীদেরা জানেন, তাঁদের রক্তই ছিল প্রথম খসড়া।

**যেভাবে শহীদ হন**

৫ আগস্ট, ২০২৪ এক বিভীষিকাময় বিকেল। আব্দুল নুর সেইদিনও বেরিয়েছিলেন খবর সংগ্রহ করতে। তার চোখে ছিল ক্লান্তি, কিন্তু লক্ষ্য অটুট সত্য খোঁজা, তা তুলে ধরা। অথচ রাজধানীর রাজপথ তখন আর কোনো খবরের ক্ষেত্র নয়; সে এক যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে শব্দ মানে শুধু স্লোগান নয়, গুলির আওয়াজও। পলকে পলকে পাল্টে যাচ্ছিল দৃশ্যপট। কোথাও কাঁদানে গ্যাস, কোথাও রক্ত, কোথাও মানুষের আর্তনাদ। সেদিনও তিনি কাঁধে ব্যাগ আর হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে ছুটছিলেন সত্যকে ক্যামেরাবন্দি করতে, ইতিহাসের মুখে আঙুল রাখতে।

ঠিক বিকেল চারটা। মো: আবুল বাসার, নুরের বাবা, একটি ফোন পান। অচেনা নম্বর, অচেনা কণ্ঠ। কণ্ঠ বলে, "আব্দুল নুর নামে কাউকে চিনেন?" একটা মুহূর্ত যেন ঘন হয়ে আসে, সময় যেন জমে ওঠে বুকের ভেতরে। তিনি জবাব দেন, "আমার ছেলে।" ওপাশ থেকে বলা হয়, "তাড়াতাড়ি মেডিকেলে আসেন।" কিন্তু এ ডাক শুধু হাসপাতালে যাওয়ার নয়। এ ডাকে ছিল এক শেষ বিদায়ের নিরব আকুতি। এটা এক লাশের নিমন্ত্রণ। এক পিতা যেন তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে হাঁটতে থাকেন, হৃদয়ের প্রতিটি কোণে আতঙ্কের ঢেউ।

রিকশায় ওঠেন বাবা, সঙ্গে ছোট ছেলে। পথের মোড়ে মোড়ে পুলিশ, গেট বন্ধ, রাস্তা জটিল। তাঁরা ঘুরে ঘুরে বাউনিয়া বাজার, ফ্লাইওভার, ইসিবি মোড় হয়ে সেনানিবাস পর্যন্ত হেঁটে যান। পায়ের নিচে ক্লান্তি, চোখে ঘুমহীন আশঙ্কা। হঠাৎ এক অজানা মোটরসাইকেল আরোহী তাঁদের থামান। না কোনো সংবাদকর্মী, না আত্মীয় তবুও মানুষ। সেই সহৃদয় মানুষ তাঁদের তুলে নেন, পৌঁছে দেন মুগদা মেডিকেলের ইমারজেন্সিতে।

সেখানে খোঁজেন 'রাকিব' নামের ছেলেটিকে যিনি ফোন করেছিলেন। রাকিব বলেন, "আমি যতক্ষণ লাশ হস্তান্তর না করি, ততক্ষণ আপনাদের পাশেই থাকব।" একটা ভরসার কণ্ঠ, অথচ গলায় নেমে আসা বিষণ্ণতা স্পষ্ট ছিল। এরপর তাঁরা যান মর্গে। সেখানে খুলে দেওয়া হয় এক পর্দা, একটি মৃতদেহ, মাথার পেছনের অংশ উড়ে গেছে গুলিতে। মেঝেতে লেগে থাকা গলিত রক্তে তা চেনা যায় না প্রথমে।

এই তো, এক সত্যসন্ধানী সাংবাদিক যার কলম প্রশ্ন করত, যার কণ্ঠ ছিল সাহসের প্রতিধ্বনি–সে পড়ে আছে মাটিতে, জড় পদার্থের মতো। তার ব্যাগ পড়ে আছে পাশে, ভেতরে হয়ত অর্ধলিখিত কিছু নোট, হয়ত কিছু ছবি। সে এখন আর প্রশ্ন করবে না, প্রতিবেদন বানাবে না, সে নিজেই হয়ে গেছে প্রতিবেদন, একটি রক্তাক্ত শিরোনাম।

রাত ৯টায় লাশ নেয়া হয় গ্রামের বাড়ির পথে। কোনো লাল কার্পেট ছিল না, কোনো রাষ্ট্রীয় সালাম নয়। তার মৃত্যু লাইভে ছিল না–ফেসবুকের স্ক্রিনে কেউ চিৎকার করেনি, ইউটিউব ভিডিওতে কেউ চোখ ভেজায়নি। এই মৃত্যু একান্তই নিঃশব্দ, একমাত্র পিতার চোখে ঠাঁই পাওয়া এক অশ্রুপাতের প্রতিবেদন। যেন রাষ্ট্র নিজেই খুন করল এক সাংবাদিককে, যেন প্রতিটি গুলি বলছিল "সত্য বললে মরতে হবে।"

এই মৃত্যু আমাদের সবার লজ্জা, আমাদের নিস্তব্ধতাই তার আসল খুনী। আজ আব্দুল নুর নেই, কিন্তু তার রক্ত লেগে আছে আমাদের চোখের পাতায় প্রতিবার চোখ বন্ধ করলেই যেন দেখি, এক সাংবাদিক মাটিতে পড়ে আছেন, পাশে পড়ে আছে তার কলম, যা এখনো কিছু বলতে চায়... তবে কেউ শোনে না।

**পরিবার ও বেদনার বিবরণ**

আব্দুল নুরের বাবা, মো: আবুল বাসার, এখনো রাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসেন। ঘড়ির কাঁটা থেমে থাকে ঠিক বিকেল চারটায়–যে সময় সেই ফোনটা এসেছিল। এক অচেনা কণ্ঠস্বর, এক অচেনা যন্ত্রণার প্রহর। তাঁর হৃদয়ে সেই মুহূর্ত এখনো রক্তাক্ত ঘা হয়ে বাজে। মাথার ভেতর ফিরে ফিরে আসে সেই প্রশ্ন: "আব্দুল নুর নামে কাউকে চিনেন?"–জীবনের এমন এক প্রশ্ন, যার উত্তর দিতে গিয়ে একটা জীবন শেষ হয়ে গেল।

আর মা–আসমা খাতুন–তাঁর শোক অন্যরকম। তিনি কিছু বলেন না, কারও চোখে তাকান না, শুধু চুপচাপ মাথা নিচু করে থাকেন। দিনের পর দিন, রাতে রাতে, শাড়ির আঁচলে মুছে ফেলেন সেই অশ্রু, যা শব্দহীন হয়ে ঝরে পড়ে। একদিন তিনি স্বপ্ন দেখতেন–ছেলের হাত ধরে ওমরাহ করবেন, কিংবা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পরিবারের জন্য একটা ছোট বাড়ি কিনবেন। আজ সেই বাড়ির স্বপ্ন ভেঙে ছড়িয়ে আছে একটা মৃত শরীরের পাশে, এক কোলাহলহীন ঘরে।

আব্দুল নুরের স্ত্রী আগেই সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, রেখে গিয়েছিলেন একটি মেয়ে বয়স কম, এখনো মাদ্রাসায় পড়ে। সে কি বুঝবে রাষ্ট্র কীভাবে তার বাবার মাথা উড়িয়ে দিয়েছে? সে কি জানবে, বাবা নামের মানুষটি কেবল গুলি খেয়েই মারা যাননি, বরং তাঁর ওপরে জেগে আছে নীরব সমাজের তীব্র অবহেলা, কাঁধে চাপানো এক বুক নিরুত্তর প্রশ্ন?

এই পরিবার খুব সাধারণভাবে চলত। না কোনো বিত্তের দম্ভ, না কোনো আরামের অভ্যাস। দুই বেলা খাওয়া, কিছু সঞ্চয়, আর একরাশ স্বপ্নই ছিল তাঁদের সম্পদ। এখন সেই সংসারে নেই উপার্জনক্ষম কেউ। আছে শুধু এক ভয়ঙ্কর শূন্যতা, যা প্রতিদিন ঘরের বাতাসে হাহাকার হয়ে বাজে।

তবু তাঁরা কারো কাছে হাত পাতেন না। আবুল বাসার আজো সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রদের দেখলে বলেন, "আমার ছেলেও এসব করত।" কিন্তু কণ্ঠের ভেতর সেদিনের গুলি ঢুকে গেছে, কথা যেন আর বের হয় না। তাঁরা চায় না দান, চায় না সহানুভূতির অভিনয়; তাঁরা চায় ন্যায্য স্বীকৃতি। চায় রাষ্ট্র মুখ খুলুক, চায় গণমাধ্যম অন্তত একটিবার বলুক আব্দুল নুর শহীদ হয়েছেন সত্য বলার অপরাধে।

কিন্তু চারদিক থমথমে। মিডিয়া মুখ ঘুরিয়েছে, মন্ত্রীদের ঠোঁট সেলাই, প্রতিবাদীরা বাঁচতে ব্যস্ত। আব্দুল নুরের লাশ শুধু ফেসবুক স্ট্যাটাস হয়ে পড়ে আছে কেউ সেভ করে রাখেনি, কেউ আর পড়ে

না। অথচ তাঁর মৃত্যু নিঃশব্দ নয়। তাঁর চিৎকার আজো বাতাসে কাঁপে, তাঁর শেষ চোখের চাহনি যেন মেঘের ভেতর জ্বলে ওঠা বিদ্যুতের মতো গর্জন করে বলে,

"আমি গুলি খেয়েছি, কিন্তু এখনো প্রশ্ন করে যাই তোমরা কোথায়?"

এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। আছে শুধু একটা নিঃসঙ্গ পরিবার, একটা রক্তাক্ত স্মৃতি, আর এক যুদ্ধ–যা নীরবতাকে প্রতিনিয়ত প্রশ্নবিদ্ধ করে।

**প্রস্তাবনা ও উত্তরাধিকার**

একজন শহীদের কন্যা যেন অনাথ হয়ে না যায় এই দাবিটাই হোক আমাদের জাতিগত বিবেকের প্রথম পরীক্ষা। রাষ্ট্রের সংবিধান যতই পাতায় লেখা থাকুক, ন্যায় যদি রক্তাক্ত রাস্তার ধুলায় পড়ে থাকে, তবে আমাদের সমস্ত নীতি কেবল শব্দের নকশা হয়ে দাঁড়ায়। আব্দুল নুর শহীদ হয়েছেন এই কথাটির অর্থ কেবল নয় যে তিনি প্রাণ দিয়েছেন; অর্থ এই যে তাঁর জীবনের প্রতিটি শ্বাস ছিল এক নীরব প্রতিবাদ, প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল এক প্রতিজ্ঞা সত্য বলার, অন্যায়ের কাছে না ঝুঁকার। তাঁর মৃত্যুর দায় শুধু তাঁর পরিবারের নয়, এই সমাজের, এই রাষ্ট্রের, এই সময়ের।

তাঁর কন্যার ভবিষ্যৎ যেন নিরাপত্তাহীন অন্ধকারে ডুবে না যায়, এটাই হোক জাতির প্রথম প্রস্তাব। সরকারি শিক্ষাবৃত্তি তাঁর প্রাপ্য, কারণ তাঁর জীবনের প্রথম শিক্ষক তাঁর পিতা নিজেই জীবনের সর্বোচ্চ পাঠ দিয়েছেন নিজের প্রাণ দিয়ে। নিয়মিত আর্থিক সহায়তা, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, ও তার মাদ্রাসার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার নেওয়া রাষ্ট্রের একটি মৌলিক দায়িত্ব হয়ে উঠতে হবে। কোনো করুণা নয় এটি একটি শহীদের প্রতি ন্যায্যতা।

আমরা চাই, সরকার একটি ক্ষুদ্র ব্যবসার পুঁজি দিয়ে পরিবারটিকে স্বনির্ভর করুক যাতে তাদের হাত পাততে না হয়, মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে। চাই, মেয়েটি উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত যেতে পারুক সে বড় হয়ে যেন বলতে পারে, "আমার বাবা শহীদ ছিলেন, আর আমি তার উত্তরাধিকার।"

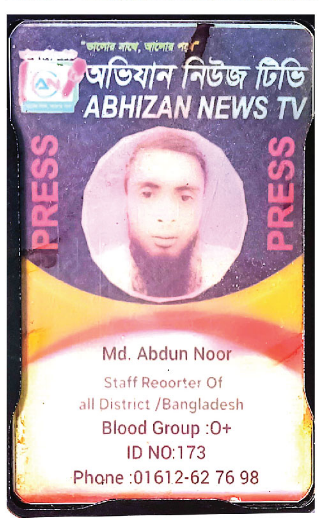


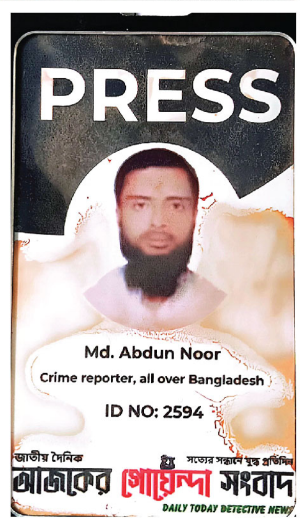


আজকের প্রজন্ম যেন জানে আব্দুল নুরও এই মাটির সন্তান ছিলেন। তিনি কোনো বীরের পোশাক পরেননি, কেবল হাতে ছিল একটি কলম, আর চোখে ছিল কিছু প্রশ্ন। সেই কলমটিকে গুলি থামিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তার স্বপ্নকে থামাতে পারেনি। তাঁর রক্ত শুধু রাজপথে নয়, আমাদের বিবেকেও লেগে আছে। তাঁর মৃত্যু যেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় একটি গুলি কেবল একটি প্রাণ থামায় না, সেটি ইতিহাসের কলম ভেঙে ফেলে, ভবিষ্যতের গল্প থামিয়ে দেয়।

তাই আজ প্রশ্ন নয়, উত্তর চাই আমরা কীভাবে এই মৃত্যুকে মূল্য দেব? কীভাবে বাঁচিয়ে রাখব সেই চেতনা, যা একদিন রাজপথে নীরবে রক্ত হয়ে ঝরেছিল?

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ আব্দুন নুর
Name: MD.ABDUN NOOR
পিতা: মোঃ আবুল বাসার
মাতা: মোছাঃ আছমা খাতুন
Date of Birth: 01 Apr 1995
ID NO: 6457927850

## এক নজরে শহীদ পরিচিতি

| | |
|---|---|
| নাম | : মো: আব্দুন নুর |
| পেশা | : সংবাদকর্মী (ক্রাইম রিপোর্টার, আজকের গোয়েন্দা সংবাদ; স্টাফ রিপোর্টার, অভিযান নিউজ টিভি) |
| জন্ম | : ০১ এপ্রিল ১৯৯৫ |
| পিতা | : মো: আবুল বাসার |
| মাতা | : মোছা: আছমা খাতুন |
| স্ত্রী | : বিচ্ছিন্ন |
| সন্তান | : ১ কন্যা (মাদ্রাসা শিক্ষার্থী) |
| মৃত্যুর স্থান | : ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল |
| শহীদ হওয়ার তারিখ | : ০৫ আগস্ট ২০২৪ |
| আঘাত | : মাথায় গুলি |
| মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা | : রক্তাক্ত আইডি কার্ডসহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত হিসেবে নিবন্ধিত |
| দাফন | : নিজ গ্রামের বাড়ি, বাগেরগাঁও, উস্থি, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ |
| রক্তের গ্রুপ | : ও + |
| জন্মস্থান | : ময়মনসিংহ |
| বর্তমান ঠিকানা | : বাসা/হোল্ডিং: ৪৩, সেক্টর: ১০, উত্তরা পশ্চিম, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ডাকঘর: ২২৩৩ |
| স্থায়ী ঠিকানা | : বাগেরগাঁও, উস্থি, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ |
| মেডিকেল কেস আইডি | : ২৪৯৯২ |
| গেজেট নং শহীদ | : ৭৬৫ |

**শহীদ মো: সালাউদ্দিন সুমন**
ক্রমিক : ৭৬৭
আইডি : ঢাকা সিটি ১২৯

# যার রক্তে ভিজেছিল মসজিদের পথ

**শহীদের পরিচিতি**

মো: সালাউদ্দিন সুমন। বয়সে মধ্যবয়সী, হৃদয়ে কৈশোরের স্বপ্ন ধরে রাখা এক আশ্চর্য পুরুষ। ১১ অক্টোবর ১৯৭০ সালে জন্ম নেওয়া এই মানুষটি ছিলেন না কোনো মহারথী, রাজপথে দাপিয়ে বেড়ানো কেউ নন। তিনি ছিলেন নিঃশব্দ সাহসী, গম্ভীর অথচ কোমল। তাঁর পিতা শামসুদ্দিন মোল্লা এবং মা শামসুন্নাহার দু'জনেই প্রয়াত, কিন্তু তাঁদের রেখে যাওয়া মূল্যবোধ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল এই সন্তানের ভেতরে। পাঁচ ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন নীরব পথপ্রদর্শক। ঝগড়া-ফ্যাসাদে নেই, আত্মপ্রচারে নেই, তবু সবাই জানতো "যদি সালাউদ্দিন ভাই বলেন, তাহলে সেটা ঠিকই হবে।" এই মানুষটির জীবনের ছন্দ ছিল বিনয়, আর সুর ছিল শান্তি। তিনি কথা বলতেন কম, কিন্তু কাজ করতেন গভীরতা নিয়ে। স্ত্রী ফাতেমা আক্তার একজন সাধারণ গৃহিণী, আর তাঁদের একমাত্র সন্তান আদিব রেহান এখনো ছাত্র। বাবার মতো মাটির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে, চোখে এক অস্পষ্ট কিন্তু আগুনঝরা ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি।

পরিবার ছিল তাঁর ভেতরের মন্দির, আর প্রতিবেশীরা ছিল তাঁর প্রতিদিনের ইবাদতের অংশ। এলাকার মানুষ তাঁকে দেখত একটি ভরসার মুখ হিসেবে। কোনোদিন তিনি কারো মুখে কটু কথা দেননি, বরং বিপদে-আপদে ছুটে যেতেন নিঃশব্দে, ঠিক যেন কেউ একজন আড়াল থেকে সব ঠিক করে দিচ্ছে।

তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় ছিল: ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির ভাইস প্রেসিডেন্ট। কিন্তু সত্যি বলতে কি, রাজনীতিই তাঁর মূল পরিচয় নয়। তার মানবতা ছিল। নেতা বললে যেমন রক্তচক্ষু, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর উচ্চকণ্ঠ কল্পনায় আসে তাঁর ভেতর ছিল তার বিপরীত; সেখানে ছিল বিবেচনা, করুণা আর সততার মৌন প্রতিশ্রুতি। তিনি নিজের পরিচয় কখনো উচ্চারণ করতেন না, কিন্তু যাঁরা তাকে চিনতেন, জানতেন। এই মানুষটি যখন পাশে থাকেন, তখন কেউ একা থাকে না।

২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের দিনগুলোতে ১৮ ও ১৯ তারিখে তিনি উপস্থিত ছিলেন আন্দোলনের মাঠে। নেতৃত্ব দিতে নয়, বরং অভিভাবকের মতো দাঁড়াতে, যেন কেউ একজন পথহারা না হয়ে পড়ে। যে চোখে অন্যায়কে দেখলে ক্ষোভ জ্বলে উঠতো, সেই চোখেই সন্তানের জন্য স্নেহ ছিল, প্রতিবেশীর জন্য উদারতা ছিল। নেতার ভাষণ নয়, তাঁর উপস্থিতি ছিল ভাষাহীন প্রতিরোধ যেখানে নীরবতা দিয়েই অন্যায়ের গলা চেপে ধরা হয়।

এ রকম মানুষ আর কয়জনই বা হয়? যিনি জীবনে আলো ছড়ান, কিন্তু নিজের নামে আলো চান না। সালাউদ্দিন সুমন ছিলেন স্রোতের বিপরীতে হাঁটতে অভ্যস্ত এক নৌকা, যাঁর পাল ছিল বিশ্বাস, দাঁড় ছিল নৈতিকতা, আর গন্তব্য ছিল মানুষের ভালোবাসা। এমন মানুষ শুধু শহীদ হন না। তাঁরা প্রতিদিনকার জীবনের ভিত গড়ে দিয়ে যান, নীরবে। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর ছায়া যেন থেকে যায়, মাটির গায়ে গায়ে। কেননা, শহীদ হওয়া মানে শুধু প্রাণ হারানো নয় সেটা এক চিরন্তন আদর্শে রূপ নেওয়া। সালাউদ্দিন সুমন এখন সেই আদর্শের নাম।

**আন্দোলনের প্রেক্ষাপট – নিষ্ঠুর জুলাই ও মানুষের মেরুদণ্ড**

২০২৪ সালের জুলাই ছিল না কোনো সাধারণ মাস তা ছিল এক মহাকাব্যের দৃশ্যপট, যেখানে প্রতিটি দিন রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে, আর প্রতিটি রাত ছিল প্রতীক্ষার গহ্বর। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন কিছু সময় আসে, যখন সময় নিজেই থমকে দাঁড়ায় আর মানুষ নিজের ছায়াকে জিজ্ঞাসা করে: "তুই এখনো মানুষ আছিস তো?" সেই জুলাই ছিল এমনই এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা, যখন রাষ্ট্রের লাঠি-গুলির সামনে দাঁড়িয়েছিল তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-নারী, ছাত্র-শ্রমিক এক কাতারে। কোটা সংস্কারের দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা ক্রমে গড়িয়ে পড়ে এক গণপ্রতিরোধের নদীতে যেখানে একমাত্র পাথেয় ছিল ন্যায়বিচার আর মর্যাদার জন্য অবিচল দৃঢ়তা।

এই আন্দোলন ছিল সেইসব মানুষের, যারা রাতের খাবার ফেলে রাস্তায় নেমেছিল। যারা জানত, গুলি চলবে তবুও পেছনে ফেরেনি। যারা বিশ্বাস করত, "আমরা মানুষ, তাই দাবিও আমাদের ন্যায্য।"

এবং ঠিক এই আগুনঝরা পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা যায় সালাউদ্দিন সুমনকে। রাজনীতির চেনা ছকে নয়, বরং এক জনপদ-ভিত্তিক বিবেকের প্রতিনিধি হিসেবে। তিনি বনশ্রী, রামপুরা, হাতিরঝিল হয়ে হেঁটে বেড়িয়েছেন জনতার মাঝেকোনো মাইক ছাড়াই তাঁর কণ্ঠ হয়ে উঠেছিল দ্রোহের ঘোষণা।

১৮ ও ১৯ জুলাই। এই দুই দিন যেন হয়ে ওঠে এক জাতির আত্মজাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণ। একদিকে ছাত্র-যুবকদের রক্তে ভিজে ওঠে রাজপথ, অন্যদিকে সালাউদ্দিন ভাইয়ের মতো মানুষদের উপস্থিতি সেই রক্তের গাঢ়তায় যোগ করে অর্থ। তিনি ছিলেন না মিছিলে স্লোগান দেওয়া বাহবা-কামী নেতা, তিনি ছিলেন মাঠের একজন শান্ত সৈনিক যার চোখে প্রতিটি তরুণের সম্ভাবনা, প্রতিটি বুলেটের দিকে তর্জনী তোলা প্রতিবাদ ছিল স্পষ্ট। তিনি বলতেন, "আমরা জিতবো, কারণ আমরা সত্যের পক্ষে" এ কথার মধ্যে ছিল না কোনো নাটকীয়তা, ছিল জীবনের ঝাঁকুনি দিয়ে গড়ে ওঠা বিশ্বাস।

তাঁর রাজনীতি ছিল পরিষ্কার কিন্তু তাঁর আন্দোলন ছিল রাজনৈতিক পরিচয়-পার হওয়ার। এলাকাবাসীর কাছে তিনি শুধু একজন নেতা ছিলেন না, ছিলেন আশ্রয়, ছিলেন নির্ভরতার আর্তনাদ। কেউ বলেননি "উনি যাবেন তো?" সবাই জানত "উনি থাকবেনই।" একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব কেমন হলে, পেছনে শত মানুষ চোখ বুজে দাঁড়াতে পারে? তাঁর অস্তিত্বই ছিল এক আড়ালহীন প্রতিরোধ।

কিন্তু কেউ তখনও ভাবেনি, যিনি সারা জীবন মানুষের জন্য রাস্তায় ছিলেন, তিনিই একদিন রাস্তাতেই রক্ত দেবেন। শহীদ হবেন মানুষের মর্যাদা রক্ষার দামে। সালাউদ্দিন সুমনের মৃত্যু ছিল না

কোনো পরিসমাপ্তি তা ছিল একটি প্রশ্নচিহ্ন, যা রাষ্ট্রের প্রতি ছুড়ে দেওয়া হলো: "আর কত?" তাঁর রক্ত এই প্রশ্নের উত্তর চায়, আর আমরা যারা বেঁচে আছি আমাদের মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে বাধ্য করে।

এই জুলাই আমাদের শিখিয়েছে মানুষ মরলে ইতিহাস হয়, আর বাঁচলে দায়িত্ব নেয়। সালাউদ্দিন ছিলেন সেই মানুষ, যিনি দুটোই হলেন। শহীদের রক্তে লেখা এই অধ্যায় যেন বলে "ভয় পেও না, কারণ সত্যের পাশে রক্ত দিলে তা নদী হয়, আর নদী পথ খুঁজে নেয়, আগুনের মাঝেও।"

### যেভাবে শহীদ হন – রক্তে লেখা এক বিকেলের শেষ কবিতা

১৯ জুলাই ২০২৪। ঘড়ির কাঁটা ঠিক বিকেল ৫টা ছুঁইছুঁই আর দক্ষিণ বনশ্রী ২ নম্বর জামে মসজিদের সামনের বাতাসে তখনো ছিল রোজকার গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদ আর কিছুটা বারুদের গন্ধ। সেই জায়গাটা তাঁর পরিচিত ছিল সালাউদ্দিন সুমন বহুবার দাঁড়িয়েছেন সেখানে। নামাজের জন্য, মানুষের খোঁজখবর নিতে, কারো বিপদ শুনে পাশে থাকতে কিংবা নিঃশব্দে কাউকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। তেমনই আরেকটা দিন ছিল সেদিন তবে একটু আলাদা। সেটা ছিল এক বিপ্লবী জুলাইয়ের দিন, যে দিনগুলোতে চারপাশের দেওয়ালগুলোও যেন ফিসফিস করে বলছিল, "এবার কিছু বদলাতে হবে।"

সেদিন তিনি বেরিয়েছিলেন আন্দোলনের খবর নিতে। ছাত্ররা কেমন আছে, আহত হয়েছে কেউ কি না, কারো ওষুধ লাগছে কি না, এমনই কিছু মানবিক দায়ে। কোনো ব্যানার ছিল না হাতে, না ছিল দলীয় প্রতীক। শুধু ছিলেন একজন মানুষ, যিনি মানুষের পাশে দাঁড়াতে জানতেন। আর ঠিক তখনই একটি গুলি এসে ছিঁড়ে দেয় শান্তির গালিচা। ঠোঁটের বাঁ দিকে লাগে গুলিটি, যেন কথা বলার জায়গাটাকেই নিশানা করা হয়েছিল মানবতার কণ্ঠস্বর থামিয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য চেষ্টা।

কে চালিয়েছিল গুলি? কেউ জানে না। হয়তো সেই অদৃশ্য বাহিনীর কেউ, যারা ভীষণ ভয় পায় বিবেকবান মানুষকে। উপস্থিত লোকেরা দৌড়ে এসে ধরেন তাঁকে, রক্তে ভিজে যায় তাঁর জামা, আর সেই মসজিদের সামনে থেকে শুরু হয় এক হৃদয়ভাঙা যাত্রা মুগদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দিকে। সময় যেন তখন থেমে গেছে, চারপাশের শব্দ থমকে গেছে, শুধু গাড়ির ইঞ্জিন আর মানুষের দৌড়ের শব্দে বোঝা যাচ্ছিল জীবন একটা সূক্ষ্ম দড়ির ওপর হেঁটে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই, চিকিৎসকেরা জানান তিনি আর নেই। এই "আর নেই" শব্দদুটো যেন শুধুই এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘোষণা নয়, বরং একটা আদর্শ, একটা নির্ভরতার, একটা যুগসন্ধিক্ষণের হৃদয়বিদারক পতন। মসজিদ থেকে হাসপাতাল, হাসপাতাল থেকে লাশবাহী গাড়ি, তারপর কবর এই চক্রটি ঘুরে যায় এত দ্রুত, এত শোকাতুরভাবে যে, পরিবার তখনো ঠিকমতো কান্নাও শুরু করতে পারেনি। তাঁর স্ত্রীর হাত তখনও হয়তো ওষুধ কেনার জন্য পয়সা খুঁজছিল ব্যাগে, আর তাঁর ছেলে জানতও না বাবা আর ফিরবেন না।

এই মৃত্যু ছিল না কেবল এক ব্যক্তির; এটি ছিল জনতার আশা ভরসার উপড়ে ফেলা শেকড়। এক রক্তাক্ত বিকেলে, যেখানে একজন ভদ্র, শান্ত, অমায়িক মানুষ পড়ে রইলেন রক্তাক্ত ফুটপাথে, এই রাষ্ট্র আর সমাজ আমাদের শেখালো ভালো মানুষরাও নিরাপদ নয়। এমন মৃত্যুতে কেবল ক্ষোভ জন্মায় না, জন্মায় এক গভীর, গোপন শোক যেটা বুকের ভেতরে জ্বলে, নিঃশব্দে পুড়ে যায়।

এখানে শেষ হয় না কিছু বরং শুরু হয় এক অদৃশ্য শপথ। শহীদ সালাউদ্দিন সুমনের মুখ থেমে গেলেও, তাঁর রক্ত বলতে থাকে: "মানবতার পক্ষে কথা বলার জন্য যদি ঠোঁট হারাতে হয়, তবে আমি আগেও দাঁড়াতাম, আজও দাঁড়াব।" তাঁর মৃত্যু শুধু ইতিহাস নয় এটি এক জাতির বিবেকের গায়ে দেওয়া দাগ, যা সহজে মুছবে না, কখনোই না।

### পরিবার ও সহানুভূতির দায় এক নিঃশব্দ শোকগাথার দীর্ঘশ্বাস

একটি পরিবার, যাদের রক্তে এখনো জেগে আছে সালাউদ্দিন সুমনের স্পর্শ। কিন্তু সেই রক্তে এখন ব্যথার উত্তাপ, হাহাকারের ছাপ, আর এক ধরনের বোবা নিঃশব্দতা যেটা শুধু তারা বুঝে, যারা প্রিয়জন হারিয়েছে অকালেই, অকথিত কোনো যুদ্ধে।

তাঁর স্ত্রী, ফাতেমা আক্তার একজন গৃহিণী, এখন জীবনযুদ্ধের এক অনভ্যস্ত সেনানী। চোখে জল নেই, কিন্তু সেই জল শুকিয়ে গেছে বলেই নয় বরং বেদনাটা এত গাঢ়, এত নীরব, যে চোখ আর জানে না কিভাবে কাঁদতে হয়। তিনি শুধু প্রশ্ন করেন নিরবে, "ভালো মানুষরা কেন আগে চলে যায়?" একটা প্রশ্ন যার উত্তর নেই রাষ্ট্রের কাছে, নেই সমাজের কাছেও। আর ছেলে, আদিব রেহান তাকে বলা হয় ছাত্র, কিন্তু এখন সে এক অস্থায়ী অনাথ। বাবার শেষ কথাগুলোও সে জানে না, শেষ ছোঁয়াটা ছিল না তার ভাগ্যে।

একটা সময় এই পরিবারটি "মোটামুটি" চলত। একরকম চুপচাপ শান্তিতে, খুব বেশি চাওয়া ছিল না তাদের সালাউদ্দিন কষ্ট করে হলেও চালিয়ে যেতেন। তিনি ছিলেন জীবিকার মূল স্তম্ভ, কেবল অর্থের নয় ভরসার, নিরাপত্তার, নৈতিকতার। সেই স্তম্ভ এখন কবরের মাটির নিচে, আর পুরো সংসার যেন ঢলে পড়ে আছে এক বিষণ্ন ঢেউয়ের ভেতর।

এই পরিবার কারো কাছে করুণা চায় না। তারা কারো দরজায় হাত পেতে দাঁড়ায়নি, দাঁড়াবেও না। তবে তারা চায় একটুকু স্বীকৃতি যে মানুষটি তাদের জন্য শহীদ হয়েছেন, তাঁকে যেন মানুষ মনে রাখা হয়। তারা চায় একটুকু সম্মান যা একজন শহীদের পরিবারের প্রাপ্য। রাজনীতি সালাউদ্দিনকে পরিচিতি দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই রাজনীতি তার পরিবারের জন্য কিছু রেখে যায়নি শুধু রেখে গেছে রক্তমাখা জামা, আর এক ভয়াবহ ভবিষ্যৎ যেখানে বাবা বলে ডাকার কেউ আর নেই।

**শহীদ রানা তালুকদার**
ক্রমিক : ৭৬৮
আইডি : ঢাকা সিটি ১৩০

# এক স্বপ্নবাজ পিতার ছিন্ন হৃদয় আর বিদ্রোহী আত্মার নাম

**শহীদ পরিচিতি**

একটি নাম, একটি সময়, একটি গল্প,রানা তালুকদার। জন্ম ১৯৯২ সালের ৩ মে, উত্তরা আজমপুরের এক মধ্যবিত্ত ঘরে। বাবার নাম মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মায়ের নাম রুবি তালুকদার। একটি সাধারণ পরিবার, কিন্তু এই 'সাধারণ' শব্দটির আড়ালে লুকিয়ে ছিল অসাধারণ এক মনুষ্যত্বের দীপ্তি। মৃত্যুর সময় বয়স ছিল মাত্র ৩২। একটি দেশের জন্য যুবার বয়স, বিপ্লবের বয়স। পেশায় ছিলেন গাড়িচালক ও কন্ট্রাক্টর, শহরের ক্লান্ত রাস্তাগুলোর নীরব সাক্ষী; কিন্তু পরিচয়ে ছিলেন তার চেয়েও অনেক বেশি একজন অমায়িক মানুষ, স্বপ্নবাজ পিতা, প্রতিবেশীদের ভরসার ঠিকানা এবং এক কাঁপতে থাকা দেশে পরিবর্তনের এক সাহসী পদধ্বনি।

তাঁর জীবন ছিল সাদামাটা, কিন্তু অন্তরের ভিতর এক অদম্য আগুন লুকিয়ে ছিল। স্ত্রী রানু আর একমাত্র তিন বছরের ছোট ছেলেটিকে নিয়ে ছিল তাঁর সংসার। এই ছোট সংসারই ছিল তার সবটা, আর সেই ছোট ছেলের জন্যই তার হৃদয়ে জ্বলে উঠেছিল এক আলোকিত স্বপ্ন "হাফেজ বানাবো আমার ছেলেটারে।" এই স্বপ্নই ছিল তাঁর দুনিয়ার সেরা প্রকল্প। দিনে শ্রমিকের মতো ঘাম ঝরাতেন, রাতে বাবার মতো মাথা চুলকাতেন, কিন্তু মাথা নত করতেন না কখনো।

রানা ছিলেন প্রতিবেশীদের কাছে একজন "মানুষ" আধুনিক শহরে যেটি বিলুপ্তপ্রায় একটি শব্দ। কারো ঘরে চিকিৎসার দরকার? রানা আসবে। কারো ছেলে বখে গেছে? রানা বুঝাবে। একা মা ছেলের জন্য কাঁদছে? রানা পাশে দাঁড়াবে। শহর যেখানে নিঃস্বার্থতা ভুলে গিয়েছে, সেখানে রানা ছিল সেই পুরনো যুগের এক মানবিক দীপ্তি নতুন সময়ের চোখে সেকেলে, কিন্তু বিপ্লবের ভাষায় অনন্ত।

তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় পরিচয় এসেছে মৃত্যুর পর শহীদ। কিন্তু এই শব্দের পেছনে লুকিয়ে আছে যে মনুষ্যত্ব, যে নীরব সাহস, যে অসমাপ্ত স্বপ্ন, তা কোনো তালিকা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে তিনি ছিলেন না কোনো নেতার তালিকায়, কোনো পোস্টারেও তার ছবি ছিল না। কিন্তু বিপ্লবের মূল হৃদয়টা তো এইরকম মানুষদের দিয়েই গড়ে ওঠে। রাজপথে যে রক্ত ঝরে, তা অনেক সময় কোনো ব্যাজধারী নেতার নয়, বরং রানার মতো নীরব যোদ্ধাদের।

তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে, ন্যায় বিচারের পক্ষে, ভবিষ্যতে সন্তানের নিরাপত্তার জন্য। তিনি নামাজ পড়ে রাস্তায় নেমেছিলেন, হাতে অস্ত্র ছিল না, কিন্তু চোখে ছিল আগুন। নিজের কথা না ভেবে ভগ্নিপতির চোখে চোখ রেখে বলেছিলেন, "ভাইদেরকে গুলি করে মারছে, আমি একটু দেখে আসি।" সেই 'দেখে আসা'-ই ছিল ইতিহাসের দিকে এক চূড়ান্ত পদক্ষেপ।

শহীদ রানা তালুকদার আমাদের স্মৃতিতে থেকে যাবেন একজন অশ্রুসজল পিতা, একজন নির্ভীক প্রতিবাদী, এবং একজন স্বপ্নবান নাগরিক হিসেবে। তিনি প্রমাণ করে গেছেন, বিপ্লবের সোনালি মানচিত্র আঁকে কেবল তারাই, যারা জীবনের ভেতরেই মৃত্যু বয়ে নিয়ে হাঁটে, যারা সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য নিজের বর্তমান উৎসর্গ করে দেয়। রানার নাম আমরা ভুলবো না, ভুলতে পারবো না, কারণ সে-ই আমাদের সময়ের মুখপাত্র একজন নীরব শহীদ, যার রক্তে রাঙা হয়েছে ইতিহাসের রাজপথ।

**আন্দোলনের প্রেক্ষাপট : আগুনের জুলাই ও রানার পদধ্বনি**

২০২৪ সালের জুলাই মাস, ঢাকার আকাশ তখন আর নীল ছিল না ছিল ধূসর, গুমোট এবং প্রতিদিন গুলির শব্দে ভাঙা। বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল শুধু বারুদের ঘ্রাণে নয়, মানুষের ভিতরের ক্ষোভ, দীর্ঘবছরের শোষণ, অবহেলা আর প্রতারণার এক অগ্নিঝরা প্রতিক্রিয়ায়। যেন পুরো শহর জেগে উঠেছিল এক দীর্ঘ নিঃশ্বাসের পর একটা গোঙানি, যা যুগের পর যুগ ধীরে ধীরে জমে গিয়েছিল এই দেশের মাটিতে।

পুলিশের রাবার বুলেট, টিয়ার গ্যাস, প্রহসনের মতো সাজানো নির্বাচনের ফলাফল সবকিছু মিলিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিল এক নতুন প্রজন্ম। ওরা আর ভয় পেত না, কারো দয়ার প্রার্থী ছিল না, আর ওদের চোখে ছিল একরাশ আঘাত, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ছিল প্রত্যয়। "তুমি কে, আমি কে? রাজাকার রাজাকার!" এই তীব্র ধ্বনি যেন শহরের প্রতিটি দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা মারত, রক্তাক্ত করে তুলত পাথরের মতন বিবেকহীন শাসকদের।

এই স্লোগান শুধু আওয়াজ ছিল না, ছিল আত্মার ক্রন্দন, ইতিহাসের পুঞ্জীভূত রাগ। আর সেই রাগকে হৃৎপিণ্ডে ধারণ করে রাস্তায় নেমেছিলেন রানা তালুকদার গাড়িচালক, কন্ট্রাক্টর,

একজন পিতা, একজন প্রতিবেশী, কিন্তু তার চেয়েও বড় পরিচয় একজন নীরব বিপ্লবী। রাজনীতির ফটোফ্রেমে তার ছবি ছিল না, কিন্তু রাস্তায় তার পায়ের ধ্বনি ছিল ইতিহাসের তাণ্ডব।

তিনি রাস্তায় নেমেছিলেন ধর্মের টানে নয়, দলের টানে নয়, বরং নেমেছিলেন হৃদয়ের ডাকে। মাগরিবের নামাজের পর তিনি যখন আবারো বেরিয়ে গেলেন, সেটা ছিল আত্মার এক নীরব আহ্বানে সাড়া দেওয়া। বাড়িতে ছোট ছেলে আর অসুস্থ স্ত্রী রেখে তিনি যাননি শুধু দেখতে কী হচ্ছে, তিনি গিয়েছিলেন যেন শেষ পংক্তিটা জুড়ে দিতে, ইতিহাসের বইতে যা ছিঁড়ে যাওয়ার পথে ছিল।

"দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেব রক্ত!" এই মন্ত্র যেন তার প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। বুকে গর্জে উঠছিল প্রতিবাদের আগুন, হাতে ছিল না অস্ত্র, কিন্তু সাহস ছিল আগ্নেয়গিরির চেয়েও বেশি। ওরকম সাহসই তো ইতিহাস বদলায়।

রানা ছিলেন সেইসব মানুষের প্রতিনিধি, যাদের নাম রাষ্ট্রের খাতায় ওঠে না, কিন্তু মাটির খাতায় লেখা থাকে রক্তচিহ্নে। তার আত্মত্যাগ সেই বার্তা দিল, যা শুধু একটি শহরের নয়,একটি জাতির চেতনা। "রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়",এই চূড়ান্ত হুঙ্কারে, ইতিহাস জানিয়ে দিল, অন্যায় আর নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে না।

এই আন্দোলনের শক্তি ছিল রানা তালুকদারের মতো মানুষদের নিঃশব্দ প্রতিরোধে, তাঁদের চোখের ভাষায়, তাঁদের জীবনবোধে। রাজনীতির গলিতে নাম না থাকলেও ইতিহাসের রাজপথে তাঁদের জন্য থাকবে এক অমোচনীয় স্থান। রানার পদধ্বনি মিশে গেছে সেই গুলির শব্দের সাথে, কিন্তু তার চেয়ে জোরে বাজছে তার সংকল্প,একটি ন্যায্য, মর্যাদাবান ভবিষ্যতের জন্য যে যুদ্ধে তিনি নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন।

এটাই ছিল জুলাই বিপ্লব,শুধু একটি তারিখ নয়, এক দুঃসহ ঋতু, এক বজ্রনির্ঘোষ যে বলে গেছে: "আমরা ভয় পাই না আর। আমরা জেগে উঠেছি।"

**শহীদ হওয়ার কাহিনি: একটি মা ও একটি জাতির রক্তাক্ত প্রার্থনা**

৫ জুলাই, ২০২৪। ঢাকার বাতাসে তখন শুধু বারুদের ঘ্রাণ নয়,ছিল অজস্র অশ্রুর স্রোত, মায়ের হাহাকার, সন্তানের আর্তনাদ। দিনটি শুরু হয়েছিল খুব সাধারণভাবে, খুব গরিবের মতো,যেমন রোজ শুরু হতো রানার পরিবারে। সেদিন বিকেলে ঘরে ঢুকে মা হাতে করে ভাত নিয়ে এলেন। তার বউ বলল, "মা ভাত এনেছে, একসাথে খাবো।" রানার তিন বছরের ছেলেটা খুশিতে লাফাচ্ছিল। এ যেন যুদ্ধের আগের একটুকরো শান্তির সন্ধ্যা।

ভাত খাওয়া শেষে রানা তার ছেলেকে ঘুম পাড়ালেন। বাইরে তখন টিভিতে আন্দোলনের খবর চলছিল,সেই আগুনঝরা প্রতিবাদ, যে আন্দোলন তার আত্মার গভীরে দোলা দিয়েছিল বহু আগে থেকেই। খবর দেখতে দেখতে আসরের আজান পড়ল। রানা শান্তভাষায় বলল, "আমি নামাজ পড়ে আসি।" কেউ ভাবতেও পারেনি,এই হবে তার শেষ নামাজ।

নামাজ শেষে সে আর ঘরে ফিরেনি।

রাত গড়িয়ে গেল। মাগরিবও হয়ে গেল। অথচ রানার কোনো খবর নেই। মা, স্ত্রী, বাড়ির সবাই তখন উৎকণ্ঠায় ছটফট করছে। ফোনে কোনো সাড়া নেই। রানার স্ত্রী তখন মা'কে কাঁপা গলায় বলল, "আম্মা, একটু দেখেন না, কোথায় গেলো? কল ধরতেছে না। খুব ভয় করছে..."

মা আর বড় বউ তখন রওনা দেন খুঁজতে। শহরের রাস্তা তখন একেকটা যেন মৃত্যুকূপ। আজিমপুর থানার পেছনে পৌঁছতেই গুলির তাণ্ডবে আর এগোতে পারেন না। থেমে যান, কিন্তু মা তো থামে না,হৃদয় থামে না সন্তানের খোঁজে।

সেখানে থেকে তিনি ফোন দেন বড় ছেলেকে। সে বলে, "আসছি।" সে এসে মাকে হাত ধরে বলে, "তুমি চলো, আমি ভাইকে নিয়ে আসবো।"

কিন্তু সেই ভাইকে আর ফেরানো গেল না।

পাঁচ মিনিটও পেরোল না, হঠাৎ গুলির শব্দ। দুই, তিন, একটার পর একটা,তারপর এক আর্তনাদ: "মা... রানা নাই।"

দৌড়ে যান মা। রক্তের ঢেউ গড়িয়ে পড়েছে রাস্তার গর্তে, ফুটপাথে, ইতিহাসের বুকে। রানার মাথার পেছনের অংশ নেই,ছিল না আশার কোনো আলো। তিনি একটা গামছা দিয়ে কোনোমতে রক্ত থামাতে চাইলেন, কিন্তু ততক্ষণে ছেলের শরীর ঠান্ডা, নিস্তব্ধ।

"রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়",এই বাক্যটা যেন সেই মুহূর্তে আকাশ চিরে উঠছিল, কিন্তু মা জানতেন না কীভাবে ফিরবেন ঘরে। কীভাবে চোখে তাকাবেন তার ছোট্ট নাতিটার দিকে,যে বাবার পা জড়িয়ে ঘুমাতো, এখন থেকে ঘুমাবে বাবার স্মৃতির কবরঘরে।

সেই রাতে শুধু এক রানা তালুকদার শহীদ হননি,শহীদ হয়েছিল এক বিপ্লবী হৃদয়ের নিঃশেষ ভালোবাসা। শহীদ হয়েছিল মায়ের নিঃস্ব জীবন। শহীদ হয়েছিল একটি জাতির দায়বদ্ধতা।

এ মৃত্যু শুধু এক প্রাণের নিভে যাওয়া নয়,এ মৃত্যু ইতিহাসে আগুন জ্বালানো এক অনলবর্ষী ঘা।

**বর্তমান পারিবারিক অবস্থা ও স্বপ্নভঙ্গের করুণ সুর:**

তাঁকে আর কখনো ফিরে পাওয়া যাবে না। রানা তালুকদার,একজন স্বামী, পিতা, সন্তান,এখন শুধুই এক নাম, এক ছবি, এক গুলিবিদ্ধ স্মৃতি। কিন্তু যে শূন্যতা তিনি রেখে গেছেন, তা কোনো ভাষায় পূর্ণ হবার নয়। তিনি রেখে গেছেন এক নিঃস্ব মা, এক মানসিকভাবে

ভেঙে-পড়া স্ত্রী, আর এক তিন বছরের শিশু,যে এখনো জানে না কেন তার বাবা হঠাৎ করে আর তাকে কোলে নেয় না, নামাজে নিয়ে যায় না, কেন প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার জন্য কিছু নিয়ে ঘরে ফেরে না।

ছেলেটিকে হাফেজ বানানোর স্বপ্ন ছিল রানার। খুব বড় কোনো আশা ছিল না তার,কেবল চেয়েছিল তার সন্তান কুরআনের আলোয় বড় হোক, মানুষের মতো মানুষ হোক, যেন জীবনটাকে সোজা করে চলতে পারে। সেই মানুষটি,যে প্রতিদিন সূর্য ওঠার আগেই ছেলেকে কোলে নিয়ে মসজিদের দিকে হাঁটত, পাঞ্জাবির পকেটে ছোট তসবি, চোখে মায়া আর মনেপ্রাণে এক ইবাদতের আশ্বাস,আজ শুধুই রক্তমাখা স্মৃতি।

“সবাইকে সবসময় সহযোগিতা করত” বলে তার স্ত্রী এখনো। যাকে সে ভালোবেসেছিল জীবনের সমস্ত দুঃখ ছাপিয়ে, সেই নারী আজ রানার অভাবেই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তার মানসিক ভারসাম্য ছিলই না, কিন্তু রানার সাহচর্যে যেন একটু একটু করে শান্ত হয়ে উঠছিল সে। এখন আবার হারিয়ে গেছে সেই ছায়াটুকুও। রানার অনুপস্থিতি তার মনে যে গভীর শূন্যতা তৈরি করেছে, তা ব্যাখ্যা করা যায় না,শুধু দেখা যায় তার ছিন্ন ছিন্ন কথায়, নির্ভুল অনুপস্থিতিতে।

মা? রানার মা রুবি তালুকদার এখনো রাতে ঘুমাতে পারেন না। ছেলে ফিরবে,এই মিথ্যে আশায় জানালায় তাকিয়ে থাকেন, যেমন কেউ গভীর সাগরের পাড়ে বসে ঢেউয়ের শব্দ গোনে। তার বুকজুড়ে এখন শুধু প্রশ্ন,"কেন এমন হলো? কে এর দায় নেবে?" যে সন্তান প্রতিটি দিন উপার্জনের শেষে একটুখানি হাসি নিয়ে বাড়ি ফিরত, সে এখন নিথর, কবরের গভীরে।

অর্থনৈতিক দুর্দশা যেন শুধু দারিদ্র্যের নাম নয়, যেন এক নিঃশেষ অভিশাপ,সংসার এখন রোজকার টানাপোড়েনে, ঘরে চাল নেই, মগজে স্বস্তি নেই। কোথাও নেই কোনো সাহায্যের হাত। তারা ছিলেন এক স্বপ্নবান পরিবার, ছোট্ট হলেও পরিপাটি। এখন তারা একেকজন যেন ভাঙা নৌকা, বিপ্লবের ঢেউয়ে ডুবে যাওয়া আত্মা।

তবু ইতিহাস চুপ থাকে না।

রানার রক্ত, তার বিসর্জন, তার নিঃশব্দ প্রতিবাদ আজ এক অমোচনীয় প্রশ্নচিহ্ন হয়ে থেকে গেছে জাতির সামনে।

সে রক্ত বলে,এই মৃত্যু নিষ্ফল নয়। এই ত্যাগ ভুলে যাওয়া যাবে না।

আমরা যদি ভুলেও যাই, যদি নিস্তব্ধ হয়ে পড়ি শহীদের কথা থেকে,তবু তার তিন বছরের সন্তান একদিন জানবে। বাবার রক্ত কীভাবে ঢেকে দিয়েছিল এই পিচঢালা শহর।

আর তখন সে জিজ্ঞাসা করবেই,

“আমার বাবাকে কে মেরেছিল? আর তোমরা তখন কোথায় ছিলে?” এ প্রশ্নের উত্তর জাতিকে একদিন দিতেই হবে।

**প্রস্তাবনা:**

রানা তালুকদারের নামটি আজ যেন এক গর্জন, একটি জীবন্ত জ্বলন্ত স্মৃতি,যা আমাদের জাতির বুকের মধ্যে দগ্ধ রক্তের মতো এখনও ঝলমল করে। তাঁর মৃত্যু নিছক এক ব্যক্তি হারানো নয়, এটি একটি আদর্শের অবসান নয়, বরং একটি নতুন যজ্ঞের আহ্বান। রানা ছিলেন সেই সাহসী প্রাণ, যিনি নির্ভয়ে প্রতিবাদের শিখা জ্বালিয়েছিলেন, হাতে ছিলেন ন্যায়ের পতাকা, চোখে ছিল অদম্য অগ্নি। আজ তাঁর রেখে যাওয়া পরিবার শুধু বেদনার অন্ধকারে নয়, তারা দেশের সামনে এক বিশাল দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
প্রথমত, রানা তালুকদারের স্ত্রী এবং শিশুর জন্য অবিলম্বে সরকারিভাবে স্থায়ী আর্থিক সহায়তা প্রদান করা উচিত। এই সহায়তা

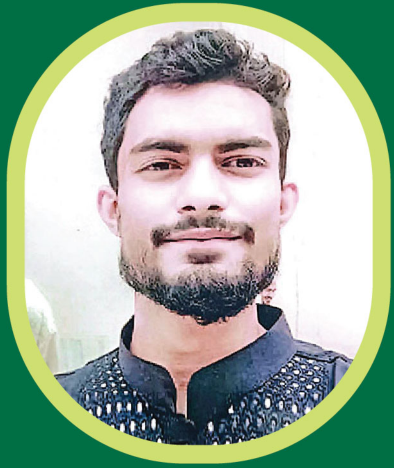

**শহীদ আবদুল্লাহ সিদ্দিক**
ক্রমিক : ৭৬৯
আইডি : ঢাকা সিটি ১৩১

## যে সন্তানের মৃত্যুতেও একজন পিতা মাথা নোয়ায়নি

### শহীদের পরিচিতি

আবদুল্লাহ সিদ্দিক, নামটি শুনলে প্রথমে মনে হতে পারে, আরেকটি সাধারণ নাম। কিন্তু একটু তাকালেই বোঝা যায়, এ নামের ভেতর ঢুকে আছে হাজারো তরুণের মুখ, একটাই চেহারা,একটাই আগুনে মুখাবয়ব, যে প্রতিবাদ করে, ভালোবাসে, হার মানে না। জন্ম হয় ২০০৩ সালে, এমন এক সময়ে যখন বাংলাদেশের আকাশে সোনালি স্বপ্ন নয়, বরং ঝুলছিল দুঃস্বপ্নের মেঘ। রাজনীতির বুক জুড়ে তখন কেবল হিংসা আর হীনতা, আর অর্থনীতির রাস্তায় রোজ পাথর ছুঁড়ে মারছে বেকারত্ব, দুর্নীতি আর দারিদ্র্য।

যেন কেবল করুণা নয়, বরং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এক স্বীকৃতি, যা শহীদের পরিবারের প্রতি ন্যায় ও সম্মানের পরিচায়ক। কারণ, রানা তালুকদারের ত্যাগ শুধু তাঁর পরিবার নয়, সমগ্র জাতির জন্য একটি বীরত্বের দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয়ত, রানা তালুকদারের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি চালু করা জরুরি, যাতে তারা পিতার মত আদর্শ, সততা, এবং সাহস নিয়ে বড় হতে পারে। শিক্ষা হবে তাদের ভবিষ্যতের স্রোত,যা তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাবে।

অবশেষে, রানা তালুকদারের নাম ও জীবনকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্মানিত করে তাঁদের পরিবারকে মানসিক ও সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে। তাদের পাশে দাঁড়ানো হবে আমাদের সমাজের বড় দায়িত্ব,যাতে তারা নিঃস্বার্থভাবে জীবন চালিয়ে যেতে পারে, আবার পিতার স্মৃতিকে বুকে ধারণ করে নতুন দিনের সূর্য ওঠাতে পারে। রানা তালুকদারের পরিবার কেবল শহীদ পরিবারের ছায়া নয়, তারা দেশের এক জীবন্ত প্রত্যাশা, এক বীরত্বের ইতিহাস। আজ তাদের পাশে দাঁড়ানো মানে আমাদের জাতির ন্যায়ের পথে অটল হওয়া।

## এক নজরে শহীদ পরিচিতি

| | |
|---|---|
| নাম | : রানা তালুকদার |
| জন্ম তারিখ | : ০৩-০৫-১৯৯২ |
| বয়স | : ৩৩ বছর |
| বৈবাহিক অবস্থা | : বিবাহিত |
| পিতার নাম | : মোঃ সিরাজুল ইসলাম |
| মাতার নাম | : রুবি তালুকদার |
| স্ত্রীর নাম | : রানু |
| এনআইডি | : ৮২৩ ৭৪৬ ৬২৫৮ |
| বর্তমান ঠিকানা | : বাড়ীঃ ২৫-বি, রোডঃ মধ্য আজমপুর, পুরবকৈর, পোঃ আজমপুর-১২৩০, দক্ষিনখান, উত্তরা আজমপুর, কাঁচাবাজার, জামতলা, ঢাকা |
| স্থায়ী ঠিকানা | : উত্তরা আজমপুর, কাঁচাবাজার ডাইনের জামতলা, ঢাকা |
| হাসপাতালে ভর্তি | : উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল |
| কেস আইডি | : ২১৬৩২১১/০০১; ২৫৩১৯ |
| মৃত্যুর তারিখ | : ০৫-০৮-২০২৪ |
| মৃত্যুর সময় | : রাত ৮:১০ চগ, ১৯:০০:০০ |
| মৃত্যুর কারণ | : বুলেট ইনজুরি ; ব্রট ডেড; অপরিবর্তনীয় কার্ডিও-রেসপিরেটরি ফেইলিউর |
| পেশা | : ড্রাইভার এবং কন্ট্রাক্টর (মেকানিক্যাল এবং ম্যানুয়াল) |
| রক্তের গ্রুপ | : বি+ |
| ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর | : TN0052345L00004 |

আজ তাঁদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের শুধু মানবিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক ন্যায়ের অংশ। সন্তান যেন লেখাপড়া শেষ করতে পারে, যেন মাথা উঁচু করে বড় হতে পারে এই পরিচয়ে যে তার বাবা একজন শহীদ। স্ত্রী যেন অন্তত দৈনন্দিন জীবনের ন্যূনতম চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারেন, যেন প্রতিদিনের বাজারের তালিকাটা না হয় আতঙ্কের কারণ।

আমরা যদি এইটুকু দায়িত্ব নিতে না পারি, তবে আমাদের সভ্যতা কিসের? যদি এক শহীদের পরিবারই অবহেলিত থাকে, তবে আমাদের সব বক্তৃতা, শপথ আর পোস্টার কাদের জন্য? শুধু আন্দোলনের সময় নয়, বিপ্লবের পরেও মানবতা দরকার হয়। সালাউদ্দিনের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো মানে হলো, আমাদের বিবেকের পাশে দাঁড়ানো যেখানে প্রত্যেকটা নিঃশ্বাস বলে, "আমি আছি, তুমি একা নও।"

এই সহানুভূতি যেন ক্ষণস্থায়ী না হয়। যেন এটি হয়ে ওঠে এক দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি–তাদের প্রতি, যাদের বুকের উপর দিয়ে ইতিহাস লেখা হয়।

**প্রস্তাবনা ও শহীদ স্মরণ – যে স্মৃতি দায়িত্ব হয়ে ওঠে**

শহীদ মোঃ সালাউদ্দিন সুমনের রক্ত শুধু মাটি ভিজিয়ে দেয়নি সে রক্ত আমাদের মেরুদণ্ডে আগুন ঢেলেছে, আমাদের নৈতিক শিরদাঁড়ায় জাগিয়েছে এক জরুরি প্রশ্ন: ভালো মানুষদের কি আমরা স্মরণ করি, না কেবল হারিয়ে ফেলি? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা দেব না কিছু পোস্টারে, ফেসবুকের টাইমলাইনে বা বক্তৃতার ছায়ায়; উত্তর দিতে হবে চারটি বাস্তব দাবির মাধ্যমে যা আমাদের দায়িত্ব, আমাদের লজ্জা আর আমাদের স্বপ্নের অংশ।

প্রথমত, শহীদ সালাউদ্দিন সুমনের একমাত্র পুত্র, আদিব রেহানের জন্য চাই স্থায়ী সরকারি সহায়তা, যেন তার শিক্ষার কোনো বাধা না থাকে, যেন সে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে সমাজের সম্মুখে। সে যেন একদিন নিজের পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু বুকের গভীরে বয়ে নিয়ে চলে এক গর্ব "আমি শহীদের সন্তান।" রাষ্ট্র যদি এ দায়িত্ব না নেয়, তবে সেই শহীদের রক্ত শুধু বেইনামি কাদায় মিশে যাবে এটি আমরা হতে দিতে পারি না।

দ্বিতীয়ত, তাঁর স্ত্রী ফাতেমা আক্তার একজন সাদাসিধে গৃহিণী, এখন হঠাৎ হয়ে পড়েছেন এক অসম লড়াইয়ের সৈনিক। তাঁর জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রাথমিক পুঁজি, কিংবা সেলাই বা হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ খুলে দিলে তিনি হতে পারেন স্বনির্ভর। তিনি করুণা চান না, চান কাজের সুযোগ যেন জীবনটাকে আবার গড়ে নিতে পারেন নিজের হাতে, সেই হাত যেটা একসময় সালাউদ্দিনের হাত ধরে হেঁটেছিল জীবনের পথে।

এই প্রস্তাব কোনো আবেগের আবর্জনা নয়, এগুলো আমাদের নৈতিক দাবিপত্র। আমরা যারা কথা বলি শহীদদের নিয়ে, আমাদের উচিত তাঁদের পরিবারের জন্য কিছু করে যাওয়া। কারণ একটা শহীদ কেবল মরেন না তাঁর পরিবারও ধীরে ধীরে একটা 'অস্তিত্বহীনতা'তে ঢলে পড়ে।

আজ যদি আমরা এই প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের জন্য সোচ্চার না হই, তাহলে আগামীকাল যখন আমাদের সন্তানরা জিজ্ঞেস করবে–"তোমরা কাদের শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলে?"–আমাদের জবাব হবে নিঃশব্দ।

তাই এখনই সময়, সালাউদ্দিন সুমনের নামটিকে গৌরবের নয়, দায়িত্বের প্রতীক করে তোলার।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Shalnagar Union Parishad
Lohagara, Narail
(Rule 11, 12)

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration 04/11/2024
Death Registration Number 19706515294038901
Date of Issuance 04/11/2024

Date of Birth : 11/10/1970
Date of Death : 19/07/2024
In Word : Nineteenth of July Two Thousand Twenty Four
Sex : Male

| | | | |
|---|---|---|---|
| নাম | : মোঃ সালাউদ্দীন সুমন | Name | : Md Salauddin Shomon |
| মাতা | : শামছুন্নাহার | Mother | : Samsunnaher |
| মাতার জাতীয়তা | : বাংলাদেশী | Nationality | : Bangladeshi |
| পিতা | : শামসুদ্দিন | Father | : Samsuddin |
| পিতার জাতীয়তা | : বাংলাদেশী | Nationality | : Bangladeshi |
| মৃত্যুস্থান | : ঢাকা, বাংলাদেশ | Place of Death | : Dhaka, Bangladesh |
| মৃত্যুর কারণ | : হত্যা | Cause of Death (As Per ICD Version) | : Murder |

04.11.2024
Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Chanchal Kumar Das
U.P Administrative Officer
03No. Shalnagar Union Parishad,
Lohagara, Narail.

04-11-24
Seal & Signature
Registrar
MD LABUMIA
CHAIRMAN
03 NO SHALNAGAR UP
LOHAGARA, NARAIL

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

## এক নজরে শহীদ পরিচিতি

| | |
|---|---|
| নাম | : মো: সালাউদ্দিন সুমন |
| জন্ম তারিখ | : ১১ অক্টোবর ১৯৭০ |
| জন্মস্থান | : যশোর |
| রক্তের গ্রুপ | : (বি+) |
| ঠিকানা | : বাসা/হোল্ডিং: ৪৫২/এ, গ্রাম/রাস্তা: ৮, তিলপাপাড়া, ডাকঘর: খিলগাঁও - ১২১৯, খিলগাঁও, ঢাকা |
| পিতা | : শামছুদ্দিন |
| মাতা | : শামছুন্নাহার |
| ভাইবোন | : ৫ ভাই, ১ বোন |
| স্ত্রী | : ফাতেমা আক্তার (গৃহিণী) |
| সন্তান | : আদিব রেহান (ছাত্র) |
| রাজনৈতিক পরিচয় | : বিএনপি, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ১ নম্বর ওয়ার্ড, ভাইস প্রেসিডেন্ট |
| আর্থিক অবস্থা | : সীমিত, পরিবার চলত একটি ফ্ল্যাট ভাড়ার টাকায় |
| শহীদ হওয়ার তারিখ | : ১৯ জুলাই ২০২৪ |
| শহীদ হওয়ার স্থান | : ঢাকা, দক্ষিণ বনশ্রী ২ নম্বর মসজিদের সামনে, গুলি লাগে ঠোঁটের বাম পাশে |
| দাফন | : সুলতান ভুইয়া কবরস্থান, দক্ষিণ বনশ্রী, ঢাকা (ব্যবহারকারী প্রদত্ত, ডকুমেন্টে উল্লেখ নেই) |

**নিউজ লিংক**

https://www.facebook.com/share/19A61jLgis/?mibextid=wwXIfr

এই অস্থির সময়েই ঢাকার ধোলাইঘাটে বড় হয়ে ওঠেন আবদুল্লাহ। তিনি ছিলেন হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের মার্কেটিং বিভাগের এক প্রতিভাবান ছাত্র। কিন্তু শুধু ছাত্র বললে ভুল হবে। দিনের আলোয় তিনি পড়তেন, রাতের আঁধারে ব্যবসা চালাতেন,গাড়ির পার্টসের দোকানে নিজ হাতে হিসাব রাখতেন, ক্রেতার মুখ পড়ে বুঝতেন কে প্রকৃত দরিদ্র, কে লোভী ব্যবসায়ী। এ ছিল তাঁর জীবন, আর সেই জীবনই হয়ে উঠেছিল পরিবারের ভরসা। তাঁর বাবা একদিন বলেছিলেন, "আমি অবসরে, কিন্তু আবদুল্লাহই আমার জীবন চালাত।" সেই কথায় শুধু অর্থনৈতিক নির্ভরতার গল্প নেই, আছে এক পিতা-পুত্রের যুগল সংগ্রামের ইতিহাস,যারা একসঙ্গে বাজারে যান, একসঙ্গে লেনদেনের খাতা মেলেন, আবার রাতের খাবারে জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন। এ যেন পরিবারের ভেতর এক ছোট্ট মুক্তিযুদ্ধ,আর্থিক দৈন্যতার বিরুদ্ধে, আর প্রতারণার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক অনবদ্য লড়াই। ছোটবেলা থেকেই আবদুল্লাহর মধ্যে ছিল প্রতিযোগিতার প্রতি ঝোঁক। খেলাধুলা, পড়ালেখা, ব্যবসা, যেখানে পা রেখেছেন, সেখানেই রেখে গেছেন স্পর্শ। তবুও, বাবার অনুরোধে একদিন প্রতিযোগিতা ছেড়ে বসেন বইয়ের পাশে। শুরু হয় তাঁর স্বপ্ন দেখার আরেক অধ্যায়, একটি এমন দেশ, যেখানে পিতা অবসরে গিয়ে অনাহারে কাঁদবেন না, যেখানে সন্তান প্রতিদিন আতঙ্ক নিয়ে বাসা থেকে বের হবে না। আবদুল্লাহ মাসে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করতেন, এ যুগে একজন তরুণের জন্য এটা কম নয়। কিন্তু তিনি ছিলেন লোভশূন্য। "একটি স্বাধীন দেশের চেয়ে বড় সম্পদ নেই", এই কথাটা ছিল তাঁর বুকের মন্ত্র। তিনি জানতেন, যতোই উপার্জন হোক, যতই জমি-জমা হোক, যদি বিচার না থাকে, নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে সবই ব্যর্থ। তাঁর চোখে সফলতা ছিল রুটির দোকানে না, বরং দেশের ভাগ্যাকাশে।

এমন একজন তরুণ, যিনি এক হাতে সংসার সামলান, অন্য হাতে জাতির ব্যানার তোলেন, তিনি কি কেবল এক ছেলের পরিচয় হতে পারেন? না, তিনি হয়ে উঠেছেন সেই সেতু, যার ওপর দিয়ে হেঁটে যায় আমাদের আশা, আমাদের নির্ভীকতা, আমাদের 'জুলাই বিপ্লব'। তিনি শুধু পিতা-মাতার সন্তান ছিলেন না, ছিলেন সময়ের সন্তান, ইতিহাসের যোদ্ধা, আর এই যুগের প্রতিটি তরুণের প্রতিচ্ছবি।

আবদুল্লাহ নেই। কিন্তু তাঁকে যারা চিনেছে, তারা আজও বুকের মধ্যে ঝড় বয়ে নিয়ে হাঁটে, কারণ এমন মানুষ হারিয়ে গেলে, বেঁচে থাকাটাও হয়ে যায় এক রকমের ঋণ।

**আন্দোলনের প্রেক্ষাপট: জুলাইয়ের আগুনজ্বলা বিবৃতি**

২০২৪ সালের জুলাই,বাংলাদেশ যেন ইতিহাসের অনুত্তরিত এক প্রশ্নে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা দেশ। আকাশ নীল ছিল না, বাতাসে স্বস্তি ছিল না, মানুষের কণ্ঠে হাসি ছিল না, সবকিছু যেন প্রস্তুত ছিল এক মহা বিস্ফোরণের জন্য। পনেরো বছরের স্বৈরাচারী শাসন, যেটি একদিন গায়ে গায়ে একদলীয় রাষ্ট্রের বিষ মেখে নিয়েছিল, সেই শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় একটি প্রজন্ম। কোটা সংস্কার আন্দোলন, এ যেন কেবল একটা দাবি নয়, এক রক্তমাখা

ধ্বংসাত্মক চিৎকার, যেখানে প্রতিটি কণ্ঠে ছিল অতীতের ক্ষোভ, বর্তমানের যন্ত্রণার কান্না আর ভবিষ্যতের আশাহীন প্রতিজ্ঞা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, একদলীয় নির্বাচনের ধোঁয়াশা পেরিয়ে ফের রাষ্ট্রযন্ত্র কব্জা করলেন, আর তার সাথেই ফিরে এল সেই প্রাচীন, বৈষম্যমূলক কোটা ব্যবস্থা। যেন ২০১৮ সালের ছাত্রদের বিজয় কোনো মূল্যই রাখে না, যেন তরুণদের ঘাম ঝরানো আশা কেবল বালুর ওপর লিখা নাম। ১ জুলাই শুরু হয় শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ,অহিংস প্ল্যাকার্ড, পোস্টার আর পদচারণায় ভরে ওঠে ক্যাম্পাস থেকে রাজপথ। কিন্তু কোনো স্বৈরতন্ত্র কখনো প্ল্যাকার্ডে থেমে থাকে না।

১৫ জুলাই,বাংলার রাজপথ রক্তে রঞ্জিত। আবু সাঈদের নিথর দেহ পড়ে থাকে রাজপথে, আর সেই রক্ত ভেদ করেই সারা দেশের ছাত্র, শ্রমজীবী, বেকার, পথচারী সবাই যেন ঘুম ভেঙে একসাথে গর্জে ওঠে। ঢাকার ইটপাথর, রংপুরের ধুলোবালি, নারায়ণগঞ্জের শ্রমঘামে একসাথে মিশে যায় এই বিদ্রোহে। এই আন্দোলনের ছিল না কোনো নির্ধারিত নেতা, ছিল না দল বা মঞ্চ ছিল শুধু একটি ডাক, যেটি যেন বুক চিরে বেরিয়ে আসে: "অবসান করো স্বৈরাচার!"

এই আহ্বানটি আবদুল্লাহ শুনেছিলেন গোপন কোনো চিঠির মতো,একান্ত, ব্যক্তিগত, আর তীব্র। তিনি কেবল হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের ছাত্র ছিলেন না, কেবল গাড়ির যন্ত্রাংশ বিক্রেতা ছিলেন না তিনি ছিলেন এই সময়ের বিবেক। যখন একটি প্রজন্ম প্রশ্ন

করছিল, "আমাদের জীবনের মানে কী?", তখন আবদুল্লাহ উত্তর দিয়েছিলেন নিজের চলনে, বলনে, এবং আত্মদানে।

"যদি দেশ স্বাধীন না হয়, যদি ফ্যাসিবাদকে ঠেকানো না যায়, তবে সব আয়, সব ডিগ্রি, সব স্বপ্ন মূল্যহীন", এ ছিল তাঁর বিশ্বাস। আর সে বিশ্বাসের খাতিরেই তিনি ক্লাসরুম ফেলে, ব্যবসার খাতা গুটিয়ে রাস্তায় নেমে আসেন। হাতে অস্ত্র ছিল না, কাঁধে রাইফেল ছিল না, ছিল কেবল হৃদয়ে বিদ্রোহ আর কণ্ঠে স্বাধীনতার হাহাকার। তিনি জানতেন, মৃত্যুর দুঃসাহস নিয়ে চলা মানুষেরা ইতিহাস লেখে।

আবদুল্লাহ নামেননি শুধু নিজের জন্য। তিনি নামেননি শুধু পরিবারের সম্মান রক্ষায়। তিনি নেমেছিলেন আমাদের জন্য,আমার জন্য, তোমার জন্য, সেই ভবিষ্যতের জন্য যেটা এখনো জন্ম নেয়নি। তিনি ছিলেন না আন্দোলনের পোস্টারে, কিন্তু তাঁর পদচারণা ছিল সে বিপ্লবের ছায়ায়। আর তাই আজ তাঁর মৃত্যু নয়, তাঁর অংশগ্রহণ,তাঁর নাম উচ্চারণ,তাঁর শহীদ হওয়াই হয়ে দাঁড়ায় জুলাই বিপ্লবের শপথনামা।

এই বিপ্লব চলবে,কারণ কেউ একজন জীবন দিয়ে বলেছে, "স্বাধীনতা ছাড়া কিছুই অর্থপূর্ণ নয়।"

**যেভাবে শহীদ হন:**

আগুনের ভিতর দিয়ে একটি নাম পুড়ে হয়ে ওঠে প্রতীক। আবদুল্লাহ শহীদ হন ঢাকার জ্বলন্ত রাজপথে, সেখানেই যেখানে ইতিহাস বারবার রক্ত চেয়েছে। গুলির শব্দ, শ্লোগানের গর্জন আর বাতাসে ভেসে বেড়ানো কাঁদুনির গন্ধে একদিন শহরটা ধিকি ধিকি পুড়ছিল,আর সেই আগুনেই মিশে গেল এক তরুণের স্বপ্ন, নাম: আবদুল্লাহ।

**ঢাকা মেডিক্যালে সাত লাশ, মিটফোর্ডে এক :** গতকালের সংঘর্ষে ঢাকা মেডিক্যালে পাঁচটি লাশ এসেছে। এর মধ্যে ঝিগাতলা এলাকায় গুলিতে হাবিবুউল্লাহ বাহার বিবিএর শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী (২৩) নিহত হয়েছেন। তার বাবার নাম আবু বক্কর।

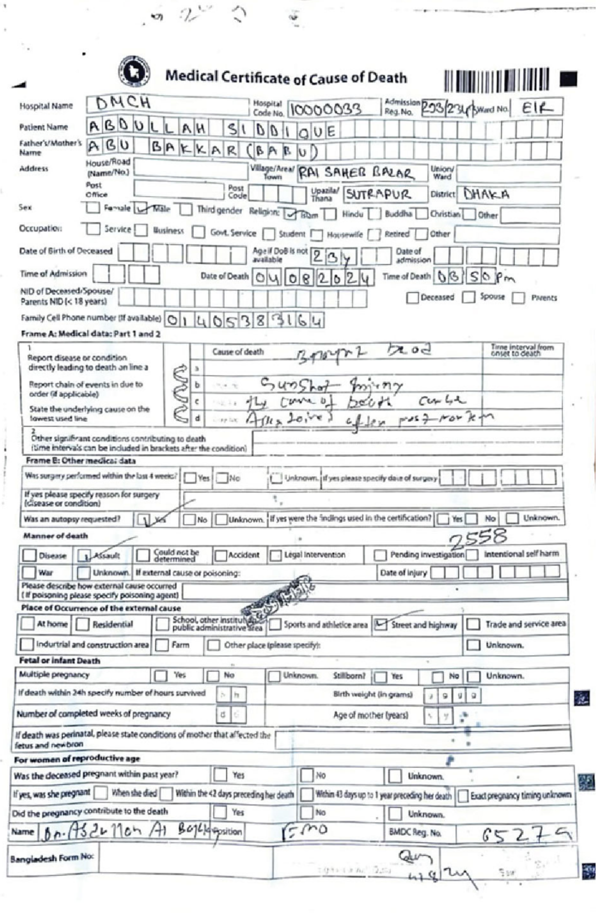

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: DMCH | Hospital Code No. 10000033 | Admission Reg. No. 293/234 | Ward No. EIR

Patient Name: ABDULLAH SIDDIQUE

Father's/Mother's Name: ABU BAKKAR (BABU)

Address: House/Road (Name/No.) | Village/Area/Town: RAI SAHEB BAZAR | Union/Ward
Post Office | Post Code | Upazila/Thana: SUTRAPUR | District: DHAKA

Sex: Female / Male ✓ / Third gender | Religion: Islam ✓ / Hindu / Buddha / Christian / Other

Occupation: Service / Business / Govt. Service / Student / Housewife / Retired / Other

Date of Birth of Deceased | Age if DoB is not available: 23y | Date of admission

Time of Admission | Date of Death: 04 08 2024 | Time of Death: 03 50 Pm

NID of Deceased/Spouse/Parents NID (< 18 years) | Deceased / Spouse / Parents

Family Cell Phone number (If available): 01405383164

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

| 1 | | Cause of death | Time interval from onset to death |
|---|---|---|---|
| Report disease or condition directly leading to death on line a | a | | |
| Report chain of events in due to order (if applicable) | b | Gunshot Injury | |
| State the underlying cause on the lowest used line | c | the cause of death can be | |
| | d | [illegible] after post mortem | |

2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)

Frame B: Other medical data

Was surgery performed within the last 4 weeks? Yes / No / Unknown. If yes please specify date of surgery

If yes please specify reason for surgery (disease or condition)

Was an autopsy requested? Yes ✓ / No / Unknown. If yes were the findings used in the certification? Yes / No / Unknown.

Manner of death 2558

Disease / Assault ✓ / Could not be determined / Accident / Legal Intervention / Pending investigation / Intentional self harm
War / Unknown. If external cause or poisoning: | Date of injury

Please describe how external cause occurred (If poisoning please specify poisoning agent)

Place of Occurrence of the external cause

At home / Residential / School, other institution, public administrative area / Sports and athletice area / Street and highway ✓ / Trade and service area
Indurtrial and construction area / Farm / Other place (please specify): / Unknown.

Fetal or infant Death

Multiple pregnancy: Yes / No / Unknown. Stillborn? Yes / No / Unknown.
If death within 24h specify number of hours survived | Birth weight (in grams)
Number of completed weeks of pregnancy | Age of mother (years)
If death was perinatal, please state conditions of mother that affected the fetus and newbron

For women of reproductive age

Was the deceased pregnant within past year? Yes / No / Unknown.
If yes, was she pregnant: When she died / Within the 42 days preceding her death / Within 43 days up to 1 year preceding her death / Exact pregnancy timing unknown
Did the pregnancy contribute to the death: Yes / No / Unknown.

Name: Dr. [illegible] | Position: EMO | BMDC Reg. No. 65279

Bangladesh Form No:

তিনি গুলি খেয়ে পড়েননি, তিনি হোঁচট খেয়ে মরেননি। তাঁকে মারার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল, নিখুঁতভাবে, শিকারির মতো। কোনো হঠাৎ সংঘর্ষ নয়, কোনো ভুল বোঝাবুঝি নয়, এ ছিল পরিকল্পিত হত্যা, রাষ্ট্রপ্রণীত নিষ্ঠুরতা, রাজনৈতিক প্রতিশোধের সুনিপুণ শিকার। ছাত্রলীগ নামক শাসকদলের রক্তপিপাসু বাহিনী তাঁকে আলাদা করে টার্গেট করেছিল,তাঁর সংগঠকসুলভ ভূমিকার জন্য, তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা ও সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য।

আবদুল্লাহ ছিলেন না অস্ত্রধারী, ছিলেন না কোনো বিপ্লবী দলের চাঁদা সংগ্রাহক। তিনি ছিলেন এক তরুণ, যার হাতে ছিল ব্যানার, যাঁর পকেটে ছিল প্ল্যাস্টিকের বোতলে পানি, কিছু ওষুধ, আর একটা ফোন,যার মাধ্যমে তিনি ছড়িয়ে দিতেন আন্দোলনের বার্তা। পিতা বলেন, "হাসিনা আমার কলিজা নিয়ে গেছে।"

এ বাক্য শুধু এক সন্তানের শোকে ভেঙে পড়া কোনো বাবার বিলাপ নয়, এ এক রাষ্ট্রবিরোধী স্বীকারোক্তি, যাকে ইতিহাস কখনো উপেক্ষা করতে পারবে না। এই কণ্ঠস্বর ফুঁড়ে উঠে আসে শত সহস্র পিতার আর্তনাদ, যারা তাঁদের সন্তানদের পাঠিয়েছিল শিক্ষা নিতে, কিন্তু ফিরিয়ে পেয়েছে লাশ, পেট কাপড়ে মোড়ানো, চোখ বন্ধ, কপালে বিদ্রোহের দাগ।

আবদুল্লাহ ১৯ জুলাইয়ের দিকে সরব উপস্থিত ছিলেন আন্দোলনে। ব্যানার তৈরি, স্লোগান লেখা, খাবার জোগাড়, চিকিৎসাসেবা, সবখানে ছিলেন। বন্ধুদের বলতেন, "আমরা যদি না দাঁড়াই, তাহলে আর কারা দাঁড়াবে?"

এই এক লাইনেই তার আদর্শের গভীরতা স্পষ্ট। তিনি ছাত্র ছিলেন, ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল তিনি একজন সচেতন নাগরিক, যিনি জানতেন, একটা দেশের মেরুদণ্ড হয় মানুষের নৈতিক সাহস দিয়ে।

যখন তাঁর ওপর হামলা হলো, তখন আশপাশের সবাই বলেছে, "ওকে আলাদা করে মেরেছে",এই আলাদা করাটা আমাদের রাজনীতির সবচেয়ে ভীতিকর সত্য। সচেতনতা এখানে অপরাধ,

আদর্শ সেখানে মৃত্যুদণ্ড। তাঁর শরীরের আঘাতগুলো বলেছে, "তুমি কেন ভাবলে যে তোমার কোনো অধিকার আছে?"

হাসপাতালে নেওয়া হয়, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। হৃদপিণ্ড থেমে যায়, কিন্তু আদর্শ থেমে যায় না। তিনি মারা যান না, বরং তিনি চিরস্থায়ী হন,একটি নতুন রাষ্ট্রচিন্তার প্রতীক হয়ে। তাঁর ছবি পোস্টারে ছিল না, তাঁর নাম কোনো সংগঠনের ঘোষণাপত্রে ছিল না,তবু, তাঁর রক্তে লেখা হয় এক নতুন পঙ ক্তি: "সচেতন হওয়া মানেই শহীদ হওয়ার প্রস্তুতি।"

আবদুল্লাহ সেই নাম, যাকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল রাষ্ট্র, অথচ সেই নামই হয়ে গেল এক নতুন বিপ্লবের প্রস্তাবনা। এখন যখন কেউ বলে "স্বাধীনতা", তখন আবদুল্লাহর রক্ত সেই শব্দে ঢেউ তোলে। আর আমরা জানি,যতদিন এই দেশের আকাশে অন্যায়ের ধোঁয়া, ততদিন আবদুল্লাহর মতো শহীদরা আগুন হয়ে ফিরবেন।

**পরিবারের বক্তব্য ও শোকের ভাষা**

একটি হৃদয়ের ভাঙা দরজার ভেতর থেকে শোনা যায় দেশের কান্না। আবদুল্লাহর পিতা বলেছিলেন, "আমার ছেলেকে যদি এক হাতে দিত, আর অন্য হাতে যদি গোটা পৃথিবী থাকত, আমি ছেলেকেই নিতাম।"

এই একটি বাক্য যেন সময়কে থামিয়ে দেয়। সে বাক্যে নেই কোনো অহেতুক নাটক, নেই কান্নার অযথা আবেগ। আছে শুধু একটি অসহায় হৃদয়ের চিৎকার, যা রাষ্ট্র শুনতে চায় না, আর সমাজ শুনেও চুপ করে থাকে।

এই পিতার নাম ইতিহাস ভুলে যাবে না। কারণ তিনি শুধু সন্তান হারাননি, তিনি দেশকে দিয়েছেন তার ভবিষ্যৎ। আবদুল্লাহর মৃত্যুতে

তরুণদের গলা। যারা কাঁধে ব্যানার নিয়েছিল, যারা লাঠি খেয়েও ফেরেনি, যারা ভাইয়ের মতো একে অপরকে হাসপাতাল পৌঁছে দিয়েছিল,তাদের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল্লাহর মতো স্বপ্নবান মানুষ। এই তরুণরাই বারুদের ঘ্রাণকে উপেক্ষা করে রাস্তায় ফুল ফোটানোর সাহস দেখিয়েছিল।

**এখন রাষ্ট্রের সামনে তিনটি স্পষ্ট দায়িত্ব।**

প্রথমত, আবদুল্লাহর পরিবারের নিরাপত্তা ও সম্মান নিশ্চিত করা ও তার ছোট বনের লেখা-পরার দায়িত্ব নেয়া

এমন এক পরিবার যারা একটি সন্তানের মাধ্যমে গোটা জাতিকে এক স্ফুলিঙ্গ দিয়েছে,তাদের পাশে না দাঁড়ানো মানেই ইতিহাসের বিরুদ্ধে যাওয়া।

দ্বিতীয়ত, তাঁদের ক্ষতিপূরণ নয়, পুনর্বাসন, পিতা যেন ব্যবসা আবার শুরু করতে পারেন, যেন ঘরে অন্ধকার না নামে।

তৃতীয়ত, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, শহীদদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং স্থায়ী স্মারক নির্মাণ।

আবদুল্লাহর পিতা যে দাবি তুলেছেন,“গণভবন হোক শহীদদের স্মৃতি জাদুঘর”,তা কোনো প্রতিশোধ নয়। এটা এক প্রতীকী শুদ্ধিকরণ, এক গণতান্ত্রিক শপথের পূর্ণতা, যেখানে ক্ষমতার আসন একদিন স্মৃতির মেঘদূত হয়ে দাঁড়াবে।

সেই জাদুঘরে থাকবে না কোনো স্বর্ণমুকুট, থাকবে শুধু খালি জুতা, ভাঙা ব্যানার, আর রক্তমাখা রুমাল,যেগুলো দিয়ে নতুন প্রজন্ম শিখবে কীভাবে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হয়।

শহীদ আবদুল্লাহদের উত্তরাধিকার শুধু আইনগত নয়,এটা সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক।

আমাদের সংবিধানে যদি এই রক্তের দাম না লেখা থাকে, তাহলে সে সংবিধান আমাদের নয়।

তাঁর স্বপ্ন ছিল স্বাধীন দেশ, যেখানে ভয় থাকবে না, ভাত থাকবে, ভোট থাকবে, আর স্বপ্নপূরণের অধিকার থাকবে।

তাঁর রক্তে যে কবিতা লেখা হয়েছিল, সেই কবিতা এখন রাষ্ট্রকে মুখস্থ করতে হবে।

আমাদের করণীয় এখন একটাই,তাঁদের স্মৃতিকে রক্ষা নয়, বাঁচিয়ে রাখা আমাদের স্লোগানে, শিক্ষায়, গানে, সংবিধানে, এবং আমাদের প্রতিদিনের বিবেকের আয়নায়।

কারণ ইতিহাস বলেছিল, শহীদ মরে না।

এখন সময় এসেছে, রাষ্ট্র তা প্রমাণ করুক।

এক পরিবার নয়, এক প্রজন্ম অনাথ হয়ে গেছে। বাবা বলেন, "সে দেশের গর্ব, সে গেছে, কিন্তু আমার দুঃখ নেই,স্বাধীনতা দিয়ে গেছে।"

এই বাক্যে যে আত্মত্যাগ লুকিয়ে আছে, তা কোনো রাজনৈতিক স্লোগানে মাপা যায় না। এটা সেই স্তব্ধ আত্মসমর্পণ, যেখানে একজন পিতা জানেন,তাঁর সন্তান আর কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটবে না, ঘরে ফিরে চা খাবে না, ব্যবসার হিসাব দেখবে না, আর কোনো দিন বলবে না, "আব্বু, একটু বিশ্রাম নেন, আমি সামলে নিচ্ছি।"

আবদুল্লাহ শুধু একজন উদ্যোক্তা ছিল না, সে ছিল এক স্বপ্নের দালান তৈরির স্থপতি। খাবার বিক্রি করে শুরু করেছিল ব্যবসার পথচলা, পরে গাড়ির পার্টস বিক্রি করে চালিয়েছিল পুরো পরিবার।

যে বয়সে অনেকে জীবন শুরু করতে শেখে, সে বয়সে আবদুল্লাহ হয়ে উঠেছিল পরিবারের চালিকাশক্তি। এই ছেলেটিই আজ একটি অন্যায় রাষ্ট্রের নখরাঘাতে নিথর। তাঁর পিতা শুধু কান্নায় ভাঙেননি, তিনি তর্জনী তুলে বলেন, "গণভবন শহীদদের জাদুঘর হোক।"

এই দাবি শুধু আবেগ নয়,এ এক রাজনৈতিক সত্য, এক নৈতিক দায়। কারণ যদি আবদুল্লাহরা না দাঁড়াত, তাহলে আমরা আর এই কথাও বলতে পারতাম না,"বাংলাদেশ স্বাধীন।"

আজ আমরা যা কিছু বলতে পারি, লিখতে পারি, শ্লোগান দিতে পারি, তা তাদের রক্তে কেনা।

আর সেই রক্ত, যা ধোলাইঘাটের ছোট ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে সোজা পৌঁছে গেছে গণভবনের মেঝেতে,তার দাগ এখনো শুকায়নি।

বাবা বলেন, "তোমরা ১৭ বছর কিছুই করতে পারোনি, আর এখন শহীদদের মূল্যায়নেও ব্যর্থ।"

এই কথার মধ্যে ইতিহাসকে জ্বালিয়ে দেওয়া অগ্নি আছে।

রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে ছোড়া এই অভিযোগ শুধু হতাশা নয়, এটি এক আত্মবিক্রিত সমাজের মুখোশ খুলে দেওয়ার চেষ্টা। কারণ আমরা কেউ আবদুল্লাহকে বাঁচাতে পারিনি, কিন্তু সবাই মিলে তার রক্তকে ছিঁড়ে ফেলার ষড়যন্ত্রে নীরব সায় দিয়েছি।

এই পরিবার এখন নিঃসঙ্গ। চারদিকে লোকজন, ক্যামেরা, আলো, প্রশ্ন,কিন্তু ভিতরে নিখুঁত শূন্যতা।

রাতে তার মা হয়তো এখনো দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন। পায়ের শব্দ শুনলেই হয়তো ভাবে, "আবদুল্লাহ ফিরছে।" কিন্তু না, এখন আর সে ফিরে আসে না।

শুধু আসে স্মৃতি, গন্ধহীন, রঙহীন, কাঁপা কাঁপা ছায়া হয়ে।

আর ইতিহাস ধীরে ধীরে লিখে নিচ্ছে তার নাম, এক শহীদের তালিকায়, এক দেশপ্রেমিকের আত্মজীবনীতে, এক বাবার বুকফাটা কান্নায়,যেখানে চোখের জলের সাথে মিশে আছে অগণিত নির্দোষ তরুণের রক্ত, আর একটি হারিয়ে যাওয়া বিপ্লবের প্রতিজ্ঞা।

**উত্তরাধিকার ও দাবিসমূহ**

আবদুল্লাহর মৃত্যুতে যেমন একজন পিতা চুপচাপ ধুঁকে মরছেন প্রতিদিন, তেমনি একটি রাষ্ট্রও আজ কাঁধে বয়ে বেড়াচ্ছে অস্বীকারযোগ্য এক ঋণ।

এটা কোনো আবেগনির্ভর কান্না নয়, এটি এক নির্মম বাস্তবতা,যেখানে একজন নাগরিক রাষ্ট্রকে তার নৈতিক দেউলিয়াপনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রেখে চলে গেছে।

আবদুল্লাহ দেশকে মুক্ত করে দিয়ে গেছেন,এই কথা প্রথমে শুনলে মনে হতে পারে বিপ্লবীদের আবেগঘন অতিশয়োক্তি। কিন্তু যদি ভালো করে শোনা যায়, রাস্তায় রাস্তায় যে শ্লোগান উঠেছিল, "স্বৈরাচার নিপাত যাক!", তার প্রতিটি ধ্বনিতে ছিল এই

বাংলাদেশ প্রতিদিন
লাশের সারি রক্তাক্ত দেশ
ঢাকাসহ জেলায় জেলায় সংঘর্ষ গুলি হামলা নিহত ১০৪
থানায় আগুন, হত্যা ১৪ পুলিশকে
মন্ত্রী এমপি নেতার বাড়ি আওয়ামী লীগ অফিসে হামলা আগুন
ছাত্রদের সঙ্গে নামছে জনতা
অসহযোগে স্তব্ধ সারা দেশ। ঢাকামুখী লংমার্চ আজ
অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ
নাশকতাকারীদের শক্ত হাতে দমন: প্রধানমন্ত্রী

দৈনিক ইত্তেফাক
দেশ জুড়ে সংঘর্ষ, নিহত ৯১
১৭ জেলায় সহিংসতায় ৮১ জনের প্রাণহানি
শেখ কামাল এর ৭৫তম জন্মবার্ষিকীতে
বিনম্র শ্রদ্ধা

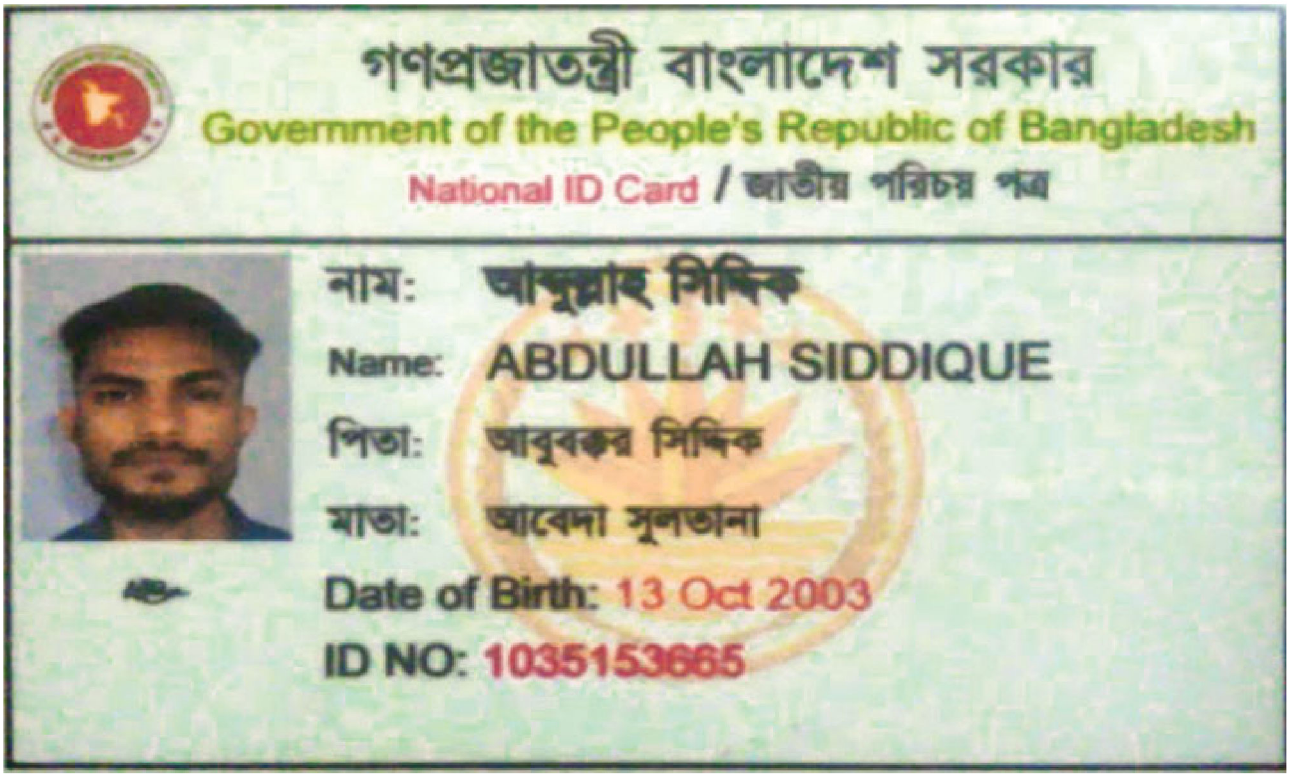
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: আব্দুল্লাহ সিদ্দিক
Name: ABDULLAH SIDDIQUE
পিতা: আবুবক্কর সিদ্দিক
মাতা: আবেদা সুলতানা
Date of Birth: 13 Oct 2003
ID NO: 1035153665

## এক নজরে শহীদ পরিচিতি

| | |
|---|---|
| শহীদের পূর্ণনাম | : আব্দুল্লাহ সিদ্দিক |
| জন্ম তারিখ/বয়স | : বয়স ২৩ বছর |
| পেশা | : ছাত্র, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ, বিবিএ-মার্কেটিং ও উদ্যোক্তা, ধোলাইঘাটে গাড়ির যন্ত্রাংশের ব্যবসা |
| পিতার নাম | : আবু বক্কর সিদ্দিক |
| পিতার পেশা | : অবসরপ্রাপ্ত |
| মাতার নাম | : আবেদা সুলতানা |
| মাতার পেশা | : গৃহিণী |
| পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা | : পিতা ও ছোট বোন |
| স্থায়ী ঠিকানা | : নাসিরুদ্দিন সরদার লেন, সদরঘাট, শুত্রাপুর, ঢাকা |
| বর্তমান ঠিকানা | : নাসিরুদ্দিন সরদার লেন, সদরঘাট, শুত্রাপুর, ঢাকা |
| শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | : হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ (মার্কেটিং বিভাগ/বিবিএ) |
| ব্যবসা | : ধোলাইঘাটে গাড়ির পার্টস |
| মাসিক আয় | : প্রায় ৫০,০০০ টাকা |
| ঘটনার স্থান | : পপুলার হাসপাতাল সংলগ্ন, ঝিগাতলা, ঢাকা |
| আঘাতকারী | : ছাত্রলীগ |
| শহীদ হওয়ার তারিখ | : ৪ আগস্ট, ২০২৪ |
| শহীদের কবরের অবস্থান | : রায়ের সাহেব বাজার পারিবারিক কবরস্থান |

**শহীদ সাফাকাত সামির**
ক্রমিক: ৭৭০
আইডি: ঢাকা সিটি: ১৩২

## “শুধু বই পড়ে, খেলনা নিয়ে খেলে আর মাঝে মাঝে বলে, মা আমি হাফেজ হব”

**জন্ম পরিচয়**

এক শান্ত সকালে জন্ম নেয় একটি শিশু। তার নাম রাখা হয় সাফকাত সামির। নামের ভেতরেই যেন ছিল কোমলতা, আর স্বভাবেও ঠিক তেমনি শান্ত, ভদ্র, সংবেদনশীল। ছোট থেকেই বাবা মায়ের পরম আদর স্নেহে ঢাকার মিরপুর-১৪ নম্বর এলাকায় নিজ বাসায় বড় হয় সামির। ঢাকার ব্যস্ততায় হারিয়ে না গিয়ে, সে বড় হতে থাকে মায়ের আদরে, কখনো নানাবাড়ির স্নেহে, কখনো বাবার কাঁধে চড়ে বাজার ঘুরে। সামির ছিল একমাত্র সন্তান। বাবা সাকিবুর রহমান রাজধানীর মিরপুরে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সামান্য চাকরি করেন। সংসার চলে টেনেটুনে, কিন্তু সামিরের পড়াশোনা আর ছোট ছোট ইচ্ছেগুলো কখনো ফেলে রাখা হয়নি। আশুলিয়া শহরে নানাবাড়ির উঠোনে খেলে শৈশবের বড় একটা সময় কেটেছে সামিরের। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ত সামির। জামিউল উলুম মাদ্রাসার নূরানী শাখায় তার রোজকার যাওয়া। হাতে খাতার ব্যাগ, আর মুখে ছোট্ট দোয়া। খেলার মাঠের চেয়ে পড়ার টেবিলে সময় দিত বেশি। তার পড়ার ঘরটা ছিল জানালার পাশে সেই জানালা, যেটি একদিন তার জন্য মৃত্যুর দরজা হয়ে দাঁড়ায়। খেলনা গাড়ি, রঙিন বই আর মেঝেতে ছড়ানো পেন্সিলগুলো যেন আজও বলে, এখানে একদিন একটা শিশু বেঁচে ছিল। সে ছিল সাফকাত সামির। এই শিশুটি বড় হয়ে কী হতো কেউ জানে না, কিন্তু তার নিষ্পাপ চাহনি আর নিঃশব্দ বিদায় আজ আমাদের বিবেকের কাছে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। “ও তো কিছুই বুঝত না আন্দোলনের,” বিলাপ করে ওঠেন তার মা। “শুধু বই পড়ে, খেলনা নিয়ে খেলে আর মাঝে মাঝে বলে, মা আমি হাফেজ হব।”

### শাহাদতের প্রেক্ষাপট

১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার। ঘড়ির কাঁটা তখন সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই। রাজধানীর মিরপুর-১৪ নম্বর এলাকায় দোতলার বাসায় চলছিল অস্থির সময়। বাইরে গুলির শব্দ, কাঁদানে গ্যাস, হেলিকপ্টারের গর্জন। বাইরে আন্দোলন চলছিল কোটা সংস্কারের দাবিতে। কাফরুল থানার সামনে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল ছাত্র-জনতা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সামির ছিল বাসায়। বিকেলে একটু খেলবে বলে বাবার কাছে বায়না ধরেছিল। কিন্তু গুলির আওয়াজে বাবা তাকে ঘরে থাকতে বলেন। সন্ধ্যায় চটপটি খাওয়ার কথা ছিল তার। "সন্ধ্যায় গ্যাসের ধোঁয়া এসে যখন ঘর ভরিয়ে দিল, তখন সামির জানালা বন্ধ করতে এগিয়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে থেকে আসা বুলেট তার ছোট্ট চোখটা ভেদ করে দেয়," এক নিঃশ্বাসে বলে চলেন তার বাবা সাকিবুর রহমান। সামিরের চাচা পাগলের মতো কোলে তুলে ছোটেন পাশের মার্কস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দিকে। "ডাক্তার কিছু না বলেই শুধু বললেন, 'ও আর নেই।'" বাবা সাকিবের কণ্ঠটা তখন যেন থেমে যাওয়া কোনো নদী। সঙ্গে ছিলেন আরেক চাচা মশিউর। তার কাঁধে লেগেছিল গুলি। ১৪টি সেলাই দিতে হয়েছিল তাকে। শিশু সামিরের গেঞ্জিটা আজও মা হাতে ধরে কাঁদেন। সেই রক্তমাখা কাপড়টা যেন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে থাকা প্রতিবাদের নিদর্শন।

সেদিন রাতেই পুলিশ লাশ নিতে চায় মুচলেকা রেখে। মামলা করতে গেলে তারা বলেন, "মামলা হলে দাফনে দেরি হবে।"

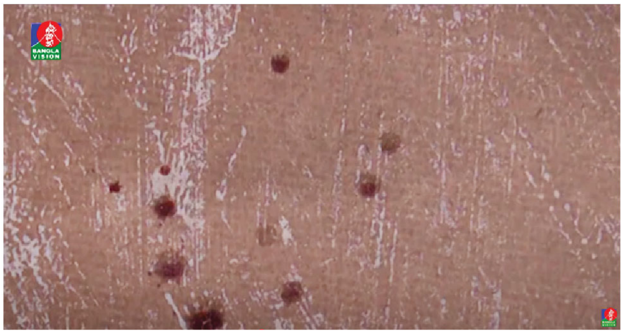

এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি আওয়ামী লীগের নেতা মো. ইসমাইল হোসেন নিজে থানায় নিয়ে যান সাকিবকে। "কোনো অভিযোগ করিনি আমি। শুধু বলেছি আমি লাশ দাফন করতে চাই," বাবা সাকিবের কণ্ঠে তখন একধরনের পরাজয় নয়, যেন শোকের ভেতরে লুকিয়ে থাকা এক প্রতিবাদ। প্রথম জানাজা হয় মিরপুরে, বাসার সামনে। এরপর ২০ জুলাই, আশুলিয়ায় হয় দ্বিতীয় জানাজা। গৌরিপুর কবরস্থানে সমাহিত করা হয় সেই নিষ্পাপ মুখটাকে।

এত শিশু-কিশোরকে কেন গুলীতে মরতে হলো প্রশ্ন সাধারণ মানুষের? সেদিন সাধারণ মানুষের মুখে ঘুরে বেড়িয়েছিল একটি প্রশ্ন: "একটা শিশু জানালা বন্ধ করতে গিয়ে মরবে কেন?" "কে নেবে এর দায়?" কেউ উত্তর দেয়নি। সাফকাত সামির এখন আর খেলতে বের হয় না। সে এখন ঘুমিয়ে আছে আশুলিয়ার গৌরিপুর কবরস্থানে। কিন্তু তার রক্তে রাঙা জানালার গল্প এখনও জীবিত।

### বিশেষ ব্যক্তিদের অভিমত

শিশু শহীদ সাফকাত সামিরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক রিফাত রশিদের বক্তব্য: মিরপুরে ১১ বছরের শহীদ হওয়া বাচ্চাটার নাম সাফকাত সামির। মিরপুরে শহীদ হওয়া ছেলেটা বেড়ে উঠেছে আশুলিয়ার যেই মহল্লায় তার নাম গৌরীপুর, আমার মহল্লা। নানাবাড়িতেই বড় হয়েছে সামির। সামিরের মা আমাদের এলাকার বড় আপু, তার সাথে আমার প্রায়ই কথা হয়, মাঝেমধ্যে কথা বলতে গিয়েও বলতে পারি না। আপুর চোখের দিকে তাকাতে ভয় লাগে। এই অভ্যুত্থানে এদেশের মানুষের ত্যাগটা আমাকে সবচেয়ে বেশি মনে করায় শহীদ সাফকাত সামিরের কবর। সামির আমার এলাকার ভাগ্নে, কিন্তু বাস্তব জীবনে

সামির আমার নেতা, আমার ইন্সপিরেশন, আমার আইডল। সামিরের মৃত্যুর পর শোক থেমে থাকেনি। প্রতিবাদের দাবানলও নেভেনি।

### মামলায় অভিযোগ

খুনি শেখ হাসিনাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময়ে রাজধানীর কাফরুল থানা এলাকায় অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারীর গুলীতে জামিউল উলুম মাদ্রাসার নূরানি দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী সাফকাত সামিরকে হত্যার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ হুমায়ুন কবীরের আদালতে রোববার (২ সেপ্টেম্বর ২০২৪) শহীদের বাবা মো. সাকিবুর রহমান চৌধুরী বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। আদালত বাদীর জবানবন্দী গ্রহণ করে কাফরুল থানা পুলিশকে অভিযোগটি এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেন। মঙ্গলবার (৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ) সংশ্লিষ্ট আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র বলছে, এর আগে একই ঘটনায় কাফরুল থানায় মামলা হওয়ায় দুটি মামলা একত্রে তদন্তের নির্দেশ দেন আদালত। মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবী মোহাম্মদ মাসুম খান গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। মামলার অপর উল্লেখযোগ্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন, আওয়ামী শীর্ষ সন্ত্রাসী ওবায়দুল কাদের, আসাদুজ্জামান খান কামাল, খুনি আনিসুল হক, সন্ত্রাসী চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, হাবিবুর রহমান, মেহেদী হাসান (পলাশ) ও মো. ফারুকুল আলম প্রমুখ।

মামলায় আরও ৫০/৬০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামী করা হয়েছে। মামলায় অভিযোগ করা হয়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ১৯ জুলাই ২০২৪ আসামীদের নির্দেশে অজ্ঞাত আসামীর গুলীতে দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী সাফকাত সামির নিহত হয়।

### অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা

সাফকাত সামিরের পরিবার বর্তমানে আর্থিক সংকটে দিন পার করছে। বাবা সাকিবুর রহমান একটি ছোট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, যা পরিবারের ন্যূনতম খরচ চালানোর জন্য যথেষ্ট নয়। পরিবারটির দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা প্রয়োজন:

১. শহীদ শিশুর নামে শিক্ষা সহায়তা তহবিল গঠন
২. পরিবারকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও চিকিৎসা সহায়তা
৩. পিতাকে স্বাবলম্বী করতে একটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক উদ্যোগে সহায়তা
৪. শহীদ পরিবারকে একটি স্থায়ী ঘর দেওয়া উচিত
৫. পরিবারকে মাসিক ভাতা ও এককালীন ক্ষতিপূরণ
৬. গুলিবিদ্ধ চাচার চিকিৎসা ব্যয় সরকারিভাবে বহন করা

6/17/25, 1:36 PM জানালায় দাঁড়াতেই হেলিকপ্টার থেকে বুলেট এসে কেড়ে নিল শিশু সামিরের জীবন - দৈনিক সংগ্রাম

সংগ্রাম

প্রচ্ছদ > বাংলাদেশ > রাজধানী

রাজধানী

ছাত্র-জনতার বিপ্লব : গৌরব গাঁথা

**জানালায় দাঁড়াতেই হেলিকপ্টার থেকে বুলেট এসে কেড়ে নিল শিশু সামিরের জীবন**

২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল অনেক শিশু-কিশোর। তাদের ও তাদের পরিবারের স্বপ্নটা আর কোনো দিন পূরণ হবে না।

PRINTED EDITION

২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল অনেক শিশু-কিশোর। তাদের ও তাদের পরিবারের স্বপ্নটা আর কোনো দিন পূরণ হবে না। প্রায় শতাধিক শিশু-কিশোর শহীদ হয় জুলাই বিপ্লবের সময়। ২০২৪ এর জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে শহীদ হন শিশু সাফকাত সামির। ১১ বছর বয়সী শিশু সামির পড়তেন নূরানী মাদ্রাসায়। ১৯ জুলাই ২০২৪ নিজের বাসায় বুলেটবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন আমাদের ছোট্ট সামির। জানালার পাশেই সামিরের পড়ার টেবিল। পড়ার বই, প্লাস্টিকের খেলনা, ঘরের মেঝেতে এখনো ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। ১৯ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার জানালা দিয়ে আসা একটি বুলেট

## এক নজরে শহীদ সাফকাত সামির

| | |
|---|---|
| নাম | : সাফকাত সামির |
| পিতা | : সাকিবুর রহমান |
| জন্ম | : ২০১৩ |
| বয়স | : ১১ বছর |
| শিক্ষা | : জামিউল উলুম মাদ্রাসা, নূরানী দ্বিতীয় শ্রেণি |
| বর্তমান ঠিকানা | : মিরপুর-১৪, ঢাকা |
| স্থায়ী ঠিকানা | : চাটখিল, নোয়াখালী |
| শহীদ হওয়ার তারিখ | : ১৯ জুলাই ২০২৪, সন্ধ্যায় |
| স্থান | : মিরপুর-১৪, কাফরুল থানা |
| কারণ | : জানালা বন্ধ করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ |
| আক্রমণকারী | : পুলিশ |
| চিকিৎসা | : মার্কস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে মৃত ঘোষণা |
| জানাজা | : প্রথম জানাজা মিরপুর, বাসার সামনে, দ্বিতীয় জানাজা ২০ জুলাই ২০২৪ আশুলিয়া (নানাবাড়ী) |
| দাফন | : ২০ জুলাই ২০২৪, আশুলিয়া গৌরিপুর, সকাল ০৮:৩০ মিনিট |

# বাড়ি গড়ার স্বপ্নে থেমে যাওয়া জীবন

## শহীদ লেবু শেখ

ক্রমিক: ৭৭১

আইডি: ঢাকা সিটি: ১৩৩

### জন্ম ও বেড়ে ওঠা

১৯৮৪ সালের ২৮ জুলাই সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার ছোট্ট গ্রাম ডুমরাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন মো. লেবু শেখ। গ্রামের এক প্রান্তে কাঁচা রাস্তাঘেরা টিনের ছাউনির ঘরে তাঁর শৈশব শুরু হয়। বাবা জোরতুল্লা শেখ ছিলেন একজন সাধারণ কৃষক, আর মা নাজমা বেগম সবুরা ছিলেন গৃহিণী। ছয় ভাইবোনের মধ্যে লেবু ছিলেন দ্বিতীয়, কিন্তু পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয় তাকেই প্রথম। শিশু লেবুর কচি হাত যখন খেলার জন্য বাড়ির উঠানে মাটি খুঁড়ছিল, তখনই সময় তাকে টেনে নেয় বাস্তবতার নির্মম পাঠশালায়। পরিবারে নিত্যদিনের অভাব-অনটন, ধান-চাল নিয়ে মায়ের চোখের জল, আর বাবার ক্লান্ত মুখচ্ছবি সবকিছুই ছোট্ট লেবুকে সময়ের আগেই বড় করে তোলে। জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণেই যখন হিমশিম খেতে হয়, তখন স্কুলের বই-খাতা যেন এক বিলাসিতা হয়ে দাঁড়ায়। অল্প বয়সেই তাকে স্কুলের চৌকাঠ পেরোনোর পরিবর্তে ঢুকতে হয় মানুষের দোকানে শিখতে হয় মাল তুলতে, হিসেব করতে, আর কীভাবে মুচকি হেসে প্রয়োজনের তুলনায় কম খাবারেও পরিপূর্ণ থাকার ভান করতে হয়। কেউ হয়তো বলবে, সে ছিল এক 'বঞ্চিত' ছেলে, কিন্তু বাস্তবতা বলবে সে ছিল এক 'সংগ্রামী' মানুষ, যিনি জীবনকে আলিঙ্গন করেছেন নিজের মতো করে, নীরবে, কিন্তু অবিচলভাবে লেবুর বেড়ে ওঠা ছিল ধুলোমাখা মেঠোপথ আর ঘেমে ভেজা পোশাকে।

গ্রামের হাটে দোকানের বয় হিসেবে কাজ করতেন তিনি। সেখানেই শিখেছিলেন মানুষের সঙ্গে কথা বলা, হাসতে শেখা, বিশ্বাস অর্জন করা। তার দিনগুলো কাটত কাজের মধ্য দিয়ে, আর রাতগুলো স্বপ্ন বোনায় যেখানে একদিন নিজের একটা ঘর থাকবে, মায়ের জন্য একটা ভালো বিছানা থাকবে, আর সংসারে থাকবে একটু শান্তি। তাঁর শৈশব-কৈশোর কোনো শিশুসুলভ বিলাসিতা পায়নি, পায়নি কোনো আলোর ঝলকানি। কিন্তু তিনি তবু হেরে যাননি। বরং দারিদ্র্য, বঞ্চনা আর একাকিত্বের মাঝেই গড়ে তুলেছিলেন এক সৎ, পরিশ্রমী এবং আত্মসম্মানবোধে ভরা চরিত্র। তাঁর বেড়ে ওঠা ছিল এক নিঃশব্দ লড়াইয়ের গল্প, যা প্রতিদিনই চলছিল সমাজের অবহেলিত এক প্রান্তে, চোখের আড়ালে।

### কর্মজীবন ও স্বপ্ন

যার শৈশব কেটেছে দারিদ্র্যের আঁধারে, তার পক্ষে স্বপ্ন দেখা যেমন কঠিন, তেমনি তা পূরণ করাও হয়ে ওঠে এক বিশাল সংগ্রাম। মো. লেবু শেখ সেই সংগ্রামীদের একজন, যিনি জীবনের প্রতিটি ধাপ পেরিয়েছেন মাথা নিচু না করে, আত্মসম্মানের সঙ্গে, পরিশ্রমের ঘাম মুছে। কিশোর বয়সেই স্কুলের ব্যাগ ফেলে হাতে তুলেছিলেন শ্রমের বোঝা। মানুষের দোকানে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, পরে ঢাকার পোশাক শিল্পে ঢুকে পড়েন শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘ মিছিলে। শত শত শ্রমিকের ভিড়ে লেবু ছিলেন এক নীরব কর্মী, যিনি দিনের পর দিন সেলাই মেশিনের শব্দে নিজের ভবিষ্যতের ছাপ একে গেছেন কাপড়ের পরতে পরতে। পোশাক কারখানার জীবন সহজ ছিল না। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কাজ, নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণের চাপ, আর শ্রমের ন্যায্য মজুরি না পাওয়ার যন্ত্রণা সবকিছু সয়ে নিয়েও লেবু হার মানেননি। তিনি জানতেন, তার প্রতিটি দিনের ঘাম জমা হচ্ছে এক স্বপ্নের কিস্তিতে একদিন নিজের একটি ঘর হবে, যেখানে থাকবে শান্তি, নিরাপত্তা আর ভালোবাসার ছায়া। এই স্বপ্নের পথে এগিয়ে তিনি গ্রামের বাড়ির পাশে একটি নিচু জমি কিনে ফেলেন, বড় ভাইয়ের সঙ্গে মিলে। শুধু জমি কিনেই থেমে থাকেননি, প্রায় ৪০০ ট্রাক মাটি ফেলে জমিটিকে ভরাট করেন। কল্পনায় হয়তো তখনই দেখতে পেতেন ঘরের উঠোনে মা বসে আছেন, স্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে আদর করে পানি দিচ্ছেন বাগানের গাছে। হয়তো ভাবতেন দরজার সামনে নামাজ শেষে সূর্যের আলোয় ঝলমল করবে শান্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি। তার পরিকল্পনা ছিল, ২০২৫ সালের শুরুতেই ঘরের কাজ শুরু করবেন। কাঠামো হবে টিনের, মেঝে সিমেন্টের, কিন্তু স্বপ্নটা হবে কংক্রিটের চেয়েও বেশি শক্ত কারণ সেটি হবে তার শ্রমের উপার্জনে গড়া নিজের ঠিকানা। কিন্তু নিয়তির নির্মমতা মানুষকে সবসময় স্বপ্ন পূরণের সুযোগ দেয় না। অনেক স্বপ্ন যেমন চোখের পাতা বেয়ে বাস্তবের ধূলায় পড়ে যায়, তেমনি লেবুর স্বপ্নটাও পড়ে গেল রক্তের স্রোতে। সেই জমি আজও হয়তো পড়ে আছে, ঘরহীন, স্বপ্নহীন, কেবল বাতাস জানে, কতটা কষ্ট নিয়ে তা দাঁড়িয়ে আছে এক শহীদের অপেক্ষায়।

### পারিবারিক জীবন

জীবনের ভাঙাচোরা পথে হাঁটতে হাঁটতে মো. লেবু শেখ একদিন পাশে পেলেন একজন জীবনসঙ্গিনী সেলিনা আক্তার। সন্তান না থাকলেও এই দম্পতির সংসার ছিল পরিপাটি, মমতাময়, আর পরস্পরের প্রতি আস্থায় গড়া। সেটা কোনো ধনী পরিবার নয়, কোনো বিলাসিতার সংসারও নয় তবে তাতে ছিল আত্মিক শান্তি,

বিএসএস নিউজ
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার অনলাইন পোর্টাল
মঙ্গলবার | ১৭ জুন ২০২৫, ৩ আষাঢ় ১৪৩২
Archive EN

## নিজ জমিতে বাড়ি করা হলো না শহীদ পোশাক শ্রমিক লেবু শেখের

বাসস

৩১ মে ২০২৫, ১০:২৫

শ্রদ্ধা আর হৃদয়ের নিঃশব্দ বন্ধন। সেলিনার জীবনও কম কষ্টের ছিল না। মাত্র তিন মাস বয়সে মা হারানো মেয়েটিকে বাবার স্নেহও দীর্ঘস্থায়ীভাবে জোটেনি। বাবার দ্বিতীয় বিয়ের পর নতুন সংসারে জায়গা না পেয়ে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় খালার বাড়িতে। সেখানেই ধীরে ধীরে বড় হয়েছেন সেলিনা, খালার কোলে পাওয়া স্নেহটাই ছিল তাঁর একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু সেই আশ্রয়ও একসময় হারিয়ে যায় খালাও মারা যান। তখন, বিয়ের উপযুক্ত বয়স হতেই আত্মীয়স্বজনেরা সিদ্ধান্ত নেয় এই অনাথ মেয়েটিকে বিয়ে দিতে হবে, যেন অন্তত তার জীবনে একটি ঠাঁই তৈরি হয়। সেই আশ্রয় হয়েই এলেন লেবু শেখ। একজন সৎ, পরিশ্রমী এবং সংবেদনশীল পুরুষ, যিনি সেলিনাকে শুধু স্ত্রী নয়, একজন মানুষ হিসেবে সম্মান দিতেন। সেলিনা নিজেও উপলব্ধি করেছিলেন, জীবনের অমানিশার পর এই মানুষটিই যেন এক নিঃশব্দ আলো হয়ে এসেছেন তাঁর জীবনে।

তাদের সংসার ছোট ছিল, কিন্তু শান্তিতে পূর্ণ। লেবু ছিলেন ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে নিষ্ঠাবান, কথায় মিতভাষী, চালচলনে সাদামাটা। জাগতিক লোভ-লালসা তাঁর জীবনে কখনো স্থান পায়নি। তিনি বিশ্বাস করতেন সৎ পথে পরিশ্রম করে খাওয়া ও নিজের ঘর বানানোই জীবনের আসল সফলতা। সেলিনা বলতেন, "লেবু খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। আল্লাহর পথে চলতে চাইতেন। কোনো রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন না। সাধারণ জীবন কাটাতেন।" এই সাধারণত্বের মাঝেই ছিল অসাধারণ এক ভালোবাসা, একনিষ্ঠতা আর পারস্পরিক সম্মানের বন্ধন। সন্তান না থাকলেও তাদের দাম্পত্যজীবনে কখনো বিরক্তি কিংবা অভাব বোধ বাসা বাঁধতে পারেনি। বরং প্রতিটি দিন ছিল নতুন আশায় জেগে ওঠা, নতুন করে সংসার গড়ার স্বপ্নে পথ চলা। লেবু সেলিনাকে কখনো কষ্ট না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন মনের ভেতর। তিনি তাঁর সীমিত উপার্জন দিয়েই স্ত্রীর মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছেন প্রতিদিন। একসঙ্গে বাজারে যাওয়া, ঈদের দিনে নতুন জামা কিনে দেওয়া, আর মাঝেমধ্যে হাতে হাত রেখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন গড়া এটাই ছিল তাদের সুখ। সেই ঘর আজ নিঃসঙ্গ। সেলিনার জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো বড় শূন্যতা নেমে এসেছে, তবে এবার তা আরও কঠিন, আরও স্থায়ী। স্বামীর ছবি হাতে নিয়ে, হয়তো তিনি আজও ভাবেন যদি আরও একটু সময় পেতেন, তবে লেবুর সেই স্বপ্নের ঘরটা তারা একসঙ্গে গড়তে পারতেন।

### জুলাই বিপ্লব ও আন্দোলনে যোগ

২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের ইতিহাসে সূচিত হয় এক নতুন অধ্যায় যা আজ "জুলাই বিপ্লব" নামে পরিচিত। এটি ছিল নিছক কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়; বরং ছিল নিপীড়িত, অবহেলিত ও বৈষম্যের শিকার সাধারণ ছাত্র-জনতার আত্মচিৎকার। শহর থেকে গ্রাম, গার্মেন্টস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, রিকশাচালক থেকে ডাক্তার সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ যেন এক কণ্ঠে বলে উঠেছিল: "এ বৈষম্য চলবে না!" এই আন্দোলন যেন হাজারো শোষিত মানুষের জমে থাকা দীর্ঘশ্বাসের বিস্ফোরণ, যুগপৎ অভিমান ও দ্রোহের বহিঃপ্রকাশ। এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ন্যায্য অধিকার, মানবিক মর্যাদা এবং রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রতিবাদ। ঢাকার রাজপথ থেকে শুরু হয়ে আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামের চৌরাস্তার মোড়েও মানুষ জড়ো হয়ে দাঁড়ায় নিজেদের অধিকারের পক্ষে। এ আন্দোলন ছিল শ্রমজীবী মানুষেরও আন্দোলন। গার্মেন্টস শ্রমিক, দিনমজুর, খেটে খাওয়া মানুষ যারা প্রতিদিনের রুটির জন্য ঘাম ঝরায়, অথচ তাদের কণ্ঠ কখনো রাষ্ট্রের কানে পৌঁছায় না তাদেরও ছিল এই বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। মো. লেবু শেখ ছিলেন এই শ্রমজীবী মানুষেরই একজন প্রতিনিধি। রাজনীতি নয়, কোনো দলীয় ব্যানার নয় তিনি এসেছিলেন অন্তরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল একটা পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখা। একটা এমন বাংলাদেশ, যেখানে শ্রমিকের ঘামকে অবহেলা করা হবে না, যেখানে একজন সাধারণ মানুষও তার পরিবারের জন্য মাথা গোঁজার ঠাঁই গড়তে পারবে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ঘোষিত "মার্চ টু ঢাকা" কর্মসূচি ছিল সেই আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রীয় আহ্বান। হাজারো মানুষের সঙ্গে ঢাকামুখী যাত্রায় অংশ নেন লেবু শেখও। সাভারের আশুলিয়া থানার কাছাকাছি যখন মিছিল পৌঁছায়, তখন লেবু সেখানে ছিলেন সবার কাতারে। চোখেমুখে ছিল প্রত্যয়ের দীপ্তি, হৃদয়ে ছিল একটি মুক্ত সমাজের স্বপ্ন। তিনি কোনো রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন না, ছিলেন না কোনো মঞ্চের বক্তা তবুও এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল গভীর, একান্ত। কারণ, এটা ছিল তাঁর মতো মানুষের জন্যই; তাদের স্বপ্নের জন্যই এই বিপ্লব। সেদিন তাঁর মনে কোনো ভয় ছিল না। ছিল না কোনো সন্দেহ। বরং লেবু বিশ্বাস করতেন আন্দোলনের

মুক্ত চিন্তার দুরন্ত প্রকাশ
রূপালী বাংলাদেশ

সারাদেশ

## রায়গঞ্জে আন্দোলনে নিহত লেবু'র মরদেহ উত্তোলন

রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ফেব্রুয়ারি ২, ২০২৫, ০৯:২১ পিএম

Shares

শক্তিই একদিন গড়বে ন্যায়ের সমাজ। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণের আগেই থেমে গেল তাঁর যাত্রা যেন রাষ্ট্র নিজেই ভয় পেয়ে গুলি চালিয়ে থামিয়ে দিল এক গরিব মানুষের সাহসিকতা।

### শহীদ হওয়ার ঘটনা

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট। বাংলাদেশের ইতিহাসে লেখা থাকবে এক রক্তাক্ত দিন হিসেবে। সে দিনের সূর্যও যেন উঠেছিল অশান্ত আকাশ ছুঁয়ে। চারদিকে উত্তেজনা, গুঞ্জন, আর আন্দোলনের ঢেউ। দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসছিল 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে অংশ নিতে হৃদয়ে ছিল অধিকার ফেরত পাওয়ার প্রত্যাশা, কণ্ঠে ছিল প্রতিজ্ঞার ঝংকার। লেবু শেখও সেই জনস্রোতের এক নীরব সৈনিক। কোনো দলের ব্যানার ছিল না তাঁর হাতে, ছিল না চোখেমুখে হিংস্রতা। শুধু ছিল বিশ্বাস এই পথচলা একদিন তার মতো হাজারো সাধারণ মানুষের ভাগ্য বদলে দেবে। তিনি ছিলেন আশুলিয়ায়, আন্দোলনের একটি মুখ্যস্থানে। পথ ছিল দীর্ঘ, ধুলোমলিন, তবুও মনে ছিল আশার আলো। তবে রাষ্ট্রের চোখে এ ছিল যেন অপরাধ। সকাল গড়িয়ে দুপুরের দিকে পুলিশ অতর্কিতে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালায়। রাজপথ মুহূর্তেই পরিণত হয় মৃত্যুপুরীতে। মানুষ ছুটোছুটি করে, চিৎকারে আকাশ ফেটে যায়, আর ধুলোর ভেতর ঢলে পড়েন লেবু শেখ পেটে গুলি লেগে রক্তাক্ত অবস্থায়। কোনো অ্যাম্বুলেন্স ছিল না, কোনো চিকিৎসার সুযোগও মেলেনি। গরিব মানুষের প্রাণ যে এত সহজে ঝরে পড়ে, রাষ্ট্র যেন তারই প্রমাণ দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায় লেবু আর নেই। খবর ছড়িয়ে পড়ে সাভার থেকে রায়গঞ্জের ডুমরাই গ্রাম পর্যন্ত। হৃদয় বিদারক কান্নায় ভেঙে পড়েন স্ত্রী সেলিনা, মা নাজমা বেগম, বড় ভাই ফজল হোসেন, আর সেই আদরের ভাতিজা হাছান যাকে সন্তান হিসেবে গড়ে তুলছিলেন লেবু। লাশ আনার জন্য কোনো সরকারী সাহায্য মেলেনি। পরিবার নিজের টাকায় একটি পিকআপ ভাড়া করে তাঁর নিথর দেহ গ্রামে নিয়ে আসে। কোথাও ছিল না রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, কোথাও ছিল না কোনো দায়বদ্ধতা। পরদিন ৬ আগস্ট সকালে, গ্রামের কবরস্থানে জানাজা শেষে দাফন করা হয় শহীদ লেবু শেখকে। কোনো ময়নাতদন্ত হয়নি, হয়নি বিচার বা তদন্তের উদ্যোগ। শুধু একটি দুঃখ ভারাক্রান্ত দাফন যেখানে মাটি চাপা পড়ে এক গরিব মানুষের সব স্বপ্ন, ঘর তৈরির আশা, ভালোবাসার সংসার আর বেঁচে থাকার সাধ। তার মৃত্যুর মুহূর্তটি ছিল শুধুই একটি ঘটনা নয় তা ছিল রাষ্ট্রের ন্যায়বিচারহীনতার নগ্নতম প্রকাশ, বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এক সাহসী কণ্ঠের রক্তাক্ত পতন।

### নিকটাত্মীয়দের অভিমত

লেবুর বড় ভাই ফজল হোসেন বলেন, "ভাই হারানোর কষ্ট বোঝানো যায় না। সে নিজের সন্তান না থাকলেও আমার ছেলেকে নিজের ছেলের মতো করেই মানুষ করছিল।" তার ছেলে হাছান বলেন, "আমি তাকে 'আব্বু' আর চাচিকে 'আম্মু' বলে ডাকতাম। ঘটনার দিন চাচা বারবার ফোন দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। পরে খবর পাই তিনি শহীদ হয়েছেন।"

স্ত্রী সেলিনা বলেন, "আল্লাহ আমার কপালে সুখ রাখেননি, তাই স্বামীকে অসময়ে নিয়ে গেলেন। এখন শুধু একটাই চাওয়া তিনি যেন জান্নাতবাসী হন।" তিনি আরও বলেন, "যারা আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন, তাদের সবাইকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।"

লেবুর মা নাজমা বেগম কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "ছেলেকে কিছু দিতে পারিনি। সেই ছেলেকে গুলি করে মেরে ফেলল। আমার বুক খালি করে দিল। আমি বিচার চাই।"

### শহীদ-পরবর্তী জীবন ও সহায়তা

শহীদ হওয়ার পর সেলিনা ফিরে যান তার বাবার বাড়ি, জামালপুরে। জীবনের প্রতিটি দিন কাটছে অনিশ্চয়তা আর বেদনার সঙ্গে। পরিবারের দাবি, সেলিনার একটি চাকরি নিশ্চিত করলে হয়তো সে তার জীবনটা কিছুটা হলেও টেনে নিতে পারত। সরকারিভাবে এখনও কোনো স্থায়ী সহায়তা পাওয়া যায়নি, যদিও কিছু সংগঠন ও দল এগিয়ে এসেছে। জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন থেকে ৫ লাখ টাকা এবং জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ২ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। সেই টাকা সেলিনা ও শাশুড়ি ভাগ করে নিয়েছেন। ঈদের আগে জেলা প্রশাসক, ইউএনও ও বিএনপির পক্ষ থেকে কিছু ঈদসামগ্রীও পেয়েছেন তারা। এছাড়া আশুলিয়া থানায় দায়ের করা মামলায় ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে আরও ৩০০-৪০০ অজ্ঞাত ব্যক্তি আসামি করা হয়েছে।

## এক নজরে শহীদ পরিচিতি

| | | |
|---|---|---|
| পূর্ণ নাম | : | মো. লেবু শেখ |
| জন্ম | : | ২৮ জুলাই ১৯৮৪ |
| পেশা | : | পোশাক শ্রমিক |
| পিতা | : | জোরতুল্লা শেখ (মৃত) |
| মাতা | : | নাজমা বেগম, গৃহিণী |
| স্ত্রী | : | সেলিনা আক্তার, বয়স: ২২, গৃহিণী |
| স্থায়ী ঠিকানা | : | ডুমরাই, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ |
| ধর্মীয় পরিচয় | : | ধর্মপ্রাণ মুসলমান, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন |
| পরিবার | : | স্ত্রী সেলিনা আক্তার, সন্তানহীন |
| আন্দোলনে যোগ | : | 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি, ৫ আগস্ট ২০২৪ |
| শহীদ হওয়ার স্থান | : | আশুলিয়া, সাভার |
| দাফন | : | ৬ আগস্ট ২০২৪, নিজ গ্রামে |
| সহায়তা | : | জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন, জামায়াতে ইসলামি, কিছু স্থানীয় সহায়তা |
| পরিবারের দাবি | : | রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদ স্বীকৃতি, সেলিনার চাকরির ব্যবস্থা, বিচার নিশ্চিত করা |

**অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা**

১। "লেবু শেখের স্ত্রী সেলিনা আক্তারকে পুনর্বাসনের জন্য একটি সরকারী চাকরি বা মাসিক ভাতা প্রদান করা প্রয়োজন।"
২। "পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য তাদের নামে সরকারি অনুদানে একটি ঘর নির্মাণের ব্যবস্থা করা উচিত।"
৩। "শহীদ লেবু শেখের পরিবারকে স্থায়ীভাবে সহায়তা দিতে একটি বিশেষ কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান দেওয়া যেতে পারে।"
৪। "জুলাই শহীদদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা জরুরি।"

নিউজ মিডিয়ায় প্রকাশিত খবরের লিঙ্ক

1. https://www.bssnews.net/bangla/stories-of-mass-upsurge/204166
2. https://www.deshrupantor.com/amp/571299/
3. https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/d3f8c537595c
4. https://www.rupalibangladesh.com/all-bd-news/sirajganj/32762
5. https://www.bd-pratidin.com/country/2025/02/02/1080790

# যে হকারের নীরব দাঁড়িয়ে থাকাও রাষ্ট্রের গুলির লক্ষ্য হয়ে ওঠে

**শহীদ মো: মনিরুল ইসলাম অপু**

ক্রমিক : ৭৭২

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ: ১১৪

### শহীদ পরিচিতি

তার নাম ছিল অপু মো: মনিরুল ইসলাম অপু। কোনো শিরোপা নেই, কোনো উপাধি নেই, তবু ইতিহাসের রুক্ষ পৃষ্ঠায় তার নাম আজ আগুন দিয়ে লেখা। জন্মেছিলেন চাঁদপুরে, এক নাম না-জানা গ্রামে; পিতা ফজল বেপারী, যিনি তিলে তিলে গড়েছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসার ভাঙাচোরা ভিত, আর মা শহরবানু, যিনি জীবনের সব ক্লান্তি ঢেকে রাখতেন একটা শাড়ির আঁচলে। অপু ছিলেন সেই শ্রেণির প্রতিনিধি, যাদের ইতিহাসে কোনো পাতার বরাদ্দ থাকে না। যাদের ঘর নেই, জমি নেই, ভবিষ্যৎ নেই শুধু থাকে কাঁধে একটা ঝাঁপি, হাতে কিছু মৌসুমি ফল আর চোখে একরাশ অব্যক্ত প্রতীক্ষা। ঢাকার নবাবপুর এলাকায় যারা কখনও হেঁটেছেন, তারা সবাই একবার না একবার অপুকে দেখেছেন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে, মাথায় ঘামে ভেজা গামছা, কণ্ঠে হালকা ডাকে "আম...জাম...লিচু নেন ভাই..."।

সেই ডাকের ভেতর কোনো বিপ্লব ছিল না, ছিল না রাষ্ট্র বদলের ঘোষণা, কিন্তু ছিল মানুষের প্রতি এক অনাড়ম্বর ভালোবাসা। এ ভালোবাসা ছিল জীবনের প্রতি, সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতিদিন রোদে পোড়ার এক মৃদু প্রতিজ্ঞা। অপু ছিলেন রাজনীতির বাইরে, কিন্তু অন্যায়ের বিপরীতে। বুলেট ছুঁড়ে মারলে কেউ জানতে চায় না আপনি কোন দলের, কোন পেশার, কোথা থেকে এসেছেন। তারা শুধু দেখে, আপনি দাঁড়িয়েছেন কিনা। অপু দাঁড়িয়েছিলেন সেই জুলাই বিপ্লবের দিনে, যখন মেঘের নিচে মাথা উঁচু করে উঠেছিল এক নতুন প্রজন্ম। যখন তরুণেরা বলেছিল, "এই দেশ আর একতরফা শাসন মানে না।" অপু কোনো স্লোগান দেননি, কোনো পতাকা তোলেননি, কিন্তু তিনি ছিলেন রাস্তায় সবার পাশে, একটি জাতির হৃদয়ে। সেই দিন অপু দাঁড়িয়েছিলেন গলির মোড়ে। তাঁর চোখে ছিল প্রশ্ন "এই আন্দোলনের পরে কী হবে?" তিনি উত্তর পাননি। পেয়েছেন শুধু একটুখানি শব্দ ঠাস! রাষ্ট্রের বুলেট তার বুকে ঢুকেছে, যেন বলেছে, "তোমার প্রশ্ন করার অধিকার নেই।" এভাবে হারিয়ে যায় ইতিহাসের এক নীরব প্রতীক। অপু মারা যান, ঠিক যেভাবে ধীরে ধীরে মারা যায় একটি জাতির বিবেক। একজন হকারের মৃত্যুতে কেউ সংসদে দাঁড়িয়ে শোকপ্রস্তাব রাখে না, টিভিতে আসে না তিরিশ সেকেন্ডের ব্রেকিং নিউজ। তবু অপু রয়ে যান শহরের বাতাসে, মানুষের হাঁটাচলায়, ফুটপাথে পড়ে থাকা আমের একটা ছোবলে।

তিনি শুধু পরিবার হারাননি, আমরা হারিয়েছি আমাদের সমাজের সবচেয়ে নির্মল অংশ একজন ভালো মানুষ, যে নিঃস্ব থেকেও প্রতিদিন বাঁচার শিক্ষা দিত। বড় ছেলে শাওন বেকার, ছোট ছেলে মুন্না আগেই চলে গেছে, স্ত্রী আমেনা বেগম রোজ ভোরে রান্না করতে গিয়ে এখন কাঁদেন। কারণ যার ঘামে ভাত জুটত, সে আজ রক্তে ভেসে গেছে।

এই অপু যিনি কোনো বাহিনীর সদস্য নন, কোনো ইউনিফর্মে বাঁধা ছিলেন না, তবু হয়েছেন একজন শহীদ। কারণ একটি রাষ্ট্র তাঁকে হত্যা করেছে যখন তিনি একটি প্রশ্ন করছিলেন। এখন এই প্রশ্ন আমাদের এই দেশ কার? আর কত অপু মরবে প্রতিটি উত্তরের আগে যদি লেগে থাকে একটি বুলেট? জুলাই বিপ্লব শুধু রাজনীতির পট পরিবর্তন নয়, এটি অপুর মতো নামহীনদের মুখে ইতিহাসের ভাষা তুলে দেওয়ার বিদ্রোহ। তাঁদের কথা যতদিন আমরা বলি, ততদিন বিপ্লব বেঁচে থাকে। আর একদিন, কেউ হয়তো বলবে "এক হকার, এক পিতা, এক শহীদ তাঁর নাম অপু ছিল এক জাতির মেরুদণ্ড।"

**আন্দোলনের প্রেক্ষাপট**

জুলাই ২০২৪। বর্ষাকালের বুক ফাটা আকাশের নিচে হঠাৎ করেই গর্জে ওঠে এক নিঃস্ব প্রজন্মের স্বর এ এক রক্তমাখা অধ্যায়, যেখানে প্রতিটি বৃষ্টির ফোঁটায় ভেসে আসে শ্লোগানের প্রতিধ্বনি। কোটা সংস্কারকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া আন্দোলন হঠাৎই হয়ে উঠেছিল একটি জাতির আত্মপরিচয়ের জন্য সংগ্রাম। ছয় বছর আগের প্রতিশ্রুতিকে ছিঁড়ে ফেলে শাসকগোষ্ঠী ফের কোটা ফিরিয়ে আনার ফন্দি আঁটে ২০১৮ সালের সেই বিদ্রোহ, যার আগুনে একবার ছারখার হয়েছিল মোহ, এবার তা উঠে আসে নতুন রূপে, নব যন্ত্রণা আর আরও বৃহৎ এক প্রত্যয় নিয়ে।

এইবার শুধু কোটা নয়, এইবার প্রতিবাদ চলছিল সত্যিকারের সমতা, গণতন্ত্র, আর মানুষের মৌলিক অধিকারের দাবিতে। তরুণেরা বুঝে গিয়েছিল এ লড়াই রাজনৈতিক সংস্কারের নয়, এটি অস্তিত্বের। ১ জুলাই শুরু হয় বিক্ষোভ এবং অচিরেই তা ছড়িয়ে পড়ে দেশের প্রতিটি শহর, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিটি মোড়ে। দিনে দিনে এই আন্দোলন হয়ে ওঠে এক চলমান বিপ্লব, যার পেছনে ছিল ক্ষোভ, স্বপ্ন এবং সবচেয়ে বড় কথা আবেগহীন শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রাণের দাবী।

কিন্তু ১৫ জুলাইয়ের পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। রাজপথে নামে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও পুলিশের এক যৌথ আক্রমণ। আন্দোলন রক্তাক্ত হয়। এখন আর কেবল পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা নয়, এবার গুলির আওয়াজ, এবার শরীর ভেদ করে যায় ধাতুর সুর। ঢাকার বুকে তখন শব্দ করে কাঁদছিল ফুটপাথ, ভবনের কাঁচ, মায়েদের বুক।

৫ আগস্ট দুপুর হতে রাত, যখন নবাবপুর, মতিঝিল, বংশাল সব জায়গায় জনতার ঢল, আনন্দ-সংঘর্ষের জটিল অধ্যায় রচিত হচ্ছিল, তখন সেখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন মোঃ মনিরুল ইসলাম অপু।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ মনিরুল ইসলাম অপু
Name: Md. Monirul Islam Opu
পিতা: মৃত ফজল বেপারী
মাতা: মৃত শহর বানু
Date of Birth: 14 May 1969
ID NO: 19692694035000003

তিনি ছিলেন না কোনো রাজনৈতিক কর্মী, ছিলেন না মিছিলের প্রথম সারিতে। ছিলেন এক মৌসুমী ফল বিক্রেতা, যার কাছে দেশ মানে ছিল দুপুরের রোদে ফল বিক্রি করে রাতের খাবারের টাকা জোগাড় করা। সেদিনও তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন গলির মুখে হাত খালি, চোখে একটি প্রশ্ন: "কি হবে এই আন্দোলনের পর?"

দুপুরেই স্বৈরাচার পালায়, কিন্তু তার দোসর, পুলিশ, তারা পালাতে পারেনা, গুলি চালাতে থাকে পেছন ফিরে তাকানোর আগেই। দুপুরে জনতা আনন্দে গর্জে উঠেছিল, চারপাশে শ্লোগান, বাঁশি, খইয়ের মতো কথার ফুলঝুরি কিন্তু অন্যদিকে চলছিল সারাদিন ব্যাপী সংঘর্ষ। ঠিক এই দ্বৈত বাস্তবতার মাঝখানে অপু দাঁড়িয়ে ছিলেন, না আনন্দের অংশ, না সংঘর্ষের। তিনি ছিলেন নীরব সাক্ষী কিন্তু এই সরকারের চোখে নীরবতা মানেই ষড়যন্ত্র, সাধারণতা মানেই হুমকি।

তাই সেই নীরবতাকেই রক্তাক্ত করে ফেলে এক সরকারী বুলেট। অপুর পাজরে লাগে গুলি না কোনো প্রতিরোধ, না কোনো শব্দ, কেবল একটা ভারী দেহ, ধপ করে পড়ে থাকে ফুটপাতে। তার রক্ত মিশে যায় ঢাকা শহরের ধুলোয়। কোনো সংবাদপত্রের শিরোনাম হয় না, কোনো নেতা টুইট করে না তার নাম নিয়ে তবু তার মৃত্যু হয়ে থাকে এক রাষ্ট্রীয় পাপের নির্ভুল সাক্ষ্য।

এই আন্দোলনের ইতিহাস লিখবে যারা, তাদের হাতে যদি থাকে ন্যায়ের কলম, তবে সেখানে অপুর নাম থাকবে। কারণ শহীদ শুধু সেই নয় যে পতাকাধারী শহীদ সেই, যার রক্তে পতাকা ভিজে ওঠে।

### শহীদ হওয়ার করুণ কাহিনি

রাত আনুমানিক সাড়ে এগারোটা। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট। নবাবপুরের গলির মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন মোঃ মনিরুল ইসলাম অপু শরীরে ক্লান্তি, চোখে উদ্বেগ, মনে এক অদ্ভুত শূন্যতা। আশেপাশে তখন আর যাই থাক, নৈঃশব্দ্য ছিল না, ছিল পুলিশের লাঠি ঠোকানোর শব্দ, বুটের ধাপ, আর বন্দুক তাক করার নির্মম প্রস্তুতি। রাতের আঁধারে, সেই যে এক মুহূর্ত কোনো সিনেমাটিক সতর্কতা ছিল না, কোনো যুদ্ধের ঘন্টা বাজেনি শুধু হঠাৎ এক গুলি এসে বিধে যায় তাঁর পাঁজরে। শরীরটা একটু দুলে পড়ে থাকে, কিন্তু অপু তখনো পুরোপুরি মাটিতে গড়ায়নি। তখনো বুকের ভেতর ক্ষীণ শ্বাসের কাঁপুনি চলছিল। তখনো তিনি ছিলেন জীবিত মৃত্যুর মুখোমুখি, কিন্তু এখনও পরাজিত নন।

এমনই এক সময়, কোনো এক পথচারী ছুটে গিয়ে খবর দেন তাঁর পরিবারকে "আপনার বাবা গুলি খেয়েছেন!" সে খবর যে ছেলে শুনেছিল, তার নাম শাওন। বয়স মাত্র বাইশ, অথচ সে মুহূর্তেই যেন তার বুক ফেটে দাঁড়িয়ে যায় সময়ের বিরুদ্ধে। দৌড়ে গিয়ে বাবাকে কোলে তোলে সে তখনো বাবা'র শ্বাস চলছিল, মুখে রক্ত, চোখে আতঙ্ক। ছেলের কাঁপা হাতে গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, আর বলে, "বাবা, কিছু হবে না।"

তাকে বাসায় নিয়ে রাখা হয়, সেখানেই অপুকে শেষবারের মতো চোখে চোখ রাখে তার স্ত্রী। কান্না চেপে রেখে তিনি পানি খাওয়ানোর চেষ্টা করেন হয়তো তাঁর ভেতরে তখনও আশা ছিল, এক ফোঁটা জলেই ফিরবে প্রাণের সাড়া। কিন্তু অপু চুপচাপ চোখ বন্ধ করে ছিলেন কোনো সাড়া মেলে না। তাঁকে ভ্যানে করে তড়িঘড়ি ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়, কিন্তু সেখানেই খুলে যায় আরেক দৃশ্যপট। মেডিকেলের করিডোর যেন হয়ে উঠেছিল যুদ্ধক্ষেত্র একটা একটা করে আসছিল লাশ, কান্নার শব্দ, ধাক্কা খাওয়া স্ট্রেচার, ডাক্তারদের ঘুম জড়ানো চোখ, নার্সদের গলিত দায়িত্ববোধ।

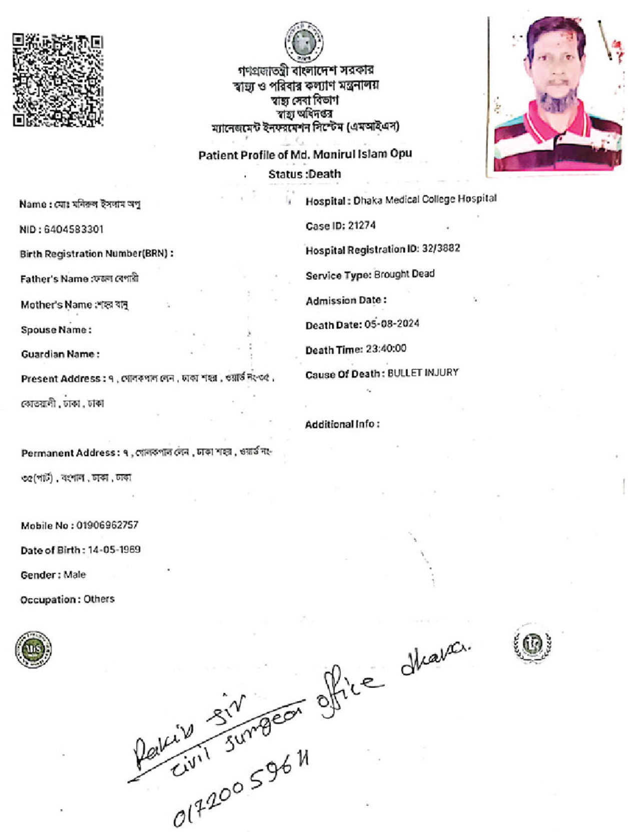
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)

Patient Profile of Md. Monirul Islam Opu
Status :Death

Name : মোঃ মনিরুল ইসলাম অপু
NID : 6404583301
Birth Registration Number(BRN) :
Father's Name :ফজল বেপারী
Mother's Name :শহর বানু
Spouse Name :
Guardian Name :
Present Address : ৭, গোলকপাল লেন, ঢাকা শহর, ওয়ার্ড নং-৩৫, কোতয়ালী, ঢাকা, ঢাকা
Permanent Address : ৭, গোলকপাল লেন, ঢাকা শহর, ওয়ার্ড নং-৩৫(পার্ট), বংশাল, ঢাকা, ঢাকা
Mobile No : 01906962757
Date of Birth : 14-05-1969
Gender : Male
Occupation : Others

Hospital : Dhaka Medical College Hospital
Case ID: 21274
Hospital Registration ID: 32/3882
Service Type: Brought Dead
Admission Date :
Death Date: 05-08-2024
Death Time: 23:40:00
Cause Of Death : BULLET INJURY
Additional Info :

Rakib sir
civil surgeon office dhaka.
01720059611

কল্পনায় বুনেছিল তাঁর স্ত্রী আমেনা বেগম সন্তানদের নিয়ে ছোট্ট একটা স্থিতি, একটু সুরক্ষা, ঘরের ভেতর কিছু নির্ভরতা। এখন সেই ঘরটি নিঃশব্দ, অথচ প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ নিঃস্বপ্রায় এক নারী প্রতিদিন নতুন কাজ খোঁজেন, পাড়ায় পাড়ায় যান রান্না বা ঝিয়ের কাজ করতে, কিন্তু কোথাও কোনো স্থায়ীতা নেই। জীবিকা তাঁর হাতে নেই, শুধু জীবনের ভার।

বড় ছেলে রবিউল ইসলাম শাওন মাত্র বাইশ বছর বয়স, অথচ মুখে গভীর এক স্থবিরতা। সে আর কাঁদে না। কান্না ফুরিয়ে গেলে মানুষ হয়তো আর্তনাদ করে না, চুপ করে থাকে। চুপ করে থেকে বলে, "বাবা ছিল বলেই বুঝিনি অভাব মানে কী।" আজ অভাব কেবল টাকা-পয়সার নয়; এ অভাব বিশ্বাসের, নিরাপত্তার, নির্ভরতার। অভাব এমন এক কিছুর, যা প্রতিদিন গলায় কাঁটা হয়ে বিঁধে, আর প্রতিরাতে শোবার আগে মনে করিয়ে দেয় এই সমাজে কেউই সত্যিকার অর্থে নিরাপদ নয়, যদি না তার কণ্ঠে ক্ষমতার সুর থাকে।

কেউ জানে না কোন দিকে আগে তাকাবে। যেন দেশটাও জানে না কে বাঁচবে, কে মরবে, কে শহীদ হবে, কে পরের সকালেও হারিয়ে যাবে খবরের পাতায়। মৃত্যু, তার চিরন্তন নিষ্ঠুরতায়, চেপে বসে রইল তাঁর বুকের উপর।

সকাল বয়ে যায়। অপুর নিথর দেহটি যখন ফিরে আসে বাসায়, তখন সেই ঘরের দরজার সামনে এক নিঃশব্দ হাহাকার। কেউ কিছু বলে না, কেউ আর কাঁদতেও পারে না শুধু বাতাস ভারী হয়ে থাকে অপূরণীয় শূন্যতায়। আজিমপুর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়, তাঁর ছোট ছেলের পাশে। মৃত্যুর পর তাঁর অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এক কবরের মাটি, আর এক সন্তানের কণ্ঠস্বরে "এই নয় মাসে আমি বুঝেছি, বাবা ছাড়া একটা পরিবার মানে কি!" এই মৃত্যু কেবল এক জনের না। এটি এক দেশের অপচেতনার নির্লজ্জ দলিল, এক রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যর্থতা, এক আন্দোলনের অনন্ত আহ্বান। অপু শহীদ হয়েছেন, কারণ তিনি মানুষ ছিলেন। আর এই দেশে, মানুষ হওয়াটাই আজ সবচেয়ে বড় অপরাধ।

**পরিবারের অভাব, আহাজারি ও দাবি**

অপুর মৃত্যুর সঙ্গে কেবল একটি প্রাণ থেমে যায়নি; থেমে গেছে একটি ছিমছাম সংসারের প্রতিদিনের রান্নার ধোঁয়া, থেমে গেছে হাসির সেই ছোট ছোট মুহূর্ত, যার কোনো খবর ছাপা হয় না পত্রিকায়। থেমে গেছে ভবিষ্যতের সমস্ত রূপরেখা, যা একদিন

আর মোনান? অপু-আমেনার ছোট ছেলে, যে আগেই বিদায় নিয়েছে পৃথিবীর মঞ্চ থেকে। আজিমপুরের এক কোণে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে সে, আর এবার তার পাশে শুয়ে আছে অপু।

এই পরিবার এখন আয়হীন নয় শুধু এরা রাষ্ট্রহীনও। কারণ রাষ্ট্র তাদের চায় না, চেনেও না। চিকিৎসার কোনো খরচ রাষ্ট্র নেয়নি, কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়নি, কোনো স্বীকৃতি তো দূরের কথা। অপু যেন অদৃশ্য, আর পরিবারটি যেন এক অনাহূত স্মৃতি যা ইতিহাস ভুলে যেতে চায়। অথচ এই পরিবারই আজ আমাদের বিবেকের আয়না, যেখানে প্রতিফলিত হচ্ছে রাষ্ট্রের নির্মমতা ও নিস্পৃহতা।

আমরা যদি সত্যিই রাষ্ট্র হয়ে থাকি, যদি এই পতাকাটিকে ভালোবেসে থাকি, তবে এই রক্তের ঋণ আমাদের ঘাড়ে চাপা পড়ে থাকা ইতিহাস নয়, এটি দায়বদ্ধতা। আমরা চাই এই পরিবারটির জন্য স্থায়ী মাসিক সহায়তা, একখানা বাসার নিরাপত্তা, এবং একজন সন্তানের কর্মসংস্থানের নিশ্চিয়তা। শহীদ অপু কেবল দাঁড়িয়েছিলেন তবু আজ তিনি আমাদের জন্য শুয়ে আছেন আজিমপুরে। তাঁর সেই দাঁড়িয়ে থাকা যেন আজ আমাদের বিবেককে ঝাঁকিয়ে দেয় একটি মৃত বাবার চেয়ে বেশি জীবিত হয়ে ওঠে একটি জেগে ওঠা জাতির দাবি হয়ে।

## এক নজরে শহীদ পরিচিতি

| | | |
|---|---|---|
| শহীদের পূর্ণনাম | : | মো: মনিরুল ইসলাম অপু |
| জন্ম তারিখ/বয়স | : | ১৪ মে ১৯৬৯, বয়স ৫৫ বছর |
| পেশা | : | মৌসুমী ফল বিক্রেতা (হকার) |
| পিতার নাম | : | মৃত ফজল বেপারী |
| মাতার নাম | : | মৃত শহর বানু |
| পরিবারের সদস্য | : | স্ত্রী আমেনা বেগম, দুই ছেলে (একজন মৃত) |
| জন্মস্থান | : | চাঁদপুর |
| স্থায়ী ঠিকানা | : | রহমতপুর কলোনি, চাঁদপুর নতুন বাজার, চাঁদপুর |
| বর্তমান ঠিকানা | : | ৭, গোলকপাল লেন, নবাবপুর/বংশাল, ঢাকা |
| আহত হওয়ার স্থান | : | নবাবপুর রোড, বংশাল, ঢাকা |
| আঘাতকারী | : | পুলিশ |
| আহত হওয়ার (গুলিবিদ্ধ) সময়কাল | : | ৫ আগস্ট, ২০২৪, আনুমানিক রাত ১১:৩০টা মৃত্যুর তারিখ ও সময় |
| শাহাদতের তারিখ | : | ০৫ আগস্ট, ২০২৪ |
| সময় | : | রাত ১১:৪০ মিনিট। (ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিল |
| স্থান | : | ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল |
| শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান | : | আজিমপুর কবরস্থান, ঢাকায় |
| রক্তের গ্রুপ | : | এ + |

# যে শ্রমজীবী ছেলে রক্ত দিয়ে প্রমাণ করে গেল, ইতিহাস শুধু রাজনীতিবিদরা লেখে না

**শহীদ মোঃ নয়ন**
ক্রমিক : ৭৭৩
আইডি : বরিশাল বিভাগঃ ০৮২

## পরিচিতি

নয়ন নামটি শুনতে যেন এক শান্ত জলের প্রতিধ্বনি, অথচ বাস্তবতায় সে ছিল ঝড়ের অনন্ত গর্জন। জন্ম ভোলার মাটিতে, এক ঘামজর্জর সংসারে। বাবা নূর ইসলাম, আজো ঢাকা শহরের ঘামে-বসা অলিগলিতে রিকশার প্যাডেলে পায়ের বল দিয়ে যুদ্ধ করেন; সেই যুদ্ধ থেমে থাকে না রোদে, না বৃষ্টিতে, না পুলিশের বাঁশিতে। মা মমতাজ বেগম, গৃহিণী, যাঁর জীবনের চারপাশে কেবল শাড়ির আঁচল, হাঁড়ির হাঁড়ি, আর ছেলেটির প্রতি গোপন গর্ব। নয়ন কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন না, ছিল না রাজনৈতিক পরিচয়, কোনো ব্যানার বা বুলেটিনে নাম লেখা ছিল না তবুও ইতিহাস তাঁকে টেনে নিয়েছে নিজের শিরোনামে।

কিন্তু এই অবজ্ঞাই তো ইতিহাসের ব্যুমেরাং। নয়ন, যিনি কোনো মিছিলে ছিলেন না, তাঁর রক্ত আজ মিছিলের পতাকা। তাঁর লাশকে কেউ কাঁধে নেয়নি বিপ্লবী স্লোগানে, কিন্তু মাটি তাকে আজ শহীদের কবরের মর্যাদা দিয়েছে। তিনি যে মারা গেছেন, তা নয় তিনি যে ছিলেন, তা আমরা বুঝি এখন, যখন চোখে পড়ে তাঁর ছেড়ে যাওয়া স্ত্রীর নিঃশব্দ কান্না, তাঁর মেয়ের অচেনা স্কুলব্যাগ, বাবার আজো চলতে থাকা রিকশা।

নয়ন ছিলেন পরিচিত না-থাকা এক বাঙালি এমন একজন, যার নাম কেউ উচ্চারণ করত না। আজ তাঁর নাম নেই নিউজে, নেই কোনো স্মারকফলকে, কিন্তু বাংলার গণঅভ্যুত্থানের কালি এখন তাঁর রক্তে লাল।

নয়ন আজ কবরের ভিতর চুপ করে শুয়ে আছেন। তবু তাঁর নীরবতা, আমাদের রক্তচাপ বাড়ায়। তাঁর গল্প বলা শেষ নয় কারণ যে জাতি তাঁকে চিনেছে মৃত্যুর পর, তারা ভুলে যেতে পারে না সহজে। নয়নের পরিচয় এখন একটি প্রশ্ন: “এই দেশে দাঁড়িয়ে থাকা মানেই কি মৃত্যুর অপেক্ষা?”

**আন্দোলনের প্রেক্ষাপট**

২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্ট বাংলাদেশের রক্তাক্ত দিনপঞ্জির পৃষ্ঠাগুলো যেন হঠাৎ আগুনে জ্বলে ওঠে। একসময়কার নির্জন ক্যাম্পাস, হতাশ ক্যান্টিন, নীরব লাইব্রেরি সব গলে গিয়ে মিশে যায়

নয়ন ছিলেন এক পোশাক শ্রমিক, নিউমার্কেট আর গাউছিয়া মার্কেটের মাঝের অন্ধকার গলিগুলোতে যাঁরা দোকানে দোকানে কাজ করেন, দিনের পর দিন খেটে যান। এক কাপ চায়ের দামও যখন ভাবনায় ফেলে, তখন নয়নের স্বপ্ন ছিল “মেয়েটাকে স্কুলে পাঠাবো।” স্ত্রী আরজু বেগমের চোখে ছিল একটি ছোট ঘরের আশা যেখানে রান্নাঘরটা আলাদা হবে, জানালায় একটু বাতাস আসবে। নয়ন ভাবতেন, “এই শহরে একদিন আমিও কাউকে ঠিকানা দিতে পারবো-নয়ন, বাড়ি নম্বর এত, গলি এত।”

তাঁর সংসারে সেই স্বপ্নের আভা ছিল, কিন্তু উপার্জনের হাত ছিল একটাই নয়নের নিজের। দুই ভাই হাসনাইন আর মহসিন তাকিয়ে ছিল বড় ভাইয়ের দিকে, যেমন মাটির শুকনো গায়ে চেয়ে থাকে বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা। নয়ন ছিলেন সেই প্রথম ফোঁটা জীবনের পিপাসায় বাঁচিয়ে রাখার আশ্বাস।

জুলাই বিপ্লবের সেই উত্তাল দিনগুলোয় নয়ন রাস্তায় ছিল না কোনো মিছিলে, কিন্তু তবুও গুলির মুখে পড়েছিলেন। পেছনে তাকালে দেখা যাবে না তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন মঞ্চে বা মাইকে তাঁকে দেখা যাবে দোকানের কর্নারে দাঁড়িয়ে, কাজ খুঁজছেন। অথচ এই কাজ খোঁজার মাঝেই গুলিটা এসেছিল এই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত অবজ্ঞার,তা যেন বলে উঠেছিল: “তোমার জীবনের দাম নেই।”

রাস্তায়, স্লোগানে, শ্বাসরুদ্ধ গর্জনে। শুরুটা ছিল কোটা সংস্কারের দাবিতে যেন ক্ষুদ্র এক কুঁড়ির মতো, অন্ধকার জমিনে ফুঁড়ে ওঠা প্রতিবাদের ডাক। কিন্তু রাষ্ট্রের নিঃশব্দ ঔদ্ধত্য আর পুলিশের রক্তচক্ষু সেই কুঁড়িকে ফুল নয়, রক্তফোয়ারায় পরিণত করল।

বেকার যুবকদের অবজ্ঞা, ভোটের নামে প্রতারণা, গুম-গ্রেপ্তার-নিপীড়নের দীর্ঘ শ্বাস সব মিলে জনগণের স্নায়ু ছিঁড়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। একনায়কতন্ত্র, যার দেহ পঁচে গিয়েছে, কিন্তু খোলসে এখনো শক্ত, তার বিরুদ্ধে নেমে এসেছিল এই প্রজন্ম। তারা বই রেখে হাতে তুলে নিয়েছিল পোস্টার; কলমের কালি বদলে গিয়েছিল চোখের জল আর গলায় আটকে থাকা আর্তনাদে। ঢাকার বাতাস শুধু ধুলায় নয়, এখন ছিল বারুদের গন্ধে ভরা। মিছিলে প্রথমে আসেনি অনেকে, কিন্তু সবাই টের পেতে লাগল এই লড়াই আর শুধু কোটার নয়, এটা অস্তিত্বের, এটা নিঃশ্বাস ধরে রাখার বিরুদ্ধে নিঃশেষ চিৎকার।

নয়নের মতো অনেকেই মিছিলে ছিল না, তবু তারা মিছিলের ভেতর ছিল। নয়ন দাঁড়িয়েছিলেন নতুন লালবাগ থানার পাশে, দুরানী ব্রিজের কাছে, ৫ আগস্ট রাত বারোটার পর। চারপাশে আতঙ্ক, আকাশে হেলিকপ্টারের শব্দ, দূরে ফ্লাইওভারের নিচে আগুনের লেলিহান। তিনি কোনো শ্লোগান দেননি, কোনো গাড়ি পোড়াননি, শুধু দাঁড়িয়ে ছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন, "এইসব দেখে রাখি, হয়তো একদিন মেয়েকে বলব এইখানে মানুষ দাঁড়িয়েছিল ইতিহাসের পাশে।" কিন্তু ইতিহাস তাঁকে নিজের পাতায় টেনে নিয়ে গেল একটি গুলি এসে তাঁর বুকে ইতিহাসের ছাপ এঁকে দিল।

নয় আগস্ট, বিকেল সাড়ে পাঁচটায়, ধানমন্ডির এক প্রাইভেট হাসপাতালে শহীদ হন নয়ন। একটি শ্রমজীবী ছেলে, যে সারা জীবন দাঁড়িয়েছে অন্যের হয়ে দোকানের মালিকের হয়ে, পরিবারের জন্য সেই ছেলেটি এবার দাঁড়িয়েছিল দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে, হয়তো অজান্তেই। কিন্তু ফ্যাসিবাদের চোখে দাঁড়িয়ে থাকা মানেই অপরাধ। আর এই দেশে, ভুল সময়ে ভুল জায়গায় জন্মালেই গুলি লাগে বুকের মাঝখানে।

নয়ন কোনো রাজনৈতিক ক্যাডার ছিলেন না, ছিল না কোনো পোস্টার বা ব্যানারে নাম। কিন্তু তাঁর শরীরেই লেখা আছে একটি মুক্তি আন্দোলনের প্রারম্ভিকা। রাষ্ট্র তাঁকে চিনেনি, জানেনি, ছুঁয়ে দেখেনি। কিন্তু আমরা জানি সে রাত, সে গুলি, সে হাসপাতালের ধুলো সবই ছিলো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা এক মানুষের শেষ সাক্ষ্য।

এই আন্দোলন নয়নকে জন্ম দেয়নি কিন্তু তাঁর মৃত্যু আন্দোলনকে দিয়েছে আরেকটি নাম, আরেকটি মুখ, আরেকটি রক্তে লেখা সত্য। আজ যখন আমরা স্মরণ করি জুলাই বিপ্লবকে, নয়নের দাঁড়িয়ে থাকা সেই মুহূর্তটিই আমাদের সবার দাঁড়ানোর শিক্ষা হয়ে থাকে শান্ত, দৃঢ়, বিপ্লবী।

### শহীদ হওয়ার করুণ কাহিনি

"রাত বারোটার দিকে কল পাই" একজন পিতার কণ্ঠে জেগে ওঠে মৃত্যুর পূর্বলিপি। এক অলক্ষ্য ফোন, এক অচেনা নম্বর, এক প্রশ্ন

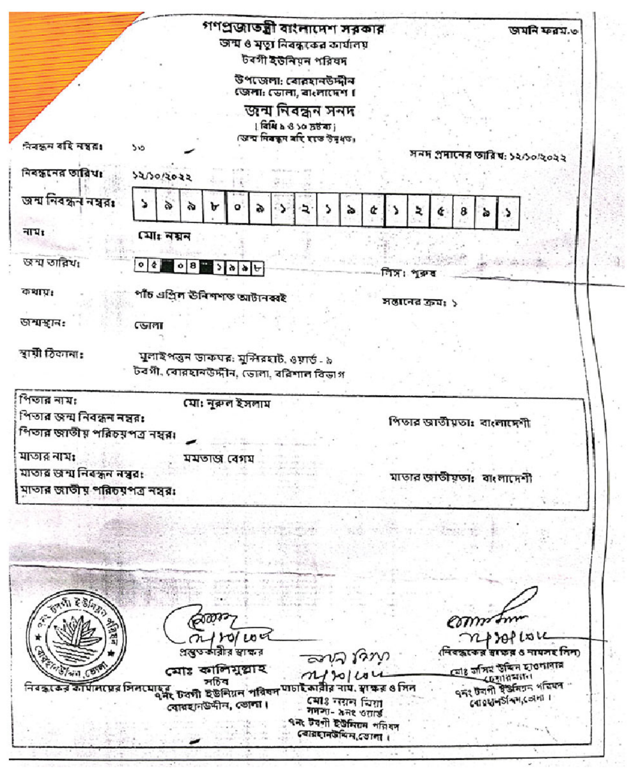

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
টবগী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: বোরহানউদ্দীন
জেলা: ভোলা, বাংলাদেশ।

জমনি ফরম.৩

জন্ম নিবন্ধন সনদ
[ বিধি ৯ ও ১০ দ্রষ্টব্য ]
(জন্ম নিবন্ধন বহি হতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নম্বর: ১৩

সনদ প্রদানের তারিখ: ১২/১০/২০২২

নিবন্ধনের তারিখ: ১২/১০/২০২২

জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ১ ৯ ৯ ৮ ০ ৯ ১ ২ ১ ৯ ৫ ১ ২ ৫ ৪ ৯ ১

নাম: মো: নয়ন

জন্ম তারিখ: ০৫ [redacted] ০৪ [redacted] ১৯৯৮

লিঙ্গ: পুরুষ

কথায়: পাঁচ এপ্রিল উনিশশত আটানব্বই

সন্তানের ক্রম: ১

জন্মস্থান: ভোলা

স্থায়ী ঠিকানা: মুলাইপত্তন ডাকঘর: মুন্সিরহাট, ওয়ার্ড - ৯
টবগী, বোরহানউদ্দীন, ভোলা, বরিশাল বিভাগ

পিতার নাম: মো: নুরুল ইসলাম
পিতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:
পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:
পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: মমতাজ বেগম
মাতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:
মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:
মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

নিবন্ধকের কার্যালয়ের সিলমোহর

প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর
মোঃ কালিমুল্লাহ
সচিব
৭নং টবগী ইউনিয়ন পরিষদ
বোরহানউদ্দীন, ভোলা।

যাচাইকারীর নাম, স্বাক্ষর ও সিল
মোঃ নয়ন মিয়া
সদস্য- ৯নং ওয়ার্ড
৭নং টবগী ইউনিয়ন পরিষদ
বোরহানউদ্দিন, ভোলা।

(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সিল)
মোঃ জসিম উদ্দিন হাওলাদার
চেয়ারম্যান
৭নং টবগী ইউনিয়ন পরিষদ
বোরহানউদ্দিন, ভোলা।

"আপনার ছেলে নয়ন?" তারপরই আসে অসম্ভব বাক্যটি: "সে পাঁচটা গুলি খেয়েছে।" বুক ফেঁটে কান্না আসেনি তখন, আসেনি হতবুদ্ধির থমথমে স্তব্ধতাও শুধু অন্ধকারে দৌড়ানো শুরু করেন বাবা নূর ইসলাম। রিকশা চালান যিনি, ঢাকার অলিগলি চেনা তাঁর ঘামের সোঁদা গন্ধে সেই মানুষটা এবার ছুটছেন মৃত্যুর ঠিকানার দিকে।

দুরানী ব্রিজের পাশে রক্তে ভেজা ছেলেটা পড়ে ছিল চেনা মুখ, অচেনা দেহ। নয়নের চোখ অর্ধেক খোলা, শরীর নিথর, কিন্তু তখনো নিঃশেষ হয়নি প্রাণ। পিতার কাঁধে তোলা, অটোরিকশায় ধাক্কাতে ধাক্কাতে হাসপাতালে নেওয়া এই পথ যেনো বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ন্যায়বিচারের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, যার গেট সামনে বন্ধ, পেছনে রক্ত ঝরে।

হাসপাতাল প্রথমে নিতে চায় না। লাশ নয়, তখনো জীবিত। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ভয়ের কাঁপুনি চিকিৎসকদের হাত কাঁপিয়ে দেয় তারা অপারেশন করেন বটে, দুটি গুলি বের করেন, বাকি গুলিগুলো শরীরের ভেতরে রেখে যায় এক মৃত্যুর রক্তচিহ্ন। উন্নতি হয়, আবার অবনতি। নয়নের ভাই হাসনাইন প্রতিটি মুহূর্ত ছিলেন পাশে, মৃত্যুর প্রতিটি ধাপের সাক্ষী হয়ে। হঠাৎ একদিন দুপুরে, ধানমন্ডির বেড়ে এসে দাঁড়ায় মৃত্যু। বলে, "চলো, এবার তোমার জায়গা এখানে নয়।" একটি পরিবারের জীবনের রুটির শেষ চাকা থেমে যায় সেদিন।

আজ নয়নের মা মমতাজ বেগম কান্না চেপে রাখেন মেয়ের সামনে, স্ত্রী আরজু বেগম চোখের জল লুকান মেয়ের চুল আঁচড়ে দিতে দিতে। আয়েশা জানে না, তার স্কুলজীবনের স্বপ্ন আজ একটি গুলির টানে থেমে গেছে। আর পিতা যিনি ছেলেকে কাঁধে তুলে এনেছিলেন একরাশ রক্তে তিনি আজো রিকশা চালান, কিন্তু হৃদয়ে বোঝা এখন অনেক ভারী।

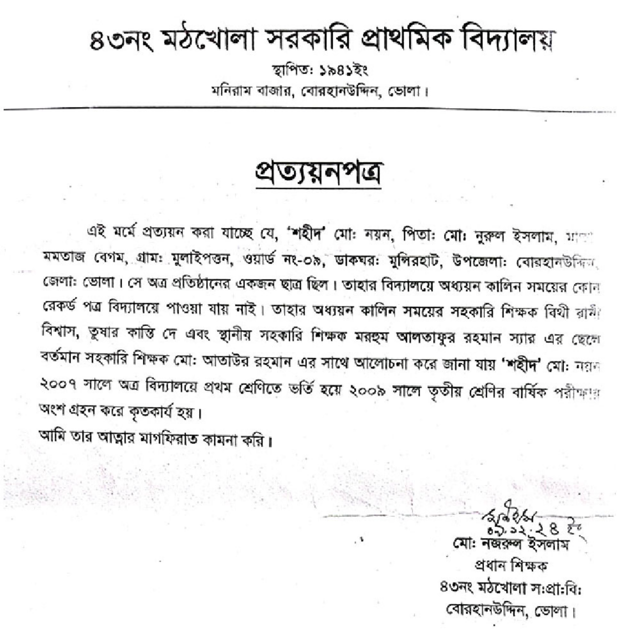
৪৩নং মঠখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
স্থাপিত: ১৯৪১ইং
মনিরাম বাজার, বোরহানউদ্দিন, ভোলা।

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, 'শহীদ' মো: নয়ন, পিতা: মো: নুরুল ইসলাম, মা[illegible] মমতাজ বেগম, গ্রাম: মুলাইপত্তন, ওয়ার্ড নং-০৯, ডাকঘর: মুন্সিরহাট, উপজেলা: বোরহানউদ্দিন, জেলা: ভোলা। সে অত্র প্রতিষ্ঠানের একজন ছাত্র ছিল। তাহার বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালিন সময়ের কোন রেকর্ড পত্র বিদ্যালয়ে পাওয়া যায় নাই। তাহার অধ্যয়ন কালিন সময়ের সহকারি শিক্ষক বিথী রানী বিশ্বাস, তুষার কান্তি দে এবং স্থানীয় সহকারি শিক্ষক মরহুম আলতাফুর রহমান স্যার এর ছেলে বর্তমান সহকারি শিক্ষক মো: আতাউর রহমান এর সাথে আলোচনা করে জানা যায় 'শহীদ' মো: নয়ন ২০০৭ সালে অত্র বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ২০০৯ সালে তৃতীয় শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করে কৃতকার্য হয়।
আমি তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

মো: নজরুল ইসলাম
প্রধান শিক্ষক
৪৩নং মঠখোলা স:প্রা:বি:
বোরহানউদ্দিন, ভোলা।

নয়ন শহীদ হয়েছেন। তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে ভোলার হাফিজিয়া ইব্রাহিম কলেজের মসজিদের পাশে নীরব এক গলি, ধান গাছের ফাঁকে ফাঁকে পাখির ডাক। তবে শান্তি সেখানেও মেলে না। মৃত্যুর তিন মাস পর রাষ্ট্র আবার তাঁকে তোলে পোস্টমর্টেমের নামে, তদন্তের নামে, আবার একবার ছুঁড়ে দেয় মৃত্যুর গ্লানি। এই রাষ্ট্র শুধু হত্যা করে না, বারবার দাফন উল্টে গা ঘেঁষে ঘুম ভাঙায় মৃত্যুর।

নয়ন ছিল না কোনো উস্কানিদাতা, কোনো তাণ্ডবকারী; তিনি ছিলেন এক পোশাকশ্রমিক, এক স্বামী, এক ভাই, এক পিতা এবং শেষমেশ, এক শহীদ। তাঁর শরীরের গুলির গর্তগুলো আজ বাংলাদেশের গৌরবের গহ্বর। রাষ্ট্র বলেছিল, "এই মাটিতে তোমার দাঁড়ানোর অধিকার নেই।" কিন্তু তাঁর কবর আজ সেই মাটিতেই শুয়ে বলে "এ মাটি আমারও, এ অধিকার রক্ত দিয়ে কিনেছি।"

এ মৃত্যু কেবল নয়নের নয় এ মৃত্যু এই রাষ্ট্রব্যবস্থার রক্তচাপ মাপার মেশিন হয়ে গেছে। আমরা যখন ভুলে যাই, তখন নয়নের লাশ আবার উঠে দাঁড়ায় জিজ্ঞেস করে, "তোমরা কোথায় ছিলে সেদিন?"

### পরিবারের অবস্থা ও দাবি

নয়নের মৃত্যুর পর কেবল কয়েকজন মানুষ কাঁদেনি তার সাথে কেঁদেছে দেয়ালে ঝোলানো একটি পুরনো পাঞ্জাবি, খাবার টেবিলে চিরতরে খালি পড়ে থাকা একটি প্লেট, আর দোতলার বারান্দায় রোদ পোহানো এক জোড়া ছেঁড়া স্যান্ডেল। শহীদ নয়নের মৃত্যু এত নিঃশব্দ ছিল যে, কারও কানে পৌঁছায়নি কিন্তু এত গভীর ছিল যে,

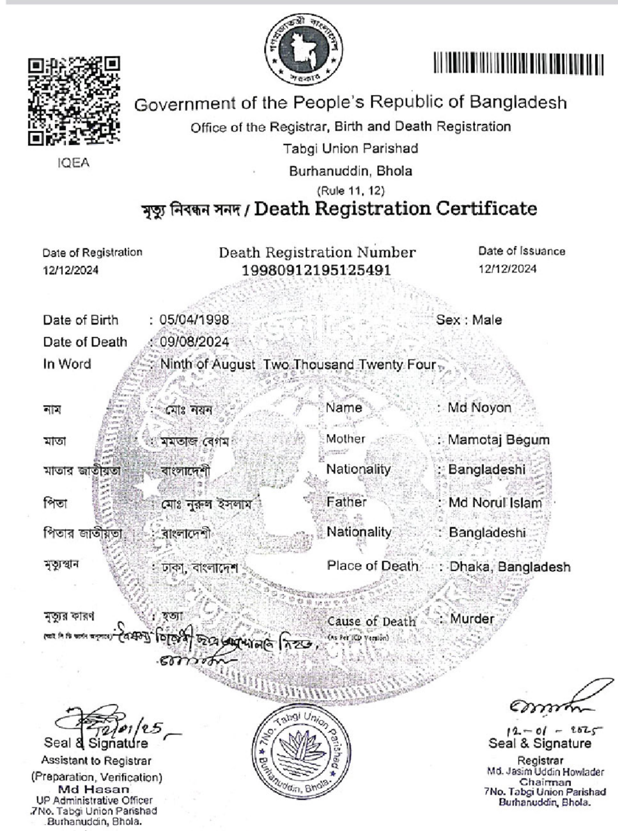
Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Tabgi Union Parishad
Burhanuddin, Bhola
(Rule 11, 12)
মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

IQEA

| Date of Registration | Death Registration Number | Date of Issuance |
| --- | --- | --- |
| 12/12/2024 | 19980912195125491 | 12/12/2024 |

Date of Birth : 05/04/1998 Sex : Male
Date of Death : 09/08/2024
In Word : Ninth of August Two Thousand Twenty Four

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| নাম | : মোঃ নয়ন | Name | : Md Noyon |
| মাতা | : মমতাজ বেগম | Mother | : Mamotaj Begum |
| মাতার জাতীয়তা | : বাংলাদেশী | Nationality | : Bangladeshi |
| পিতা | : মোঃ নুরুল ইসলাম | Father | : Md Norul Islam |
| পিতার জাতীয়তা | : বাংলাদেশী | Nationality | : Bangladeshi |
| মৃত্যুস্থান | : ঢাকা, বাংলাদেশ | Place of Death | : Dhaka, Bangladesh |
| মৃত্যুর কারণ | : হত্যা | Cause of Death (As Per ICD Version) | : Murder |

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Md Hasan
UP Administrative Officer
7No. Tabgi Union Parishad
Burhanuddin, Bhola.

7No. Tabgi Union Parishad, Burhanuddin, Bhola.

12-01-2025
Seal & Signature
Registrar
Md. Jasim Uddin Howlader
Chairman
7No. Tabgi Union Parishad
Burhanuddin, Bhola.

একটি গোটা পরিবারের গলার স্বর চিরতরে কাঁপিয়ে দিয়েছে। তাঁর বাবা, এখনও যিনি রিকশা চালান আজমপুর থেকে বনানী, ক্লান্ত পায়ে প্যাডেল মারেন, মনে মনে ভাবেন "আমার ছেলে ছিলো, এখন একটা ফাঁকা জায়গা আছে।" নয়ন রোজ রাতে বাবার পাশে বসে চা খেতো, এখন সেই জায়গায় কেবল নীরবতা বসে থাকে।

স্ত্রী আরজু বেগম, যাঁর গলায় এখন আর সিঁথির সিঁদুর নেই, রোজ সকালে মানুষের বাসায় কাজের খোঁজে বের হন। কিন্তু একা নারী, একা জীবন, একা লড়াই সব এক করে দেয় সমাজের দৃষ্টিহীনতা। যাঁরা সহানুভূতি দেখানোর কথা, তাঁরা আজকাল মিটিং ব্যস্ততায় ডুবে থাকেন। না কোনো দল, না কোনো সংগঠন, না কোনো নেতা এসে বলেনি, "আপনার কষ্ট বুঝি।" কেন? কারণ নয়নের মুখটি কোনো পোস্টারে ছিল না। কারণ নয়ন কোনও 'ফ্রন্টলাইনার' ছিল না। সে ছিল শুধু এক দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ না স্লোগান দিয়েছিল, না লাঠি ধরেছিল তবুও মরেছে। আর এই মৃত্যু বলে দেয়, কখনও কখনও দাঁড়িয়ে থাকাও অপরাধ হয়ে যায়।

বড় মেয়ে আয়েশা, এখনো শিশু, শুধু জানে আব্বু একদিন গেলো, আর ফিরে আসেনি। সে কবরস্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, "আব্বু, তুমি উঠো না কেন?" এই প্রশ্নের কোনো জবাব নেই, রাষ্ট্রও কোনো উত্তর দেয় না। ভাই হাসনাইন কাঁপা গলায় বলেন, "আমরা খুব কষ্টে আছি, শুধু খাই আর থাকি বাকি সব মরে গেছে।" একটি পরিবারের সমস্ত স্বপ্ন যেন জলাঞ্জলি গেছে রাষ্ট্রের নীরবতায়।

এই পরিবার রাষ্ট্রের কাছে করুণার ভিক্ষা চায় না তারা চায় ন্যায্যতা, তারা চায় বিচার, তারা চায় প্রাপ্য। প্রথমত, পরিবারটির জন্য নির্দিষ্ট মাসিক ভাতা চালু করা হোক, যাতে তাদের অন্তত ন্যূনতম জীবিকা নিশ্চিত থাকে।

দ্বিতীয়ত, আয়েশার শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করুক, কারণ সে শহীদের রক্তের উত্তরাধিকারী।

তৃতীয়ত, ভাই হাসনাইন ও পরিবারপ্রীতির অন্য সদস্যদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হোক যেন তারা ভিক্ষা না করে, কাজ করে বাঁচতে পারে।

সর্বশেষ, তাঁদের জন্য একটি স্থায়ী বাসস্থান নিশ্চিত করা হোক, কারণ কেবল দেয়ালের ছায়া থাকলেই ঘর হয় না তার জন্য লাগে নিরাপত্তা, সম্মান, ও ভবিষ্যতের আশ্বাস। নয়ন নিজে একটিও দাবি করেননি জীবদ্দশায়, কিন্তু তাঁর মৃত্যু রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করে গিয়েছে "তোমার চোখ কি কেবল তার দিকেই ফেরে, যার পেছনে পতাকা আছে?" যদি নয়নের মৃত্যুকে আমরা চুপ থেকে ভুলে যাই, তবে আমরা শুধু তাঁকেই নয়, নিজেদের মনুষ্যত্বকেও দাফন করি। এই পরিবারের পাশে দাঁড়ানো মানেই, নিজেদের বেঁচে থাকা মানবতাকে জাগিয়ে তোলা।

## এক নজরে শহীদ পরিচিতি

| | | |
|---|---|---|
| শহীদের পূর্ণনাম | : | মো: নয়ন |
| জন্ম তারিখ | : | ০৫-০৪-১৯৯৮ |
| পেশা বা পদবী | : | কারচুপির কাজ করতেন |
| পিতার নাম | : | মো: নুরুল ইসলাম |
| পিতার বয়স | : | ৬১ বছর |
| পিতার পেশা | : | রিকশা চালক |
| মাতার নাম | : | মমতাজ বেগম |
| মাতার বয়স | : | ৫৬ বছর |
| মাতার পেশা | : | গৃহিণী |
| পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা | : | ৫ জন (পিতা, মাতা, এক মেয়ে ও দুই ভাই ) |
| সন্তান | : | এক মেয়ে |
| স্ত্রী | : | আরজু বেগম |
| স্থায়ী ঠিকানা | : | গ্রাম: মুলাইপত্তন, ওয়ার্ড নং-০৯, ডাকঘর: মুন্সিরহাট<br>উপজেলা: বোরহানউদ্দিন, জেলা: ভোলা |
| বর্তমান ঠিকানা | : | কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা |
| ঘটনার স্থান | : | লালবাগ থানার পাশে দুররানি ব্রিজ, ঢাকা, বাংলাদেশ |
| আঘাতকারী | : | পুলিশ |
| মৃত্যুর কারণ | ; | "হত্যাকাণ্ড এবং "বন্দুকের গুলির আঘাতের কারণে" উল্লেখ করা হয়েছে। |
| আহত হওয়ার সময়কাল | : | ০৫ আগস্ট ২০২৪, রাত ১২ টা |
| মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান | : | ০৯ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৫:৩০ মিনিট; সুপারম্যাক্স হেলথকেয়ার লিমিটেড, ধানমন্ডি, ঢাকা |
| শহীদের কবরের অবস্থান | : | হাফিজিয়া ইব্রাহিম কলেজ মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থান, ভোলা |

# পানি দিতে গিয়ে শাহাদত বরণ করেছেন যে যোদ্ধা

**শহীদ নাজমুল কাজী**
ক্রমিক : ৭৭৪
আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ: ১১৫

**শহীদের জন্ম পরিচয়**

নাজমুল কাজী এই নাম এখন আর শুধু একটি পরিবারকে ডাকে না, এটি একটি আন্দোলনের ছায়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ে প্রত্যেক নির্যাতিত হৃদয়ে। তাঁর নাম উচ্চারণ করলেই যেন বাতাস ভারী হয়ে আসে, ঘর ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে, আর স্তব্ধতার মাঝে কারা যেন বলে ওঠে "সে তো মিছিল করত না, সে তো কিছুই করত না, শুধু এক ফোঁটা জল দিয়েছিল।" হ্যাঁ, ঠিক তাই নাজমুল কাজী কোনো রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন না, তিনি ছিলেন না ব্যানার ধরে দাঁড়ানো কণ্ঠস্বর। তিনি ছিলেন সেই সাদাসিধে ব্যবসায়ী, যিনি ভাবতেন, সংসারই পৃথিবীর কেন্দ্র, আর সত্য আর সহানুভূতি তাঁর ধর্ম।

তাঁর ছোট্ট পরিবার, স্ত্রী মারিয়া সুলতানা, আর কোলের শিশু আরিয়ানা কাজী নুজাইরাহ ছিল তাঁর জীবনের সমস্ত সৌরজগত। তিনি ছিলেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নিঃশব্দ স্বপ্নবান মানুষ। তাঁর পিতা, সেলিম কাজী, জীবনের পরিশ্রমী কৃষিজীবী, মা নাজমা বেগম একজন গৃহিণী। তিন ভাইয়ের মধ্যে একজন ডুবাইতে, আরেকজন সৌদি আরবে। আর্থিক দিক থেকে, পরিবারটি ভালোই ছিল শান্ত, নিরাপদ, আলহামদুলিল্লাহ বলা যায়।

কিন্তু ২০২৩-এর জুলাই আসছিল আগুন নিয়ে। রাজপথে ছাত্রদের বুক ফেটে কান্না বের হচ্ছিল, মায়েদের মুখে প্রার্থনার বদলে ক্রোধ জমছিল। নাজমুল দেখেছিলেন এই ভালো থাকা অনেকের কাছে এখন এক কল্পনার নাম। তিনি ছিলেন সাধারণ, কিন্তু 'সাধারণ' বলে যাঁরা সত্যকে পাশ কাটান, তিনি তাঁদের একজন ছিলেন না। সেই দিন, সেই বিপ্লবের বিকেলে, যখন চারপাশে গুলির শব্দ আর পুলিশি বুটের ধাক্কা, এক তরুণ তাঁর দোকানের পাশে এসে কাতর স্বরে বলেছিল "ভাইয়া, এক ফোঁটা পানি দেন।"

সেই এক ফোঁটা পানি, সেই এক মুহূর্তেই নাজমুল নিজেকে ভিন্ন এক জীবনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিলেন। পানির বোতল এগিয়ে দেওয়া সত্যি, কতটুকু সাহস লাগে? কিন্তু সেই মুহূর্তে, সেই রাজ্যে, সেটিই ছিল বিদ্রোহ। সেই পানি পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তাঁর বুকে ধরা পড়ে এক স্নাইপারের নিখুঁত নিশানা। কোল থেকে শিশুটি হারাল বাবাকে, স্ত্রী হারাল জীবনের ছায়া। আর আমরা পেলাম এক নীরব বিপ্লবী, যিনি কোনো স্লোগান না দিয়ে, নিজের মৃত্যু দিয়ে বলে গেলেন "মানবতা কখনো নিরপেক্ষ নয়।"

নাজমুল কাজীর মৃত্যু ছিল না কোনো দুর্ঘটনা, ছিল এক রাষ্ট্রীয় নৃশংসতার ফল। তাঁর দোষ ছিল? শুধু একজন তৃষ্ণার্তকে পানি দেওয়া। এই এক ফোঁটা পানির মধ্যেই লুকিয়ে ছিল রাজপথের সবচেয়ে দুর্বোধ্য সাহস। সেই পানি আরেকটি প্রাণ হয়তো বাঁচায়নি, কিন্তু এক জাতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এই শাসনব্যবস্থা কতোটা ভীত, কতোটা কুৎসিত, কতোটা অমানবিক।

আজ তাঁর নাম বলা মানে, চোখের কোনায় এক কণা জল আনা নয় বরং বুকের ভেতরে আগুন জ্বালানো। নাজমুল ছিলেন না নেতা, ছিলেন না বক্তা কিন্তু আজ, শহীদদের কাতারে দাঁড়িয়ে তিনি উচ্চারিত হন এই আন্দোলনের সবচেয়ে নির্মল কণ্ঠস্বর হিসেবে। তাঁর মৃত্যু আমাদের চোখে জল আনে, আবার সেই জলেই আগুন জ্বলে ওঠে। এটা আমাদের জুলাই বিপ্লব যেখানে নাজমুল কাজীর মতো মানুষদের মৃত্যু দিয়ে লেখা হয় মানুষের মুক্তির নতুন মানচিত্র।

**আন্দোলনের প্রেক্ষাপট**

২০২৪ সালের জুলাই, বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অদ্ভুত ঋতু, যেখানে বৃষ্টি হয়নি, হয়েছে রক্তপাত। বাতাসে লেগে ছিল আগুনের গন্ধ, আর মাটির নিচে জমে উঠছিল দীর্ঘদিনের অন্যায় আর অপমানের শিকড়। এই মাস, এই সময়, ছিল শুধু একটি কোটা সংস্কার আন্দোলনের চেতনায় সীমাবদ্ধ নয় এটি ছিল এক নীরব অভ্যুত্থান, এক গণজাগরণ, যেখানে হাজার হাজার ছাত্র, ছাত্রী, শ্রমজীবী, মা, ভাই, প্রতিবেশী সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিল সেই রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে, যা তাদের কণ্ঠরোধ করেছে বছরের পর বছর।

কোটা সংস্কার এই শব্দটি যেন একটি আলিবাবার গুপ্ত দরজা হয়ে খুলে দিয়েছিল দেশের সবচেয়ে গভীর ক্ষতগুলো। বঞ্চনা, বৈষম্য, বিচারহীনতা এসব শব্দ এতদিন কাগজে ছিল, গবেষণায় ছিল, চায়ের কাপে ছিল। কিন্তু জুলাইয়ের সূর্য তাদের রূপ দিল রাজপথে, রক্তে, এবং মানুষের চিৎকারে। ঢাকা থেকে দিনাজপুর, খুলনা থেকে কক্সবাজার সবখানে একি সুর: "আর না।" এই সুর ছিল না কোনো দলের, ছিল জনতার; এই মিছিল ছিল না কোনো একক দাবি পূরণের, ছিল একটি জাতিকে মানুষে পরিণত করার জন্য।

ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালের সামনের সেই প্রান্তটি তখন যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র। ক্লান্ত, রক্তাক্ত ছাত্রদের শরীরে তখন চিকিৎসার চেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল একটু জলের। কেউ কাউকে চিনত না, সবাই শুধু একে অপরের চোখে নিজেদের প্রতিবিম্ব খুঁজছিল। এবং ঠিক তখনই, সেই মুহূর্তে, এক অচেনা মানুষ নাজমুল কাজী পৌঁছে যান সেই জায়গায়। তাঁর হাতে ছিল একটি পানির বোতল, মনেপ্রাণে একটি সহজ বিশ্বাস: "এই তৃষ্ণার জবাব পানি ছাড়া হয় না।"

কিন্তু রাষ্ট্র যখন পশুর মতো আচরণ করে, তখন সহানুভূতিও হয়ে ওঠে অপরাধ। সেই এক ফোঁটা পানি নাজমুলের জীবনের শেষ কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁকে চিনত না কেউ, তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়

ছিল না, কিন্তু তিনি ছিলেন মানুষের পক্ষে, সত্যের পক্ষে। স্বৈরতন্ত্রের চোখে সেটিই ছিল সবচেয়ে বড় অপরাধ। স্নাইপারের ঠান্ডা নিশানায় বিদ্ধ হয়ে, তিনি সেই দিন, সেই জায়গাতেই ঢলে পড়েন। তাঁর পাশে কেউ ছিল না, শুধু একটা ফাঁকা বোতল আর একটি স্পষ্ট বার্তা: "মানবতা আজও জীবিত ছিল, যতক্ষণ না আপনারা গুলি করলেন।"

এই ঘটনা ছিল না শুধু একটি মৃত্যুর বর্ণনা এটি ছিল একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার মুখোশ খুলে ফেলার মুহূর্ত। যে সরকার একজন সাধারণ মানুষকে শুধু পানি দেওয়ার জন্য হত্যা করতে পারে, তার অধীনে কেউ নিরাপদ নয়। আর এখানেই আন্দোলনের প্রকৃত রূপ, এটি ছিল শুধু কোটা নিয়ে নয়, ছিল অস্তিত্ব নিয়ে, ছিল আত্মমর্যাদার পুনরুদ্ধার নিয়ে।

নাজমুল কাজী সেই আন্দোলনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন একজন অ-রাজনৈতিক মানুষ, যিনি হয়ে গেলেন গণতন্ত্রের শহীদ। তাঁর মৃত্যু আমাদের চোখে পানি আনে, ঠিক, কিন্তু সেই পানির ভেতরেই এখন ক্রোধের আগুন লুকিয়ে আছে।

### শহীদ হওয়ার কাহিনি

১৮ জুলাই, ২০২৪। বিকেলটা ছিল অস্বাভাবিক গুমোট, আকাশে ছিল না মেঘ, কিন্তু বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল প্রতিরোধের আগুনে। সোনিয়াখাড়া কাজলার সেই রাজপথ এখন আর কোনো রাস্তা নয় এটা ছিল এক অনাড়ম্বর যুদ্ধক্ষেত্র। হেলমেটধারী বাহিনী দাঁড়িয়ে ছিল সারি বেঁধে, পেছনে লুকানো ঘৃণার ট্রিগার। সামনে ছিল ছাত্ররা কারো হাতে প্ল্যাকার্ড, কারো হাতে ব্যান্ডেজ। কারো চোখে গ্যাস, কারো মুখে কফ। বিক্ষোভ আর বুলেটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল একটা অদৃশ্য প্রশ্ন এই দেশ কার?

এই রক্তাক্ত মঞ্চে নাজমুল কাজী ছিলেন একমাত্র চরিত্র, যিনি অস্ত্র নিয়ে আসেননি, শ্লোগানও নয়। তিনি এসেছিলেন হাতে ঠান্ডা পানি নিয়ে তৃষ্ণার বিরুদ্ধে, নিঃশ্বাস নিতে চাওয়া কিছু মুখের পক্ষে। তাঁর চোখে ছিল না কোন রাজনৈতিক রঙ, কাঁধে ছিল না কোনো ব্যানার। শুধু মানবতা নামের এক প্রাচীন ধর্মের অনুসারী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আহতদের পাশে।

কিন্তু তেমন মানবতা, এই রাষ্ট্রে ভয়ংকর অপরাধ। তাই তাঁকে ডাকা হয়নি তবু তিনি গিয়েছিলেন। কেউ বাধ্য করেনি তবু তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। আর ঠিক সেখানেই, তাঁর পবিত্র মাথায় নামে সেই ঘূর্ণির মতো এক আঘাত বলা হয়, লাঠি নয়, ছিল ধাতব কিছু, ভারী, নির্মম। তাঁর মাথা ফেটে যায়, রক্ত ছিটকে পড়ে সেই মাটিতে, যেখানে কিছুক্ষণ আগেও তিনি পানি দিচ্ছিলেন। কেউ তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি কারণ সহানুভূতি আজকাল কাউকে শক্তি দেয় না, বরং নিঃস্ব করে।

তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাকে দ্রুত নেওয়া হয় হাসপাতালে যেখানে তাঁকে একটি বেডও দেওয়া হয়নি। ফাইল হারিয়ে যায়, নাম খুঁজে পাওয়া যায় না, আবার পাওয়া যায় কিন্তু ততক্ষণে রক্তক্ষরণে থেমে গেছে একটি হৃদয়ের স্পন্দন। মৃত ঘোষণা করে লেখা হয়: "নাজমুল কাজী, নিহত" এই দুই শব্দে শেষ হয়ে যায় একটি বিশাল দর্শনের জীবন।

তাঁর মৃত্যুর বিচার হয়নি, আর হবেও না, কারণ এই মৃত্যু কোনো আইনের আওতায় পড়ে না। এটি সেই ধরনের মৃত্যু, যা ঘটতে দেওয়া হয়; যাতে করে অন্যরাও বোঝে "তুমি পানি দাও, আমরা তোমাকে রক্তে ভাসিয়ে দেব।" এমন মৃত্যুতে কোনো ধ্বংস নেই, শুধু এক অন্তঃসারশূন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার নগ্ন প্রদর্শনী আছে।

এই মৃত্যু শুধুই এক ব্যক্তির নয়। এটি একটি আদর্শের, একটি সংস্কৃতির, একটি ভাষার মৃত্যু যেখানে ভালো মানুষরা ভয় পায়, নিরপরাধেরা লক্ষ্যমাত্রা হয়, আর মানবতা নিজেই হয়ে পড়ে অপরাধ। নাজমুলের নিঃশব্দ জলদানের অভিপ্রায় আজ আমাদের চিৎকারে রূপ নিচ্ছে। আমরা বলি না "তিনি একজন বীর।" আমরা বলি "তিনি ছিলেন মানুষ, আর সেটাই তাঁর অপরাধ।"

এই মৃত্যু আমাদের গলায় একটা স্থায়ী ক্ষতের মতো থেকে যাবে। প্রতি বার আমরা পানি দেবো, মনে পড়বে একবার এক নাজমুল ছিল, যিনি তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে নিজেই চিরতরে নিঃশেষ হয়ে গেলেন।

### শহীদের পরিবার ও তাদের বেদনা

নাজমুল কাজীর মৃত্যু শুধু একটি মানুষের হারিয়ে যাওয়া নয়, এটি ছিল একটি আশ্রয়ের বিলুপ্তি। তাঁর মৃত্যু যেন এক শূন্যতার কুপ, যা প্রতিদিন গিলে নিচ্ছে একেকটি মানুষের ভেতরের আলো। এখন

তাঁর স্ত্রী মারিয়া সুলতানা একটি নাম, একটি অস্তিত্ব নীরব এক সৈনিকের মতো বেঁচে আছেন, কিন্তু যেন কেবলই একটি ছায়া। নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ, অথচ অসম্ভব দৃঢ়। বুকের গভীরে যন্ত্রণার ঢেউ, কিন্তু চোখে জল নেই কারণ ছোট্ট মেয়েটি আরিয়ানা এখনো বোঝে না তার কান্না। "আব্বু" শব্দটা সে এখনো সঠিকভাবে বলতে শেখেনি, তবু তার মনে গেঁথে গেছে এক অপূর্ণতা এই নামে আর কেউ দরজায় আসে না, তাকে কোলে তোলে না, কিংবা রাতে ঘুম পাড়াতে চুমু খায় না।

মারিয়া বলেন, "সে কখনও রাজনীতি করেনি। বাড়ি আর বাজার ছিল ওর রাজনীতি, বাচ্চার দুধ আর মা-বাবার ওষুধ ছিল ওর সংগ্রাম।" আর এখন? এখন তাঁর সংগ্রাম প্রতিটি সকালে উঠে বাঁচা, প্রতিটি রাতে কাঁদতে গিয়েও সংযত থাকা কারণ ঘরে যে আরেকটি প্রাণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, বুঝে না কিছু, তবুও সব অনুভব করে।

পিতা সেলিম কাজী মাটির মানুষ, চাষাবাদের মানুষ এই বৃদ্ধ কণ্ঠে এখন প্রতিধ্বনি হয় কেবল একটি বাক্য, "ও তো শুধু পানি দিতেছিলো!" এই বাক্যটি ঘুরে বেড়ায় পুরো গ্রামে, বয়ে আনে স্তব্ধতা। যেখানেই যান, কেউ না কেউ বলে ওঠে, "নাজমুল ভাই? আহা, কী শান্ত মানুষ ছিলেন!" এক নিঃশব্দ কষ্টে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে চারপাশ। প্রতিবেশীরা জানায়, নাজমুল ছিল একজন পরিশ্রমী, ভদ্র, হাসিমাখা মানুষ যার হাতে সবসময় কাজ থাকতো, আর চোখে থাকতো পরিবারের স্বপ্ন। তিনি কোনোদিন উচ্চবাচ্য করেননি, রাজনীতি তো দূরের কথা।

তবুও, এই নিরীহ মানুষটি শহীদ হলেন। শুধু একজন আহত ছাত্রকে পানি দিতে গিয়েছিলেন এইটুকু সহানুভূতি দিয়েই রাষ্ট্রের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন এক 'হুমকি'। এই পরিবার আজ সাহায্যপ্রার্থী নয়; তারা কেউ এসে চাল বা টাকা চায় না। তারা শুধু একটি প্রশ্ন রাখে রাষ্ট্রের মুখোমুখি:

এই দেশ কি এমন জায়গা হয়ে গেছে, যেখানে সহানুভূতি রাষ্ট্রদ্রোহ হয়ে যায়? যেখানে বোতলভরা পানি বিপ্লবী অস্ত্র, আর ভালো মানুষরাই প্রথমে নিহত হয়?

এই পরিবার প্রতিদিন বাঁচে, কিন্তু মৃত্যু ছুঁয়ে থাকে তাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে। একটি শিশুর জীবনে প্রথম শোক হয়ে নাম লেখানো পিতা, একটি স্ত্রীর জীবনে অসমাপ্ত জীবনের গাথা হয়ে থাকা স্বামী, আর এক পিতার চোখে বেঁচে থাকা সেই মুহূর্ত যেখানে গর্জে ওঠে এক রাষ্ট্রের নিষ্ঠুরতা।

**শহীদের উত্তরাধিকার ও প্রস্তাবনা**

নাজমুলের মৃত্যু একটি রাষ্ট্রের নৈতিক দেউলিয়াপনার দলিল, কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া পরিবার আজ সেই দায়ের প্রকৃত সাক্ষী। একজন কন্যাশিশু আরিয়ানা কাজী যার এখনো উচ্চারণই সম্পূর্ণ হয়নি, অথচ জীবনের প্রথম পাঠেই শিখেছে "পিতা" শব্দ মানে শুধু এক মুখ নয়, এক অভাবও। এই শিশুর শৈশব এখনো জেগে আছে সেই

প্রশ্নের ভেতর, "আব্বু কোথায়?" কিন্তু তার জন্য রাষ্ট্রের কোনো পাঠ্যবই নেই, নেই কোনো আশ্বাস।

আরিয়ানার শিক্ষা, পুষ্টি ও ভবিষ্যৎ এটি কেবল একটি দয়ার বিষয় নয়, এটি একটি জাতির সম্মান রক্ষার প্রশ্ন। এই দেশ যদি শহীদদের স্মরণ করে মিছিলে, পতাকায়, ব্যানারে, তবে শহীদদের সন্তানদেরও স্মরণ রাখতে হবে নীতিতে, ন্যায্যতায়, বাস্তবে। তাঁর জন্য একটি মাসিক সহায়তা চালু করা আবশ্যক না দানে নয়, ঋণে নয়, বরং প্রাপ্য হিসেবে। কারণ সে একজন শহীদের উত্তরাধিকারী, আর তার ওপর এই দেশ ও সমাজের একটি ঋণ বর্তায় যা এখনো শোধ হয়নি।

অন্যদিকে, মারিয়া সুলতানা এই নামটি এখন কেবল একজন বিধবার নয়, একজন প্রতিরোধকারীর প্রতীক। তিনি কান্না নয়, কাজ চেয়েছেন। যদি তাঁকে একটি সেলাই মেশিন দেওয়া হয়, তবে তিনি ভিক্ষার অপেক্ষা করবেন না, বরং সেলাইয়ের সুতো দিয়ে বুনবেন নতুন জীবনের গল্প। তাঁর আত্মসম্মান রক্ষা করা কেবল মানবিকতা নয়, এটি আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, ও নৈতিক দায়িত্ব।

এই পরিবার যেন নিঃশব্দ কান্নার গল্প না হয়, বরং সহানুভূতির উত্তরাধিকার হয় তারা যেন শুধু "শহীদের পরিবার" হয়ে না থাকে, বরং হয়ে ওঠে সাহসের প্রতীক, মানবতার এক জীবন্ত দলিল। আমরা যদি চাই, যে আগামী প্রজন্ম শহীদদের সম্মান করে, তবে তাদের উত্তরাধিকারীদেরও আমাদের ভালোবাসা, নিরাপত্তা, ও সম্মান দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে।

নাজমুল কাজী ছিলেন এক নিরীহ পুরুষ, হাতে বোতল, মনে সাহস। এখন তাঁর উত্তরাধিকার এক কন্যা, এক স্ত্রী, আর একটি জাতির দায়। আমরা যদি আজ নীরব থাকি, তবে আগামীকাল আরিয়ানারা কাকে বিশ্বাস করবে? কার ইতিহাস পড়বে?

এই প্রস্তাবনা কেবল একটি পরিবারকে রক্ষা করার আহ্বান নয়। এটি একটি জাতিকে প্রশ্ন করছে তোমরা কাদের স্মরণ করো, আর কাদের ভুলে যাও?

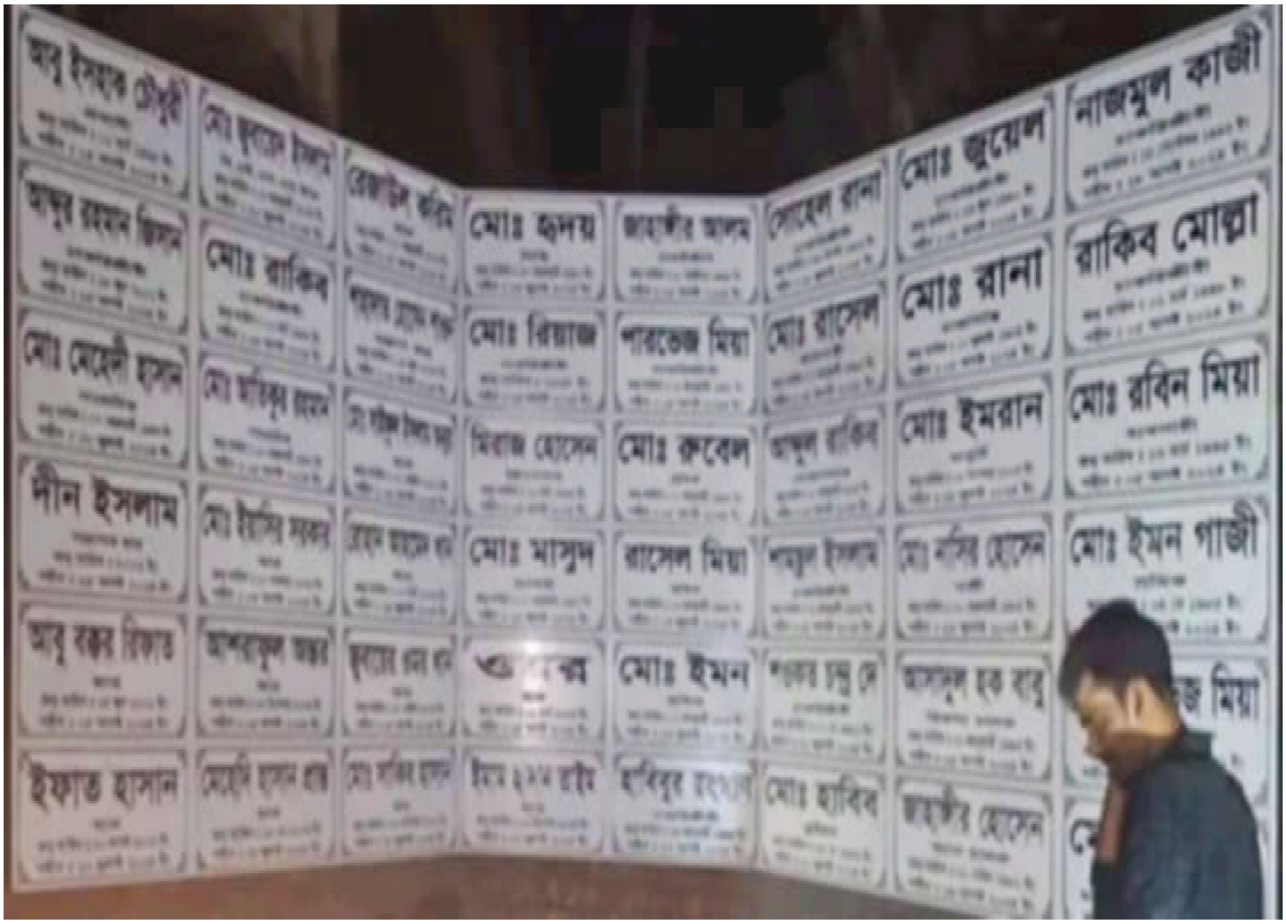


## এক নজরে শহীদ পরিচিতি

| | | |
|---|---|---|
| নাম | : | নাজমুল কাজী |
| পেশা | : | ব্যবসায়ী |
| স্ত্রী | : | মারিয়া সুলতানা |
| সন্তান | : | আরিয়ানা কাজী নুজাইরাহ |
| পিতা | : | সেলিম কাজী (কৃষক) |
| মাতা | : | নাজমা বেগম |
| বর্তমান ঠিকানা | : | মোহাম্মদ বাগ চৌরাস্তা, কদমতলি, ঢাকা |
| স্থায়ী ঠিকানা | : | দৌলতপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা |
| শহীদ হওয়ার স্থান | : | সোনিয়াখাড়া, কাজলা |
| তারিখ ও সময় | : | ১৮ জুলাই, ২০২৪ |
| শহীদ হওয়ার প্রেক্ষাপট | : | পানি খাওয়াতে গিয়ে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে |
| দাফন | : | নিজ গ্রামে, দৌলতপুর, কুমিল্লা |

## শহীদ মো: সাইফুল ইসলাম শান্ত

ক্রমিক : ৭৭৫

আইডি : ঢাকা সিটি: ১৩৪

### শহীদ পরিচিতি

মো. সাইফুল ইসলাম শান্ত ছিলেন এক স্বপ্নবাজ তরুণ, একজন সমাজ সচেতন নাগরিক, একজন স্নেহপরায়ণ পিতা, একজন দায়িত্ববান স্বামী, এবং একজন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। যিনি জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে সাদামাটা, সততার পথ বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৯৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর, ঢাকার মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন এই সাহসী তরুণ। জন্ম থেকেই শান্তর স্বভাব ছিল শান্ত, ভদ্র ও পরোপকারী। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড-১ এর বুড়িরমোড়, মিরহাজিরবাগে হোল্ডিং-১১৩/ক-তে ছিল তাঁর স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা।

কর্মজীবনে তিনি ছিলেন একজন চাকরিজীবী এবং পাশাপাশি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। গাজীপুরের "মানহা নিটিং ফ্যাক্টরি"তে কর্মরত ছিলেন তিনি। শান্তর পিতা আব্দুল মতিন একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী এবং মা নিলুফা আক্তার একজন আদর্শ গৃহিণী। তাঁদের পরিবারে ভালোবাসা, সততা ও দায়িত্ববোধ ছিল প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত মূল্যবোধ। শান্ত নিজেও এ পরিবারের আদর্শের ধারক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ফাল্গুনী ইয়াসমিন ঝুমা বিবিএ করছেন এবং বর্তমানে সংসার ও সদ্যজাত সন্তানের লালন-পালনে নিযুক্ত।

### জীবনদর্শন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

সাইফুল ইসলাম শান্ত ছিলেন সমাজের অসহায় ও প্রান্তিক মানুষের জন্য এক নিরব ভরসা। নিজেকে কখনো প্রচারের আলোয় আনেননি, বরং মানুষের দুঃখ-কষ্ট ভাগ করে নিতেন নিভৃতে। তার বন্ধুরা বলতেন, "শান্তর হৃদয় ছিল দরজা খোলা এক ঘর, যেখানে যে কেউ আশ্রয় নিতে পারতো।" বন্ধুদের সাথে তিনি ছিলেন প্রাণখোলা, পরিবারের প্রতি ছিলেন নিবেদিত, এবং দেশের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল অটুট, আপোষহীন।

### ২০২৪ সালের গণবিপ্লব ও শান্তর স্বপ্ন

২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায় রচিত হয়। দীর্ঘকাল ধরে চলা দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে শুরু হয় গণআন্দোলন। মানুষের অন্তরে জ্বলে ওঠে প্রতিরোধের আগুন। জনতার দাবিতে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশত্যাগে বাধ্য হন। এই গণজাগরণ ছিল শান্তর স্বপ্ন দেখা বাংলাদেশের প্রথম দীপ্ত পদক্ষেপ। তিনি বিশ্বাস করতেন এ দেশ হবে একদিন ন্যায়ভিত্তিক, শোষণমুক্ত, গণতান্ত্রিক। তার চোখে ছিল নতুন সূর্য ওঠার আশা, বুকভরা ছিল সাহস।

### ভুল বোঝাবুঝির নির্মম পরিণতি

৫ আগস্ট ২০২৪, সময় বিকাল ৪:৩০ মিনিট। শান্ত একটি ফোন কল পেয়ে বাসা থেকে বের হন। তখন কেউ জানতো না, এটাই হবে তাঁর জীবনের শেষ প্রস্থান। কিছুক্ষণ পর পরিবারের কাছে আসে বিভীষিকাময় খবর  শান্ত যাত্রাবাড়ি এলাকায় গণপিটুনির শিকার হয়েছেন। বড় ভাই ও একমাত্র বোনের জামাই দ্রুত ছুটে যান। তাঁরা জানতে পারেন, শান্তকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ঢামেকে গিয়ে কর্তব্যরতরা জানান  'সাইফুল ইসলাম শান্ত' নামে কেউ ভর্তি হননি। পরে নির্দেশনা দেওয়া হয় লাশের সারিতে খোঁজ নিতে। সেখানে পরিবারের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক নির্মম দৃশ্য  রক্তাক্ত, বিকৃত, নিথর শান্ত। যে মানুষটি জীবন ভরে হাসতেন, সে মানুষটি আজ চিরনির্বাক। জানা যায়, উত্তেজিত কিছু আন্দোলনরত ছাত্র ভুলবশত শান্তকে শাসকপন্থী ভেবে পিটিয়ে হত্যা করে।

### কাছের মানুষের স্মৃতিচারণা

**শান্তর শৈশবের বন্ধু ফাহিম বলেন:**

"শান্ত ছিল এমন একজন মানুষ, যার মতো হৃদয় খুব কম মানুষ পায়। সে কাউকে সাহায্য করতে কখনো না বলেনি। ওর চোখে সবাই ছিল পরিবার। শান্তর মৃত্যু শুধু একজন মানুষের নয়, একটি আদর্শের মৃত্যু।"

### পরিবারের বর্তমান অবস্থা

শান্তর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী ফাল্গুনী ইয়াসমিন ঝুমা এখন শ্বশুরবাড়িতে এক বছরের সন্তান মোহাম্মদ জাওয়াদকে নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card

নাম
সাইফুল ইসলাম শান্ত
Name
SAIFUL ISLAM SHANTO
পিতা
মোঃ আব্দুল মতিন
মাতা
নিলুফা আক্তার
Date of Birth 03 Sep 1998
NID No. 825 519 2265

দমানো যায়নি। তিনি এখন আর নেই, কিন্তু তাঁর রক্তে লেখা গল্প থাকবে এই মাটির প্রতিটি কণায়, প্রতিটি প্রতিবাদে, প্রতিটি নতুন সূর্যোদয়ে।

শহীদ শান্ত, তোমার রক্ত বৃথা যাবে না। তুমি আছো, থাকবে এ দেশের প্রতিটি ন্যায়প্রেমী হৃদয়ে।

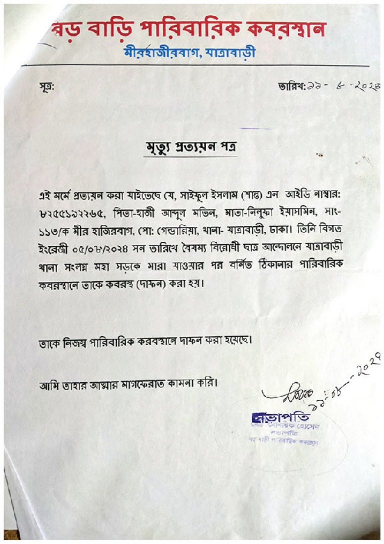

বড় বাড়ি পারিবারিক কবরস্থান
মীরহাজীরবাগ, যাত্রাবাড়ী

সূত্র: তারিখ: ২১-৮-২০২৪

মৃত্যু প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, সাইফুল ইসলাম (শান্ত) এন আইডি নাম্বার: ৮২৫৫১৯২২৬৫, পিতা-হাজী আব্দুল মতিন, মাতা-নিলুফা ইয়াসমিন, সাং- ১১৩/ক মীর হাজিরবাগ, পো: গেন্ডারিয়া, থানা- যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। তিনি বিগত ইংরেজী ০৫/০৮/২০২৪ সন তারিখে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যাত্রাবাড়ী থানা সংলগ্ন মহা সড়কে মারা যাওয়ার পর বর্নিত ঠিকানার পারিবারিক কবরস্থানে তাকে কবরস্থ (দাফন) করা হয়।

তাকে নিজস্ব পারিবারিক করবস্থানে দাফন করা হয়েছে।

আমি তাহার আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

সভাপতি

বসবাস করছেন। শান্ত রেখে গেছেন পারিবারিক সম্পদ, নিজস্ব বাড়ি এবং ব্যবসা থেকে সামান্য কিছু আয়। তবে অর্থই সব নয়। শান্তর অভাব পূরণ করা যায় না কোনো সম্পদ দিয়ে তার জায়গায় নেই সেই ভালোবাসা, সাহস ও নৈতিক দৃঢ়তা।

### রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি আহ্বান

শহীদ মো. সাইফুল ইসলাম শান্তের আত্মত্যাগ যেন বিস্মৃত না হয়। তাঁর স্মৃতিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

### চিরশ্রদ্ধাঞ্জলি

সাইফুল ইসলাম শান্ত ছিলেন সেই যোদ্ধা, যিনি যুদ্ধ করতেন শব্দহীনভাবে। তাকে কেনা যায়নি, তাকে ভাঙা যায়নি, তাকে

**প্রস্তাবনা:**

১. শান্তর পরিবারকে রাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রদান করা হোক।

২. স্ত্রীকে উচ্চশিক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হোক।

৩. সন্তানের জন্য নিরাপদ ভবিষ্যৎ ও শিক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া হোক।

৪. শান্তর নামে একটি রাস্তা, স্কুল বা স্মৃতিফলক স্থাপন করে তাঁকে স্মরণীয় করা হোক।

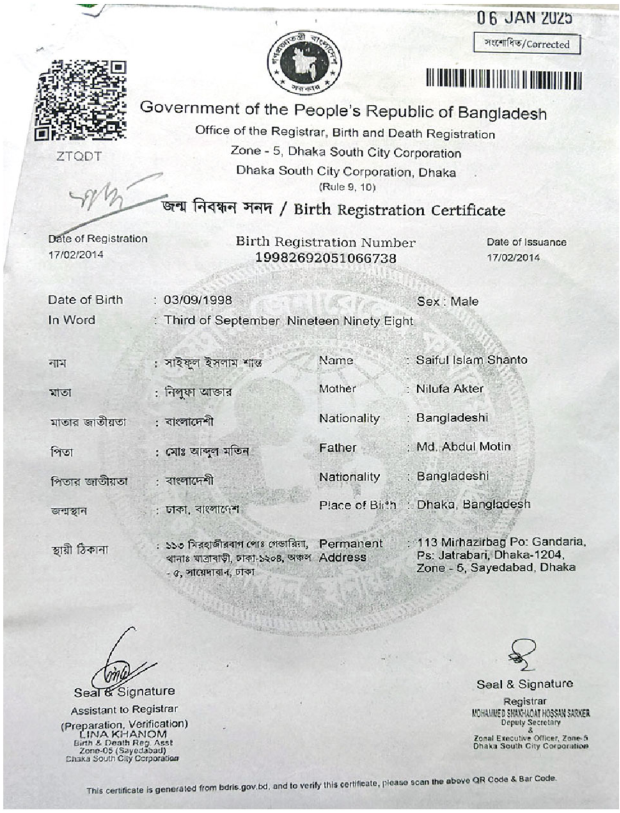

06 JAN 2025
সংশোধিত/Corrected

ZTQDT

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Zone - 5, Dhaka South City Corporation
Dhaka South City Corporation, Dhaka
(Rule 9, 10)

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

| Date of Registration | Birth Registration Number | Date of Issuance |
|---|---|---|
| 17/02/2014 | 19982692051066738 | 17/02/2014 |

Date of Birth : 03/09/1998 Sex : Male
In Word : Third of September Nineteen Ninety Eight

| | | | |
|---|---|---|---|
| নাম | : সাইফুল ইসলাম শান্ত | Name | : Saiful Islam Shanto |
| মাতা | : নিলুফা আক্তার | Mother | : Nilufa Akter |
| মাতার জাতীয়তা | : বাংলাদেশী | Nationality | : Bangladeshi |
| পিতা | : মোঃ আব্দুল মতিন | Father | : Md. Abdul Motin |
| পিতার জাতীয়তা | : বাংলাদেশী | Nationality | : Bangladeshi |
| জন্মস্থান | : ঢাকা, বাংলাদেশ | Place of Birth | : Dhaka, Bangladesh |
| স্থায়ী ঠিকানা | : ১১৩ মিরহাজীরবাগ পোঃ গেন্ডারিয়া, থানাঃ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪, অঞ্চল - ৫, সায়েদাবাদ, ঢাকা | Permanent Address | : 113 Mirhazirbag Po: Gandaria, Ps: Jatrabari, Dhaka-1204, Zone - 5, Sayedabad, Dhaka |

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
LINA KHANOM
Birth & Death Reg. Asst
Zone-05 (Sayedabad)
Dhaka South City Corporation

Seal & Signature
Registrar
MOHAMMED SHAKHAOAT HOSSAIN SARKER
Deputy Secretary
&
Zonal Executive Officer, Zone-5
Dhaka South City Corporation

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

## এক নজরে শহীদ পরিচিতি

| | | |
|---|---|---|
| শহীদের পূর্ণ নাম | : | মো: সাইফুল ইসলাম শান্ত |
| জন্ম তারিখ | : | ০৩-০৯-১৯৯৮ |
| জন্মস্থান | : | ঢাকা |
| পেশা | : | চাকুরীজীবি ও ব্যবসায়ী |
| কর্মরত প্রতিষ্ঠানের নাম | : | মানহা নিটিং ফ্যাক্টরি, গাজীপুর |
| স্থায়ী ঠিকানা | : | হোল্ডিং-১১৩/ক, বুড়িরমোড়, মিরহাজিরবাগ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি, ওয়ার্ড -১, ঢাকা |
| বর্তমান ঠিকানা | : | হোল্ডিং-১১৩/ক, বুড়িরমোড়, মিরহাজিরবাগ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি, ওয়ার্ড -১, ঢাকা |
| বিশেষ কৃতিত্ব | : | সক্রিয় সমাজকর্মী, সদা হাসোজ্জ্বল |
| পিতার নাম | : | মো: আব্দুল মতিন, পেশা ও বয়স: ব্যবসায়ী, ৬০ |
| মায়ের নাম | : | নিলুফা আক্তার, পেশা ও বয়স: গৃহিনি, ৪৮ |
| মাসিক আয় | : | ৩০,০০০, আয়ের উৎস: চাকরি ও ব্যবসা |
| স্ত্রী | : | ফাল্গুনী ইয়াসমিন ঝুমা, বয়স: ২৪, শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (চলমান), পেশা: গৃহিনি |
| | | পরিবারের সদস্য: মোহাম্মআদ জাওয়াদ (১), ছেলে |
| ঘটনার স্থান | : | যাত্রাবাড়ি |
| আক্রমণকারী | : | ভুল বুঝে আন্দোলনরত ছাত্রদের গণপিটুনি |
| আহত হওয়ার তারিখ | : | ৫/৮/২৪, সময়: বিকাল ৫টা |
| মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান | : | ৫/৮/২৪, বিকাল ৫:৩০টা (আনুমানিক) |
| শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান | : | পারিবারিক কবরস্থান (মীরহাজিরবাগ বড়বাড়ি কবরস্থান) |

# রক্তে রাঙানো কিশোর, শহীদ মো: রেজাউল করিমের গল্প একটি সাহস, একটি প্রতিবাদ একটি অগ্নিস্নান

**শহীদ মো: রেজাউল করিম**

ক্রমিক : ৭৭৬

আইডি : ঢাকা সিটি: ১৩৫

### শহীদের পরিচয়

ঢাকার পুরনো এক অলিগলির একপাশে ছোট্ট একটি বাড়ি। নম্বর ৩৯, মীরহাজিরবাগ, যাত্রাবাড়ী। এখানেই বেড়ে উঠেছিল এক স্বপ্নবাজ কিশোর, নাম মোঃ রেজাউল করিম। বাবা মোঃ আল-আমিন মীর পেশায় একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, আর মা রাশিদা বেগম একজন গৃহিণী। আয় সামান্য, মাসে মাত্র বিশ হাজার টাকা, কিন্তু পরিবারের স্বপ্ন ছিল বিশ কোটি টাকার চেয়েও দামি। তিন সন্তান নিয়ে চলা এই পরিবারের আশা ছিল রেজাউল, তাদের একমাত্র পুত্র, যিনি একদিন আলোর পথ দেখাবেন।

২০০৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি, ঢাকার মাটিতে জন্ম নেওয়া এই কিশোরের জীবন যেন ছিল কুরআনের আয়াতে লেখা পবিত্র, স্পষ্ট, দৃঢ়। মীরহাজিরবাগ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র রেজাউল হাফেজি শিক্ষায়ও পিছিয়ে ছিল না। সাত পারা মুখস্থ করে সে যেন তার ধর্মীয় শিক্ষা এবং পার্থিব শিক্ষার মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে নিচ্ছিল।

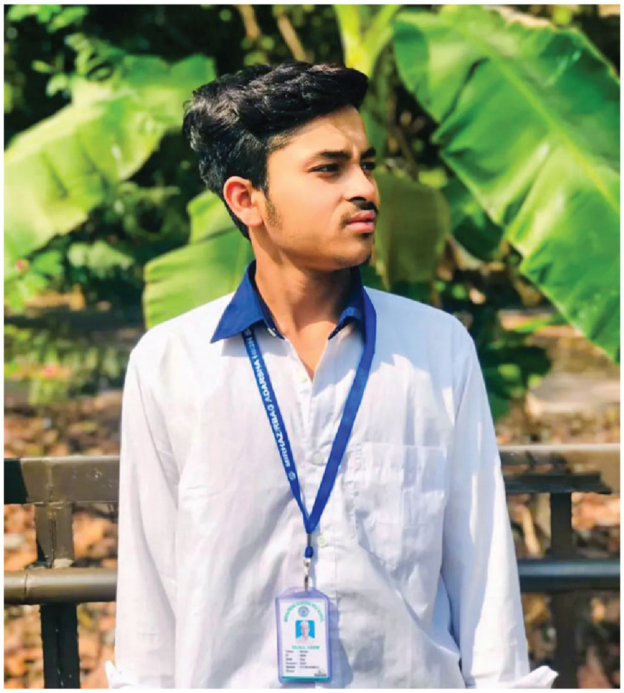

ঘরে তার দুই বোন ফাতেমাতুজ জোহরা, বদরুন্নেছা কলেজের দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ুয়া এবং ছোট বোন তানজিলা আক্তার, চতুর্থ শ্রেণি। এই ছোট্ট পরিবার, কঠিন আর্থিক বাস্তবতা, কিন্তু রেজাউলের মনে ছিল বিস্তৃত স্বপ্নের নীড়।

**বিপ্লবের পূর্বাভাস : ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটভূমি**

২০২৪ সালের মাঝামাঝি থেকে সারাদেশজুড়ে এক অশান্ত হাওয়া বইতে শুরু করে। স্বৈরাচারী সরকারের নিপীড়ন, বিচারহীনতা, বাকস্বাধীনতার দমন, শিক্ষা ও জীবিকার সংকটে সাধারণ মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ে। রাস্তায় নামে ছাত্র-জনতা, শ্রমিক, দিনমজুর। ঢাকার রাজপথে, বিশেষ করে যাত্রাবাড়ী, গাজীপুর, শ্যামলী ও মতিঝিলের মতো এলাকাগুলো যেন পরিণত হয় ছোট ছোট বারুদের স্তূপে যেকোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রায় প্রতিদিনই বন্ধ। রাষ্ট্র ভয়ে কাঁপে, আর কিশোরেরা সাহস জোগায়। রেজাউলও এই সময়ের সন্তান। স্কুল বন্ধ থাকলে কখনো বাবার সঙ্গে কাজে যেত, কখনো মায়ের কাজে হাত লাগাত। কিন্তু এই কিশোরের চোখে ছিল একটি বড় স্বপ্ন একটি অন্যায়হীন বাংলাদেশ। মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে গোপনে আন্দোলনে যোগ দিত। চোখে ছিল দৃঢ়তা, হৃদয়ে ছিল আদর্শ।

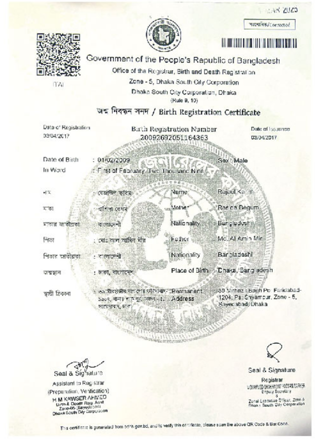

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Zone - 5, Dhaka South City Corporation
Dhaka South City Corporation, Dhaka
(Rule 9, 10)
জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Date of Registration 03/04/2017
Birth Registration Number 20092692051164363
Date of Issuance 03/04/2017

Date of Birth : 01/02/2009 Sex : Male
In Word : First of February Two Thousand Nine

Name : Rajaul Karim
Mother : Rasida Begum
Nationality : Bangladeshi
Father : Md. Al Amin Mir
Nationality : Bangladeshi
Place of Birth : Dhaka, Bangladesh

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
H M KAWSER AHMED

Seal & Signature
Registrar

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

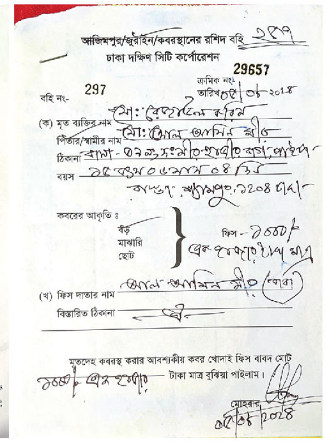

আজিমপুর/জুরাইন/কবরস্থানের রশিদ বহি
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
29657
ক্রমিক নং
বহি নং- 297
তারিখ
(ক) মৃত ব্যক্তির নাম
পিতার/স্বামীর নাম
ঠিকানা
বয়স
কবরের আকৃতি ঃ বড় মাঝারি ছোট
ফিস
(খ) ফিস দাতার নাম
বিস্তারিত ঠিকানা
মৃতদেহ কবরস্থ করার আবশ্যকীয় কবর খোদাই ফিস বাবদ মোট টাকা মাত্র বুঝিয়া পাইলাম।
মোহরার

**যে দিন ইতিহাসে লিখা হলো এক কিশোরের নাম**

০৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ২:৩০। রেজাউল মাকে বলে বেরিয়ে যায় "বন্ধুদের সঙ্গে একটু দেখা করে আসি।" হয়তো সে বুঝেছিল, তার পথ আজ একটু ভিন্ন। ঢাকার কুতুবখালী টোল প্লাজা তখন উত্তপ্ত। বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ বারবার টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট আর সরাসরি গুলি চালাচ্ছিল।

সন্ধ্যা ৭:৩০ হঠাৎ এক অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে রেজাউলের বাড়িতে। আতঙ্কিত মা রাশিদা বেগম ফোন ধরতেই অপর প্রান্তে এক কণ্ঠ বলে, আপনার ছেলে রেজাউল গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তাকে ঢাকা মেডিকেল নিয়ে যাচ্ছি।" এরপর কল কেটে যায়। মা বারবার কল ব্যাক করলে এক পথিক জানান, ছেলেটা যাত্রাবাড়ী থানার পাশে কুতুবখালী টোল প্লাজার কাছে গুলিবিদ্ধ হয়। এখন সে হাসপাতালে।" রাত ৮:০০ টায়, রেজাউল জীবনের কাছে হার মেনে নেয়। গুলির ক্ষত বুকে বয়ে নিয়ে সে চলে যায় এক নতুন দিগন্তের পথে, যেখানে শহীদেরা ঘুমায়, ইতিহাসে স্থান পায়।

**শোক আর স্মৃতির মিছিলে পরিবার**

শহীদের লাশ যখন বাড়িতে আসে, তখন কান্নায় ভেঙে পড়েন তার মা। আমার ছেলে! আমার পবিত্র সন্তান! সে তো শুধু কুরআন মুখস্থ করছিল! সে তো শুধু সঠিকের পাশে দাঁড়িয়েছিল!" পিতা মোঃ আল-আমিন, যার ডান পায়ের হাঁটুতে সমস্যা, বসে পড়েন মাটিতে। তিনিআর কোনো শব্দ করতে পারেন না। দাদী মোসাম্মৎ রাশেদা বেগম স্মৃতিচারণ করেন সে কখনো কোনো খারাপ কথা বলেনি। সালাম না দিয়ে কখনো কারো সামনে যেত না। আমাকে না ডেকে কিছু খেত না। এখন কে আমাকে 'দাদী' বলে ডাকবে?"

সেই পরিবারের একটি মাত্র পুত্র আজ নেই। আয়ের উৎস কমে এসেছে, কারণ বাবা আর

কাজে মন বসাতে পারেন না। মা দিনের পর দিন নিঃশব্দে কাঁদেন। ঘরের প্রতিটি কোণ, প্রতিটি জানালা যেন আজ রেজাউলের অভাব ঘোষণা করছে।

**আজ রেজাউলের কবর অবস্থান করছে ঠিক এই লোকেশনে:**

23°41'53.1"N 90°25'43.4"E (MCXH+6FH Dhaka) এই কবর শুধু একটি দেহকে বহন করছে না এটি বহন করছে একটি প্রজন্মের ন্যায়বোধ, একটি পরিবারের আশা, একটি জাতির জাগরণের প্রতীক। পথিকরা দাঁড়িয়ে পড়ে, কবরের পাশে ফিসফিস করে। সে ছিল কিশোর, তবুও রাষ্ট্রের ভয় পেয়েছিল তাকে।"

**চূড়ান্ত সত্য : একটি জাতির আয়না**

মোঃ রেজাউল করিম আমাদের চোখে শুধু এক কিশোর নয় তিনি আমাদের বিবেকের দর্পণ। তার আত্মত্যাগ প্রমাণ করে, সাহস বয়সের উপর নির্ভর করে না। এই রাষ্ট্র যখন নিরপরাধদের হত্যা করে, তখন রেজাউলের মতো শহীদেরাই ইতিহাসের প্রতিক্রিয়া হয়ে ওঠে। একজন রেজাউলের মৃত্যু, একশো রেজাউল জন্ম দেয়।

আমরা বলি তুমি রক্ত দিলেই প্রভাত হয়, তুমি না জাগালে আমরা ঘুম ভাঙাতে পারতাম না।"

রেজাউলের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে যদি কেউ শপথ নেয়, "আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করব" তাহলে রেজাউলের মৃত্যু বৃথা যায় না।

একটি শিশু রাষ্ট্রের মুখোমুখি হয়েছিল, সাহসে ভর করে। একটি কিশোর রাষ্ট্রের বুলেটকে তুচ্ছ করে সত্যের জন্য প্রাণ দিয়েছিল। একটি পরিবার সন্তান হারালেও, একটি জাতি পেল শহীদ। মৃত্যু দিয়ে সে ইতিহাস লিখে গেল, কান্না দিয়ে নয়, সাহস দিয়ে পথ দেখিয়ে গেল।"

**শহীদের নামে আমাদের কণ্ঠে প্রতিজ্ঞা হোক:**

"আর কোনো রেজাউল যেন গুলি খেয়ে না মরতে হয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব রেজাউলদের হাতে থাক সত্যের পতাকা, নয়তো ভবিষ্যৎ থমকে যাবে।" এই লেখাটি শহীদ রেজাউল করিমের প্রতি একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি, একটি স্বাক্ষর, একটি সনদ যে কিশোর একদিন আমাদের চোখে সাহসের সংজ্ঞা লিখে গেছে।

**প্রস্তাবনা**

"রক্তে রাঙানো কিশোর : শহীদ মোঃ রেজাউল করিমের গল্প"এই লেখাটি শুধু একটি কিশোরের জীবনের গল্প নয়, এটি এক অন্যায়বিরোধী কণ্ঠস্বর, একটি প্রতিবাদের অগ্নিশিখা, একটি জাতির বিবেকের জাগরণ। ইতিহাস সাক্ষী, কখনো কখনো সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলে ওঠে সবচেয়ে অল্প বয়সের হাতে। মোঃ রেজাউল করিম সেই প্রদীপ, যিনি নিজের তাজা রক্ত দিয়ে আলোকিত করে গেছেন নিপীড়িত বাংলার ভবিষ্যৎ পথচলা।

এ গ্রন্থে আমরা খুঁজে পাই এক কিশোরের স্বপ্ন, একটি পরিবারের আশা, এক রাষ্ট্রের নিষ্ঠুরতা এবং এক সমাজের সাহসের নির্যাস। রেজাউলের জীবন ও মৃত্যু আমাদের শেখায় সাহস বয়স দেখে না, প্রতিবাদ কখনোই নিঃশব্দে থাকে না, আর শহীদ কখনোই হারিয়ে যায় না; তারা হয়ে ওঠে প্রতিটি ন্যায়সংগ্রামের ছায়াসঙ্গী।

এই লেখাটি শহীদ রেজাউল করিমকে উৎসর্গ করা এক নিবেদন যেন আমরা ভুলে না যাই, কোথা থেকে এসেছি, কী হারিয়েছি, আর কেন আবার দাঁড়াতে হবে। এই কিশোরের আত্মত্যাগ নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা দিক, অনুপ্রেরণা দিক, এবং আমাদের বিবেককে বারবার নাড়া দিক যেন আর কোনো মা সন্তান হারিয়ে কাঁদে না, আর কোনো অন্যায় নিরব ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে না থাকে।

এই স্মরণপত্র শুধু একটি আত্মজীবনী নয়, এটি একটি প্রতিবিম্ব রাষ্ট্রের, সমাজের এবং আমাদের নিজেদের। পাঠকের হৃদয়ে যদি সাহসের স্পর্শ রেখে যেতে পারে, তবে তবেই রেজাউলের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না।

**একনজরে প্রস্তাবনা**

১. শহীদের পিতার কর্মসংস্থান করে দেওয়া যেতে পারে।

২. শহীদের দুই বোনকে শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া যেতে পারে।

৩. পরিবারকে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে।

## এক নজরে শহীদ পরিচিতি

| | | |
|---|---|---|
| শহীদের পূর্ণ নাম | : | মোঃ রেজাউল করিম |
| জন্ম তারিখ | : | ০১-০২-২০০৯ |
| জন্মস্থান | : | ঢাকা |
| পেশা | : | ছাত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: মীরহাজিরবাগ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রেণি: ৭ম |
| স্থায়ী ঠিকানা | : | বাসা-৩৯, এলাকা:মীরহাজিরবাগ, থানা:যাত্রাবাড়ি, জেলা:ঢাকা |
| বিশেষ কৃতিত্ব | : | ৭ পারা, হাফেজী শেষ করেছে |
| পিতার নাম | : | মো: আল-আমিন মীর, পিতার পেশা ও বয়স: ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, ৪৯ |
| মায়ের নাম | : | রাশিদা বেগম, মায়ের পেশা ও বয়স: গৃহিনি, ৪০ |
| মাসিক আয় | : | ২০,০০০ |
| আয়ের উৎস | : | পিতার কাজ |
| পরিবারের সদস্য | : | বোন ২ জন<br>১. ফাতেমাতুজ জোহরা (২০), বদরুন্নেছা কলেজ, দ্বাদশ<br>২. তানজিলা আক্তার (১২), মীরহাজিরবাগ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ৪র্থ |
| ঘটনার স্থান | : | কুতুবখালী টোল প্লাজা |
| আক্রমণকারী | : | পুলিশের গুলি |
| আহত হওয়ার তারিখ | : | ০৪/০৮/২০২৪, সময়: সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনট |
| মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান | : | ০৪-০৮-২০২৫, সময় : রাত ৮:০০টা |
| শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান | : | (জিপিএস লোকেশনসহ)<br>23°41'53.1"N 90°25'43.4"E/23.698071,90.428730/MCXH+6FH Dhaka |

# একজন দিনমজুরের নিষ্পাপ স্বপ্ন থেকে শহীদের মাটি পর্যন্ত যাত্রা

**শহীদ মোঃ রায়হান**

ক্রমিক : ৭৭৭

আইডি : ঢাকা সিটি ১৩৬

## শহীদ পরিচিতি

ঢাকার কলতা বাজারের এক সরু গলিতে, ভাঙাচোরা দালানের আড়ালে, কাঁচা সিমেন্টের দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন এক মানুষ নিরীহ, নিরালম্ব, নাম মোঃ রায়হান। কেউ ডাকতো "রায়হান ভাই", কেউবা শুধুই “চাচা”, কিন্তু ক'জন জানতো তার ভেতরের বেদনা, তার নিঃসঙ্গ সংগ্রাম? সেই মানুষটা ছিলেন একজন দিনমজুর, যিনি জীবনের ভার টানতেন না কেবল নিজের কাঁধে, বরং এক অসুস্থ শরীর, প্রিয় স্ত্রী, একমাত্র ছেলে নাজমুল, আর পেছনে পড়ে থাকা বাবা-মায়ের ভালোবাসার দায় নিয়েই টেনেছিলেন।

রায়হানের জন্ম ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ সালে, ঢাকা শহরের গলির ভেতর এক দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারে। বাবা মোঃ সালাউদ্দিন এক কাঠমিস্ত্রি, যিনি ৭০ বছর বয়সেও ঘাম ঝরান ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। মা রহিমা বেগম একজন গৃহিণী, যিনি দোয়া করতেন, ছেলে যেন অন্তত একটু ভালো থাকে। রায়হান পড়াশোনায় খুব এগোতে পারেননি, জীবন তাকে সময় দেয়নি। ২৫ হাজার টাকার মাসিক আয়ে সংসার চালানো, ভাঙা বাসায় বৃষ্টির দিন টিনের ছাদ গোনা, আর একমাত্র ছেলের স্কুলের ফি সবই ছিল তার বাস্তবতা। কিন্তু সে ছিল একজন শান্ত মানুষ। একটু সহজ-সরলও। কে কী বললো, তাতেই বিশ্বাস করে নিতেন। তাই হয়তো শত্রু আর বন্ধুর ফারাক বুঝে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

**জুলাইয়ের আগুনে জ্বলতে থাকা শহর**

২০২৪ সালের জুলাই মাসে যখন ঢাকার বাতাস ছিল উত্তপ্ত, রাজপথে ছিল ছাত্রদের বিক্ষোভ, "জুলাই বিপ্লব" তখন শুধু রাজনীতি ছিল না, ছিল বেঁচে থাকার দাবি, ন্যায়ের জন্য গর্জন। গোটা ঢাকা যেন এক আতঙ্কে মোড়ানো বিস্ফোরক কুয়াশায় ঢেকে যায়। পেছনে দাঁড়ানো গরিব মানুষগুলো তখনও ভাবতো "এইটা ওদের জিনিস, আমরা তো শুধু কাজ করেই বাঁচি। রায়হানও রাজনীতি বোঝেননি। না কোনো দল চিনতেন, না কোনো মিছিলের রঙ বুঝতেন। বোঝেননি বলেই ভয়াবহ সেই পরিস্থিতির মাঝখানেও বেরিয়ে পড়েছিলেন শুধু একটু ফ্রি চিকিৎসার আশায়। ডান হাত ভেঙে গিয়েছিল কিছুদিন আগে। ফার্মেসির ওষুধে আর কোনো লাভ হচ্ছিল না। এক প্রতিবেশী বলেছিল, "মুগদা হাসপাতালে গরিবদের ফ্রি চিকিৎসা দেয়।"

**তার চোখ জ্বলে উঠেছিল সেই আশাতে।**
**"বউ, আমি মুগদা যাই। হসপিটালেই তো ফ্রি ট্রিটমেন্ট দিবো বলতেছে।"**
**স্ত্রী বলেছিলেন, "যেওনা, এখন রাস্তা ভালো না।"**
**তিনি হেসে বলেছিলেন, "একটু গিয়েই দেখি, তেমন কিছু হইবো না।**

**ঘটনার দিন:** ৫ আগস্ট ২০২৪ বিকাল পাঁচটা। রায়হান মুগদা হাসপাতালের দিকে যাচ্ছেন। আর তখনই শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। পুলিশ আর ছাত্রদের মুখোমুখি সংঘর্ষের মাঝে পড়ে যান তিনি। শরীরটা তখনই দুর্বল ছিল, হাতের ব্যথা ছিল প্রবল। হঠাৎ পুলিশের লাঠিচার্জ শুরু হয়। ভয়ে দৌড়ান। এক জায়গায় পড়ে যান। তারপর অন্ধকার। সেই মুহূর্তে, নিজের মোবাইল থেকে স্ত্রীকে ফোন করে বলেন, "বড় গন্ডগোল হইছে, পুলিশ মারছে সবাইরে... আমি এইখানে আছি, দোয়া কইরো।"

এটাই ছিল তার শেষ কথা। রাতে বারবার ফোন করেও বড় ভাই রায়হানকে পাননি। শেষমেশ রাত তিনটার দিকে এক অপরিচিত নাম্বার থেকে ফোন আসে "এই লোক আপনার কি হয়?"

**ভাই বলেন, "আমার ছোট ভাই।"**

**লোকটি বলে, "ওনার লাশ হাতিরঝিল ব্রিজের নিচে পড়ে আছে। পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন।"**

রায়হানের বড় ভাই, ছোট বোন স্বর্ণা আক্তার নুরজাহান আর বৃদ্ধ পিতা ছুটে যান সেখানে। দুইটি লাশ পড়ে ছিল। একটির শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন, পুরো শরীর রক্তে ভেজা। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল বিচ্ছিন্ন। তখন সেনাবাহিনীর এক অফিসার এসে বলেন, **"চেনেন?"** তারা চোখের জল ফেলে মাথা নাড়েন।

**"তাহলে নিয়ে যান। আরেকজনের লাশ আমরা নিচ্ছি।"**

**তাদের গলায় তখন কোনো আওয়াজ ছিল না, শুধু বুকের ভেতরে চাপা কান্না।**

নিরব ভালোবাসা, অপূর্ণ চাওয়া

তার ছোট বোন বলেছিলেন,

“ভাইয়া একটু নরম মনের ছিল। রান্না ভালোবাসতো, আমার হাতে রান্না খেতে আসতো। ৩ আগস্ট ফোন দিয়ে টাকা চাইছিল। আমি বলছিলাম দু-একদিন পর আসবো। কিন্তু আমি যাইতে পারি নাই। এখন শুধু আফসোস হয় শেষ চাওয়াটাও পূরণ করতে পারি নাই।”

**শেষ আশ্রয়: জুরাইন গোরস্থান**

রায়হানের রক্তাক্ত দেহ এখন চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে জুরাইনের মাটিতে। পেছনে রয়ে গেছে একটি ছোট ছেলে, একটি কাঁদতে থাকা স্ত্রী, দুটি বৃদ্ধ চোখ আর এক অসমাপ্ত প্রহর যেখানে তার নাম নেই কোনো রাজনীতির পাতায়, কিন্তু তার রক্ত লেগে আছে সেই আন্দোলনের কালো মাটিতে।

**শেষ কথা:** রায়হান কোনো নেতা ছিলেন না, ছিলেন না বক্তা, কিংবা কোনো পোস্টারের মুখও নন। তিনি ছিলেন একজন মানুষ যিনি বিশ্বাস করেছিলেন অন্য মানুষের কথায়, ভেবেছিলেন একটু চিকিৎসা পেলে বাঁচবেন। কিন্তু তিনি চিরদিনের মতো ঢলে পড়েছেন "জুলাই বিপ্লব"-এর এক নীরব শহীদ হয়ে। তিনি আমাদের চোখে অচেনা, কিন্তু সেই লাখো রায়হানের প্রতীক যারা শুধু বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু যাদের প্রাণ দিয়েও কিছুই চাওয়ার ছিল না।

**শহীদ মোঃ রায়হান আপনার সহজ সরলতা আজ একটি জাতির বিবেককে প্রশ্ন করে:**

**কেন একজন গরিব চিকিৎসা পেতে গিয়ে গুলিতে মারা যায়?"**

## রায়হানের এতিম শিশুটির কি হবে?

● হারুন ইসলাম *ঢাকা*

আমার ভাইয়ের ১১ বছরের একটা ছেলে আছে। ছেলেটা এতিম হয়ে গেল। এই এতিম শিশুটির এখন কি হবে? ভাইকে খুব নৃশংসভাবে মারা হয়েছে। হাতের নখ উপড়ে ফেলা হয়েছে। একটা মানুষকে এত নৃশংসভাবে মারতে পারে সেটা আমার ধারণা ছিল না। আমি ভাই হত্যার সঠিক বিচার চাই, ঠিক কান্না বিজড়িত গলায় এভাবেই নয়া দিগন্তের এই প্রতিবেদকের কাছে মনের অভিব্যক্তি বর্ণনা করেছেন কোটা আন্দোলনে নিহত রায়হান হোসেন সাদ্দামের বোন সোনালী স্বর্ণা।

ছাত্রজনতার গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকা আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা প্রায় হাজার ছুঁই ছুঁই। জাতিসঙ্ঘের রিপোর্ট অনুযায়ী এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ৬৫০ জন। তাদের মধ্যে শিশু শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী, দিনমজুর, সাংবাদিকসহ নানা শ্রেণিপেশার মানুষ রয়েছেন। অনেক নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছেন। অনেকে ঘর থেকে বের হওয়ার আগে জানতেন না ঘরে আর ফিরতে পারব কি না। ঠিক এমন ঘটনা ঘটেছে যাত্রাবাড়ীর মীর হাজিরবাগ এলাকার রায়হান হোসেন সাদ্দামের সাথে। নিহত রায়হানের বোন সোনালি স্বর্ণা ও তার স্বজনদের সাথে কথা বলেন, আমার ভাই রায়হান হোসেন সাদ্দাম একজন দিনমজুর ছিলেন। পেশাগত কাজে তিনি হাতে আঘাত পান। এ জন্য হাতের কোনো হাড়গোড় ভেঙে গেছে কি না চেকআপ করাতে মুগদা মেডিক্যাল হাসপাতালে যান ভাই। কিন্তু সে সময় হঠাৎ মেডিক্যালের সামনে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে পুলিশ। চারদিকে গোলাগুলি চলা অবস্থায় তিনি পড়ে ■ ৮ম পৃ: ৭-এর কলামে

সংশোধিত/Corrected

Government of the People's Republic of Bangladesh

Office of the Registrar, Birth and Death Registration

Zone - 5, Dhaka South City Corporation

Dhaka South City Corporation, Dhaka

(Rule 9, 10)

AEHQ

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Date of Registration 26/12/2019 | Birth Registration Number 20142692045206600 | Date of Issuance 26/12/2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Date of Birth | : 25/09/2014 | Sex : Male | |
| In Word | : Twenty Fifth of September Two Thousand Fourteen | | |
| নাম | : মো: নাজমুল ইসলাম | Name | : Md. Najmul Islam |
| মাতা | : নাজমা বেগম | Mother | : Nazma Begum |
| মাতার জাতীয়তা | : বাংলাদেশী | Nationality | : Bangladeshi |
| পিতা | : মোঃ রায়হান | Father | : Md. Raihan |
| পিতার জাতীয়তা | : বাংলাদেশী | Nationality | : Bangladeshi |
| জন্মস্থান | : ঢাকা, বাংলাদেশ | Place of Birth | : Dhaka, Bangladesh |
| স্থায়ী ঠিকানা | : ১৩৩/১/এ ডিস্টিলারী রোড গেন্ডারিয়া-১২০৪, জোন - ৫, সায়েদাবাদ, ঢাকা | Permanent Address | : 133/1/a Distilary Road Gandaria-1204, Zone - 5, Sayedabad, Dhaka |

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
LINA KHANOM

Seal & Signature
Registrar

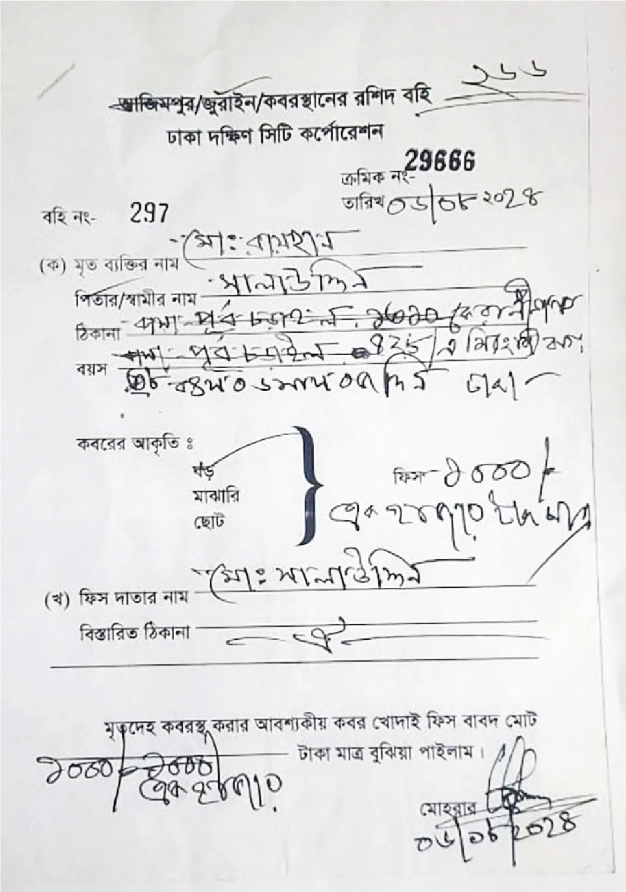

আজিমপুর/জুরাইন/কবরস্থানের রশিদ বহি ২৬৬

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

ক্রমিক নং- 29666

বহি নং- 297

তারিখ ০১/০৮/২০২৪

(ক) মৃত ব্যক্তির নাম মোঃ রায়হান

পিতার/স্বামীর নাম সালাউদ্দিন

ঠিকানা

বয়স

কবরের আকৃতি ঃ বড় মাঝারি ছোট

ফিস ১০০০/-

(খ) ফিস দাতার নাম মোঃ সালাউদ্দিন

বিস্তারিত ঠিকানা ঐ

মৃতদেহ কবরস্থ করার আবশ্যকীয় কবর খোদাই ফিস বাবদ মোট ১০০০/- টাকা মাত্র বুঝিয়া পাইলাম।

মোহরার
০১/০৮/২০২৪

## এক নজরে শহীদ পরিচিতি

| | | |
|---|---|---|
| শহীদের পূর্ণ নাম | : | মো: রায়হান |
| জন্ম তারিখ | : | ০১-০২-১৯৮৬, |
| পেশা | : | দিনমজুর |
| পিতার নাম | : | মো: সালাউদ্দিন, পেশা ও বয়স: কাঠমিস্ত্রি, ৭০ |
| মায়ের নাম | : | রহিমা বেগম, পেশা ও বয়স: গৃহিনি: ৫৮ |
| বর্তমান ঠিকানা | : | বাড়ি-৪০, কলতা বাজার, কোতয়ালী, ঢাকা |
| স্থায়ী ঠিকানা | : | বাসা-৪২৮/এ, এলাকা-মীরহাজীরবাগ, আদর্শ স্কুলের পশ্চিম পাশে থানা-শ্যামপুর, জেলা: ঢাকা |
| মাসিক আয় | : | ২৫,০০০ |
| এক ছেলে | : | নাজমুল(১১), ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র |
| ঘটনার স্থান | : | মুগদা |
| আক্রমণকারী | : | পুলিশ |
| আহত হওয়ার তারিখ | : | ৫/৮/২৪, সময়: বিকাল ৫টা |
| মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান | : | ৫/৮/২৪, বিকাল ৬টা (আনুমানিক) |
| শহীদের কবরের অবস্থান | : | জুরাইন গোরস্থান |

**প্রস্তাবনা**

শহীদের পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করা প্রয়োজন

শহীদের সন্তানের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেওয়া যেতে পারে

শহীদ পরিবারে স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে

# শহীদ সাইদুল ইসলাম ইয়াসিন

ক্রমিক : ৭৭৮

আইডি : ঢাকা সিটি: ১৩৭

## শহীদের পরিচিতি

ঢাকার পুরান শহরের কোলাহল আর ধূলিঝড়ের মাঝে, ব্রাহ্মণ চিরন, যাত্রাবাড়ীর ছোট্ট এক ঘরে জন্ম নিয়েছিল এক শান্ত স্বভাবের শিশু সাইদুল ইসলাম ইয়াসিন। ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি, একটি ছিমছাম সকালে মা শিল্পী আক্তারের কোলজুড়ে আলোর মত এসেছিল সে। মুদির দোকান চালানো বাবার মুখে হাসির রেখা, যদিও সংসারের আয় ছিল মাত্র পনেরো হাজার, কিন্তু তবু সন্তানদের নিয়ে তার মনে ছিল না কোনো আক্ষেপ। এ ছিল এমন এক পরিবার, যেখানে চাহিদা কম, কিন্তু ভালোবাসা ছিল আকাশসম।

সাইদুল পড়তো কুতুবখালী মাহমুদুল হাসান কওমী মাদ্রাসায়। মিশকাত জামাতের ছাত্র হলেও সে কেবল বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তার কণ্ঠ ছিল প্রতিবাদী, চোখে ছিল দীপ্ত স্বপ্ন একদিন দেওবন্দে যাবে, হবে আলেমে দ্বীন। বন্ধুদের সাথে সে খেলত, হাসত, কিন্তু তার আত্মা ছিল গভীর দারিদ্র্য, অন্যায়, নারী-নিগ্রহ, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন এসব স্পর্শ করত তাকে।

২০২৪ সালের জুলাই মাস ঢাকার রাজপথ যেন জেগে উঠেছিল। একে একে রাস্তায় নামে হাজারো ছাত্র, কিশোর-কিশোরী। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন, রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, নিরাপত্তাহীন জীবনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় ছাত্রসমাজ। ইয়াসিন ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম সাহসী কণ্ঠস্বর। মাদ্রাসার ছাত্র হয়েও সে বুঝে গিয়েছিল, কেবল দীনি জ্ঞান নয়, এই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে থাকা জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলাও ফরজ। ৪ আগস্ট সেদিন বিকেল ৫টায় ধোলাইপাড়ে ঘটে সেই বিভীষিকাময় ঘটনা। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হকি স্টিক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। ব্যথায় কুঁকড়ে গেলেও তার চোখে ছিল না পরাজয়ের ছাপ। বন্ধুরা যখন তাকে ধরে মেডিকেলে নেয়, তখনও সে বলেছিল "আমি কাল আবার যাবো, ইনশাআল্লাহ।" পাঁচ তারিখেও সে আবার রাজপথে নেমে পড়ে। বিজয়ের দিনগুলোতে সে সহযোদ্ধা ছাত্রদের ট্রাফিক সহায়তা দিতে উদ্বুদ্ধ করে, রাতের পাহারায় নেতৃত্ব দেয়।

সবার প্রিয় ইয়াসিন হয়ে ওঠে অদৃশ্য এক অনুপ্রেরণা। আর এই অনুপ্রেরণাই হয়ে ওঠে তার মৃত্যুদণ্ডের কারণ। ১৩ আগস্ট রাতে, ছাত্র ছদ্মবেশে আসা সন্ত্রাসীরা থানা পাহারায় যুক্ত হয়। তারা লক্ষ্য করে এই ছেলেটিই নেতৃত্ব দিচ্ছে, বাকিদের উদ্বুদ্ধ করছে। পরিকল্পনা পাকাপোক্ত হয়। রাত গভীর হলে অধিকাংশ ছাত্র চলে যায়, থেকে যায় ইয়াসিন ও কিছু বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা।

ভোররাত সাড়ে তিনটায় মা ফোনে বলেন "বাবা, আর কতো দেরি?"

*সে উত্তর দেয় "মা, সকালেই ফিরবো।"*

*সেই ছিল শেষ কথা।*

সকালের আলোয় চোখ মেলে যখন দেখে সামনে দাঁড়িয়ে মা, তখন সে ফিসফিস করে বলে, "মা... ওরা..." বাকিটা আর উচ্চারণ করতে পারে না।

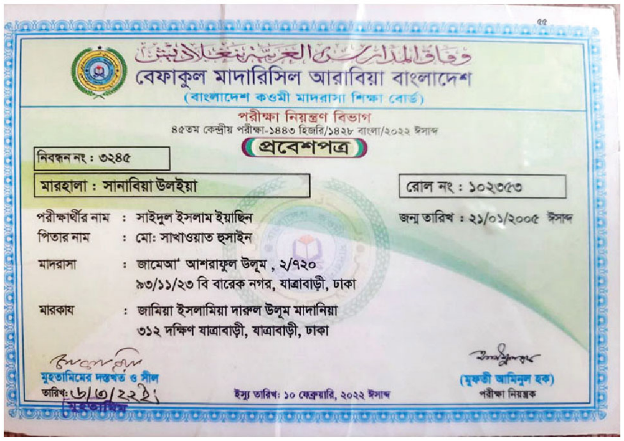

وفاق المدارس العربية بنغلاديش

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ

(বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ

৪৫তম কেন্দ্রীয় পরীক্ষা-১৪৪৩ হিজরি/১৪২৮ বাংলা/২০২২ ঈসাব্দ

প্রবেশপত্র

নিবন্ধন নং : ৩২৪৫

মারহালা : সানাবিয়া উলইয়া

রোল নং : ১০২৩৫৩

পরীক্ষার্থীর নাম : সাইদুল ইসলাম ইয়াছিন

জন্ম তারিখ : ২১/০১/২০০৫ ঈসাব্দ

পিতার নাম : মো: সাখাওয়াত হুসাইন

মাদরাসা : জামেআ' আশরাফুল উলূম, ২/৭২০ ৯৩/১১/২৩ বি বারেক নগর, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

মারকায : জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া ৩১২ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

মুহতামিমের দস্তখত ও সীল

তারিখ: ৮/৩/২২ ইং

ইস্যু তারিখ: ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ ঈসাব্দ

(মুফতী আমিনুল হক)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

### ঘটনার বিবরণ

শহীদ সাইদুল ইসলাম ইয়াসিন বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিলেন। ৪ আগস্ট আন্দোলন চলাকালে সে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের দ্বারা মারাত্মকভাবে নির্যাতনের শিকার হন। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা তাকে হকি স্টিক দিয়ে বেধড়ক মারপিট করে। এতে সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে, পরবর্তীতে তাকে স্থানীয় মেডিকেলে নিয়ে গিয়ে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং তার বাম পায়ে ব্যান্ডেজ করা হয়। এরপরেও সে ৫ তারিখে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বিজয়ের পরবর্তী দিনগুলোতে সকলের সাথে মিলেমিশে ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করতেন। সর্বশেষ ১৩ আগস্ট সকালে বন্ধুদের সাথে ট্রাফিকের কাজে সহায়তার জন্য বাসা থেকে বের হন। থানায় পুলিশ না থাকায় চারিদিকে ডাকাতি বেড়ে যাওয়ায় শহীদ সাইদুল

ইসলাম ইয়াসিন তার সকল বন্ধুদেরকে দিনে ট্রাফিক কাজে অংশগ্রহণ এবং রাতে থানা পাহারা দেয়ার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা যোগাত। বিকালের দিকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের ১৫ থেকে ২০ জনের একটি টিম ছাত্র ছদ্মবেশে এসে তাদের সাথে থানা পাহারায় সহায়তা করার কথা বলে। তারা পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পায় সাইদুল ইসলাম ইয়াসিন ছাত্রদেরকে নেতৃত্ব দেয়। যার কারণে সে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের টার্গেটে পরিণত হয় এবং হামলার পরিকল্পনা করে। রাত গভীর হলে অধিকাংশ ছাত্ররা বাসায় চলে যায়। ছাত্র ছদ্মবেশে আসা ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা এবং সাইদুল ইসলাম ইয়াসিনসহ অল্প কিছু ছাত্ররা থেকে যায়। সারারাত বাসায় না ফেরায় তার মা শিল্পি বেগম একাধিকবার ছেলের সাথে কথা বলেন। সর্বশেষ ভোর ৩:৫০ মিনিটের দিকে ফোন করলে সকালে বাসায় ফিরবে বলে জানায়। এর কিছুক্ষণ পরে (১৪ আগস্ট ভোর রাতে) যাত্রাবাড়ী থানার অদূরেই একটি দোকানে পানি কিনতে গেলে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা এটাকে সুযোগ হিসেবে নেয়। দোকান থেকে ফেরার পথে ১৫ থেকে ২০ জন সন্ত্রাসী তাকে নির্মমভাবে আঘাত করে আহত অবস্থায় থানার পাশে রেখে দেয়। সকাল হলে বাকি ছাত্ররা চলে গেলেও ছাত্র ছদ্মবেশে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা থেকে যায়। সবাই চলে গেলে তাকে থানার মধ্যে একটি রুমে নিয়ে এসে আবার মারধর করে ফ্লোরে ফেলে রাখে। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের মধ্য থেকে একজন ৯টার দিকে তার সাথে থাকা ফোন থেকে তার মায়ের কাছে কল করে তাকে কেউ আহত করে থানায় ফেলে রাখার কথা জানিয়ে ফোনটি ভেঙ্গে ফেলে। সংবাদ পেয়ে একাই ছুটে যান থানায়। সেখানে মুমূর্ষ অবস্থায় ছেলেকে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এই অবস্থা কে করেছে

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, BIRTH AND DEATH REGISTRATION
LOCAL GOVERNMENT DIVISION
Back to Previous Page (/)

BIRTH REGISTRATION RECORD VERIFICATION

| REGISTRATION DATE | REGISTRATION OFFICE | ISSUANCE DATE |
| --- | --- | --- |
| 03 JUNE 2022 | ZONE - 4. DHAKA NORTH CITY CORPORATION | 03 JUNE 2022 |
| DATE OF BIRTH | BIRTH REGISTRATION NUMBER | SEX |
| 21 JANUARY 2005 | 20052692509525481 | MALE |

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| নিবন্ধিত ব্যক্তির নাম | মোঃ সাইদুল ইসলাম ইয়াছিন | REGISTERED PERSON NAME | MD SAIDUL ISLAM EASIN |
| জন্মস্থান | ঢাকা | PLACE OF BIRTH | DHAKA |
| মাতার নাম | | MOTHER'S NAME | SHILPI AKTER |
| মাতার জাতীয়তা | বাংলাদেশী | MOTHER'S NATIONALITY | BANGLADESHI |
| পিতার নাম | | FATHER'S NAME | MD. SHAKAOAT HOSAN |
| পিতার জাতীয়তা | বাংলাদেশী | FATHER'S NATIONALITY | BANGLADESHI |

NB:This record is retrived from Birth and Death Registration Database . Location of the Register office : ZONE - 4 MIRPUR-10, DHAKA NORTH CITY CORPORATION, DHAKA. everify.bdris.gov.bd (https://everify.bdris.gov.bd/) is the official website to verify the record

Back to Previous Page (/)

© 2025 - Developed and maintained by Office of the Registrar General, Birth and Death Registration

জানতে চাইলে থানার বাইরে দাড়িয়ে থাকা কিছু ছেলেদের দেখিয়ে দেন এবং উপরোক্ত ঘটনা জানান। মা শিল্পি বেগম লক্ষ করেন ছেলের কথা ধীর ও কমে যাচ্ছে এবং শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত পার্শ্ববর্তী প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্তব্যরত ডাক্তার প্রাথমিক পরীক্ষা শেষে অবস্থা আশঙ্কাজনক বুঝতে পেরে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যেতে বলেন। সেখানে জরুরি বিভাগেই চিকিৎসারত অবস্থায় ১৪ আগস্ট ২০২৪ সকাল ১০:৫৫ মিনিটে শহীদ হন।

প্রথমে নেওয়া হয় এক বেসরকারি হাসপাতালে। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে। সকাল ১০টা ৫৫ মিনিটে, ডাক্তাররা মাথা নাড়িয়ে বলেন "তিনি আর নেই।"

### একজন শহীদের মা, একটি ভাঙা সংসার

ছেলেকে হারিয়ে শিল্পী আক্তারের মুখ যেন মোমের মতো নিস্তব্ধ। "আমার ছেলে বাইরে থেকে ঘরে এলেই তিনবার ডাকত মা, ও মা, মাগো কই তুমি?" আমি বলতাম "তিনবার মা ডাক কেন?"

ইয়াসিন হেসে বলত "মা তুমি যে তিনজনের ভালবাসা একসাথে দাও!"

আজ সেই ডাক নেই। সেই মুখ নেই। যেটা আছে, তা হলো অভাব, ঋণের বোঝা, বাবার শরীরে টিউমার, মেয়ের পড়াশোনার অনিশ্চয়তা।

একমাত্র ছোট বোন সাদিয়া ইসলাম সুরাইয়া বলে "আমার ভাই স্কুলে পৌঁছে দিত। এখন কে দেবে? আমার খেলনা লুকিয়ে রেখে বিরক্ত করত, এখন কে করবে?" তার কণ্ঠে কেবল কান্নার শব্দ, "আমার তো ভাই বলে ডাকবো এমন কেউ আর থাকলো না!"

### স্মৃতি ও শোকের ছায়া

সাইদুল ইসলাম ইয়াসিন, এক মাদ্রাসা ছাত্র নম্র, ভদ্র, হাসিখুশি,

একজন অনন্য দৃষ্টান্ত। এই রাষ্ট্র, এই সমাজ যে কিভাবে একজন নিষ্পাপ কিশোরকে গলাটিপে হত্যা করতে পারে তা দেখেছে এই আগস্টের আকাশ।

তার স্বপ্ন ছিল আলেম হওয়া, মানুষের কল্যাণে কাজ করা, মাকে আর কখনো এনজিওতে কিস্তি তুলতে না পাঠানো। অথচ এখন তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এক অসহায় মা শুধু বলেন "আমার ছেলের জায়গা কেউ কখনও পূরণ করতে পারবে না।"

### যেখানে ঘুমায় শহীদ

23°42'57.5"N 90°25'50.5"E এই নিঃশব্দ লোকেশনে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন শহীদ সাইদুল ইসলাম ইয়াসিন। ঠিকানা বদলে গেছে, কিন্তু হৃদয়ের ঠিকানায় সে থেকে যাবে চিরকাল।

স্মৃতি, স্বপ্ন আর রক্তের বিনিময়ে লেখা হয়েছে এই কিশোরের নাম যে তার সময়কে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে এক প্রতীকের নাম, প্রতিবাদের নাম, শহীদের নাম।

### শেষ কথা

সাইদুল ইসলাম ইয়াসিন শহীদ হয়েছেন, কিন্তু তার রক্ত বৃথা যাবে না। ইতিহাস জানবে, একটি দরিদ্র ঘরের সন্তান কীভাবে এক রাষ্ট্রের জুলুমের বিরুদ্ধে মিছিলের সর্বাগ্রে দাঁড়িয়েছিল। জানবে, কোথাও এক মা প্রতিদিন রাতের অন্ধকারে ছেলের শেষ "মা" ডাক শুনে ঘুম ভাঙে।

## এক নজরে শহীদ পরিচিতি

| | | |
|---|---|---|
| শহীদের পূর্ণ নাম | : | মো: সাইদুল ইসলাম ইয়াসিন |
| জন্ম তারিখ | : | ২১ -০১ -২০০৫ |
| জন্মস্থান | : | ঢাকা |
| পেশা | : | ছাত্র |
| বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা | : | ব্রাহ্মণ চিরন, সায়দাবাদ, যাত্রাবাড়ী,ঢাকা |
| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | : | কুতুবখালী মাহমুদুল হাসান কওমী মাদ্রাসা |
| পিতার নাম | : | মো: সাখওয়াত হোসেন |
| পিতার পেশা | : | মুদী দোকানদার |
| মায়ের নাম | : | শিল্পী আক্তার |
| মায়ের পেশা | : | গৃহিনি |
| মাসিক আয় | : | ১৫,০০০ |
| ঘটনার স্থান | : | ধোলাইপাড়, |
| আক্রমণকারী | : | ছাত্রলীগ |
| ১ম বার আহত হওয়ার তারিখ | : | ৪/৮/২৫ |
| ২য় বার আহত হওয়ার তারিখ সময় | : | বিকাল ৫টা, ১৪/৮/২৫, ভোর রাত |
| মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান | : | ১৪/৮/২৫, সকাল ১০:৫৫ মিনিটে |
| শহীদের কবরের অবস্থান | : | জিপিএস লোকেশনসহ ২৩°42'57.5"N 90°25'50.5"E<br>23.715960, 90.430681, PC8J+97M Dhaka |

**প্রস্তাবনা**

শহীদের পিতার ব্যবসার মূলধন বাড়াতে সহযোগিতা করা যেতে পারে
শহীদের বোনকে শিক্ষা বৃত্তি দেওয়া যেতে পারে
শহীদের পরিবারকে স্থায়ী বাসস্থান দেওয়া দরকার

## শহীদ রথিন বিশ্বাস

ক্রমিক : ৭৭৯

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১৫৪

# শহীদ পরিচিতি

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার শুয়াগ্রাম ইউনিয়নের শান্ত এক গ্রাম সুয়াগ্রাম। সেই শান্ত গ্রামে জন্ম নিয়েছিল এক দুর্বার সাহসী প্রাণ রথিন বিশ্বাস। ১৯৯৯ সালের ২৮ আগস্ট, এই সাহসী সূর্যসন্তানের আবির্ভাব ঘটে দানিয়েল বিশ্বাস ও শেফালী বিশ্বাস দম্পতির ঘরে। ছোটবেলা থেকেই রথিন ছিলেন আত্মনির্ভরশীল, দায়িত্ববান ও পরিবারের প্রতি অতল শ্রদ্ধাশীল। জীবনের কঠোর বাস্তবতা তাকে অল্প বয়সেই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। পিতার মৃত্যু, ভাই বোনের প্রতিবন্ধী জীবন, ও পরিবারের দুরবস্থার এই চাপ অপরিণত বয়সেই তার কাঁধে এনে দেয় পাহাড়সম দায়িত্ব।

তিনি ঘর ছাড়েন, কিন্তু দেশের প্রতি ভালোবাসা ছাড়েননি। চলে আসেন রাজধানী ঢাকায়। সেখানেই পশ্চিম রাজাবাজার এলাকার উইলিয়াম কেরি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে অফিস সহকারী পদে যোগ দেন। পরিবার চালানো, ভাই ও বোনের চিকিৎসার খরচ জোগানো সব দায়ভার একাই কাঁধে তুলে নেন এই তরুণ। অফিসের কাজ, ছোট্ট এক ভাড়া বাসা আর পরিবারের প্রতি টান এটাই ছিল রথিনের জগৎ। কিন্তু এই সাধারণ জীবনের আড়ালেই লুকিয়ে ছিল এক বিপ্লবী সত্তা। যে অন্যায় মেনে নিতে পারত না। যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে জানত।

২০২৫ সালের ৫ আগস্ট, ইতিহাসের রচিত একটি দিন। সেদিন খুনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের মিছিলে ঢাকার রাজপথ উত্তাল হয়ে উঠে। একপর্যায়ে হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। ছাত্র-জনতা বিজয় মিছিল নিয়ে রাজপথ ও সংসদ ভবন সহ সারাদেশে বিজয় মিছিলের আয়োজন করে। রথিন বিশ্বাসও সেই মিছিলে অংশ নেন, নির্ভীক চিত্তে, অবিচল সংকল্পে। মিছিলটি যখন সংসদ ভবন এলাকার নিকটে পৌঁছায়, তখন আকস্মিকভাবে একটি কাঁচের টুকরো ভেঙে পড়ে তার মাথায়। রক্ত ঝরতে থাকে। ব্যথা ছিল, রক্ত ছিল, কিন্তু তবুও ছিল না ভয়ের ছায়া। তাকে দ্রুত নিউরোসাইন্স হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু মৃত্যুকে ঠেকানো গেল না। আন্দোলনের রাজপথে শহীদ হলেন এক তরুণ, যে শুধু নিজের পরিবারের নয় দেশেরও ভবিষ্যৎ ছিল। পরদিন, নিথর দেহটি ফিরে আসে নিজের মাটিতে। যেখানে একদিন খেলাধুলা করেছিলেন, স্বপ্ন বুনেছিলেন, সেই উঠানে তাকে শায়িত করা হয়। তার বাবার কবরের পাশেই। খ্রিস্টান ধর্মীয় রীতিতে সম্পন্ন হয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। আকাশ যেন সেদিন কিছুটা বেশি ভারী ছিল, বাতাস যেন কাঁদছিল।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে শহীদ রথিন বিশ্বাসের ভাবী মাধবী বাড়ৈ বলেন- "আমার স্বামী শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ও একজন সরল প্রকৃতির মানুষ। একজন ননদ, সে-ও প্রতিবন্ধী। দেবর রথিন বিশ্বাসের সহযোগিতায় আমাদের সংসার চলত। গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে রথিন শহীদ হয়। এর পর থেকে আমরা খুব অসহায় হয়ে পড়েছি। আমাদের যেকোনো বিপদে-আপদে রথিনই ছিল একমাত্র ভরসা। রথিনকে আমরা সন্তানের মতো জানতাম। আমরা এখন কীভাবে বাঁচব?'

এই কান্না শুধু এক পরিবারের নয়, এক জাতির কান্না। এক তরুণের অকালপ্রয়াণ শুধু তার স্বজনদের জন্য নয়, আমাদের সমাজের জন্যও অপূরণীয় ক্ষতি।

গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক মুহম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, আমরা শহীদ রথিন বিশ্বাসের বাড়ি ঘুরে এসেছি। তাঁর পরিবারের পাশে জেলা প্রশাসন সব সময় থাকবে।' রথিন বিশ্বাসের ভাই ও বোনের জন্য দ্রুত প্রতিবন্ধী ভাতার ব্যবস্থা করাসহ চিকিৎসার উদ্যোগ নিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

রথিন বিশ্বাস ছিলেন না শুধু একজন চাকরিজীবী তরুণ। তিনি ছিলেন এক অজেয় বীর। যিনি বিশ্বাস, ন্যায়বোধ, আর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: রথিন বিশ্বাস
Name: ROTHIN BISWAS
পিতা: দানিয়েল বিশ্বাস
মাতা: শেফালী বিশ্বাস
Date of Birth: 28 Aug 1999
ID NO: 7357052658

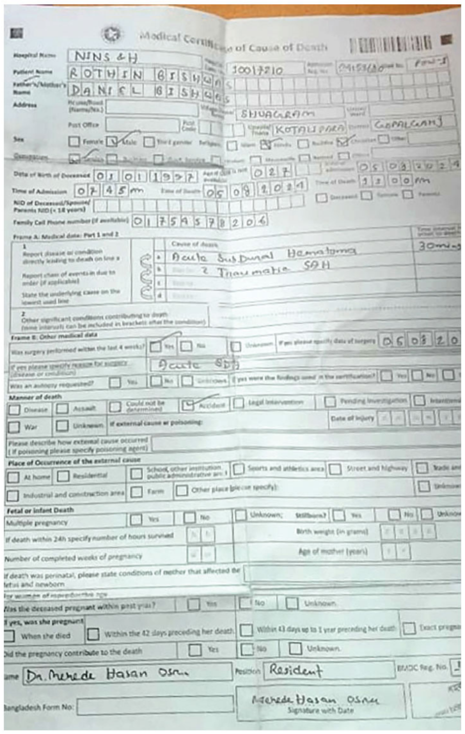

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: NINS & H

Patient Name: ROTHIN BISHWAS

Father's/Mother's Name: DANIEL BISHWAS

Village: SHUAGRAM

Upazila/Thana: KOTALIPARA

District: GOPALGANJ

Date of Birth of Deceased: 01 01 1997

Age: 027

Time of Admission: 07 45 am

Date of Death: 05 08 2024

Time of Death: 12 00 pm

Family Cell Phone number (if available): 01759578206

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

Cause of death: a. Acute Sub Dural Hematoma — 30 min

b. 2 Traumatic SAH

Frame B: Other medical data

Was surgery performed within the last 4 weeks? Yes

If yes please specify reason for surgery: Acute SDH

Manner of death: Accident

Name: Dr. Mehede Hasan Osru

Position: Resident

Signature with Date: Mehede Hasan Osru

## এক নজরে শহীদ রথিন বিশ্বাসের প্রোফাইল

| | | |
|---|---|---|
| নাম | : | রথিন বিশ্বাস |
| পিতা | : | দানিয়েল বিশ্বাস (প্রয়াত) |
| মাতা | : | শেফালী বিশ্বাস |
| জন্ম | : | ২৮ আগস্ট ১৯৯৯ |
| ঠিকানা | : | গ্রাম: সুয়াগ্রাম, ইউনিয়ন: শুয়াগ্রাম, উপজেলা: কোটালীপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ |
| আহত হওয়ার তারিখ | : | ৫ আগস্ট ২০২৫ |
| আহতের স্থান | : | সংসদ ভবন এলাকা, ঢাকা |
| মৃত্যুর সময় ও স্থান | : | ৫ আগস্ট ২০২৫, নিউরোসাইন্স হাসপাতাল, ঢাকা |
| দাফনের স্থান | : | নিজ বাড়ির উঠানে, বাবা-মায়ের কবরের পাশে (খ্রিস্টান ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী) |

**অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা**

রথিন বিশ্বাস ছিলেন একটি পরিবারের মূল অবলম্বন। তার মৃত্যুতে পরিবারটি মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে। নিচের প্রস্তাবনাগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন জরুরি:

১. প্রতিবন্ধী ভাতা: শহীদের ভাই ও বোনের জন্য আজীবন প্রতিবন্ধী ভাতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২. মাসিক ভাতা: পরিবারটির জন্য অন্তত ১৫,০০০ টাকা মাসিক সরকারি সহায়তা চালু করা উচিত।

৩. আবাসন সহায়তা: শহীদ পরিবারের জন্য একটি স্থায়ী আবাসন নির্মাণ অথবা গৃহ নির্মাণ সহায়তা প্রদান।

৫. এককালীন আর্থিক অনুদান: পরিবারটির পুনর্বাসনের জন্য কমপক্ষে ১০ লাখ টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করা প্রয়োজন।

৬. চাকরি সংস্থান: শহীদের পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি বা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

**শহীদ মোঃ হাসান (হাফেজ হাসান)**
ক্রমিক: ৭৮০
আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ: ১১৬

# বাড়ি নির্মাণের জন্য যে জমি কিনেছিলেন, সেখানেই শায়িত হয়েছেন শহীদ হাফেজ হাসান

**শহীদ পরিচিতি**

মো: হাসান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরগাজী ইউনিয়নের টুমচর গ্রামের মৃত মোহাম্মদ সেলিমের একমাত্র ছেলে। ১০ বছর আগে বাবার মৃত্যুর পর হাসানের মা মাহিনুর বেগম ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আশ্রয় নেন নোয়াখালীর সুবর্ণচরের চরজব্বর ইউনিয়নে তার নানার বাড়িতে। সেখান থেকেই জীবনযুদ্ধ শুরু হয় তার। ২৫ পারা কোরআনের হাফেজ ছিলেন তিনি। দাখিল পর্যন্ত পড়ালেখা করলেও জীবিকার তাগিদে চট্টগ্রামের একটি ওয়ার্কশপে কাজ শুরু করেন। নানা বাড়িতে থাকার সময়ই হাসানের স্বপ্ন জাগে এক টুকরো জমি আর ছায়া নিবিড় শান্ত একটি বাড়ির। ছোট থেকে জীবন সংগ্রামী হাসান সেই স্বপ্ন পূরণ করতে কিনেছিলেন জমি। বাড়ি নির্মাণের জন্য সেই জমি ভরাটও করেছিলেন। বাড়ির পাশে কবরস্থান তৈরির জন্য রেখেছিলেন জমি। কিন্তু এসব কিছুই আর বাস্তবায়ন হবে না। বাড়ি নির্মাণের জন্য জায়গাটি খালি পড়ে থাকলেও কবরস্থানের জন্য হাসানের রেখে দেওয়া সেই জমিতেই পরিবারের প্রথম দাফন ব্যক্তি হিসেবে শায়িত হয়েছেন হাসান। কিন্তু কে জানত, কবরস্থানের জন্য রাখা প্রথম কবরটিই হবে তার?

ছোট বেলায় বাবাকে হারিয়ে মায়ের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন নানা বাড়িতে। একটি শান্ত ভিটেমাটির জন্য ছোটবেলা থেকে সংগ্রাম করা হাসান শুধু নিজেকে নিয়েই ভাবতেন না। ছিল দেশের প্রতি অকুণ্ঠ প্রেম। দেশের প্রয়োজনে গত বছরের জুলাই অভ্যুত্থানে যোগ দিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে ৯ মাস চিকিৎসাধীন থাকার পরে সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেছেন না ফেরার দেশে। বাড়ি নির্মাণের জন্য কেনা সেই জমিতে অনন্তকালের জন্য শায়িত হয়েছেন জুলাই বিপ্লবের এই অগ্রপথিক।

হাসান চট্টগ্রামের হালিশহর গরিবে নেওয়াজ উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। করোনাকালে পড়াশোনা থেকে ছিটকে পড়লেও পরিবারকে সহায়তা করতে একটি ওয়ার্কশপে কাজ শুরু করেন। অল্প বয়সেই তিনি দুই বোনের একমাত্র ভাই হিসেবে পরিবারের ভরসাস্থল ছিলেন। মায়ের দুঃখ ঘোচাতে নিজ হাতে জীবনের হাল ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

### যেভাবে তিনি শহীদ হয়েছেন

৫ আগস্ট ২০২৪ চট্টগ্রাম নগরীর টাইগারপাস এলাকায়  হাজারো মানুষের সঙ্গে ফ্যাসিবাদবিরোধী জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেন তখন যুবলীগ নেতা শামিম ও পুলিশ বাহিনীর গুলিতে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন হাসান। প্রথমে তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) স্থানান্তর করা হয়। এরপর উন্নত চিকিৎসার জন্য থাইল্যান্ডের ব্যাংককের বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য সেখান থেকে পাঠানো হয় পায়াথাই পাহোলিওথিন হাসপাতালে। সেখানে দীর্ঘ ৯ মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর গত বৃহস্পতিবার ২২ মে রাত ১১টা ১০ মিনিটে হাসানের সংগ্রামী জীবনের শেষ হয়। রোববার ২৫ মে সকালে জানাজা শেষে হাসানকে তার স্বপ্নের সেই জমিতেই দাফন করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে হাসানের জীবন সংগ্রাম দেখা সকলেই বলছেন ‘স্বপ্ন ছিল মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে, হলো তবে জীবনের জন্য নয়, চিরনিদ্রার জন্য।’

### নিকটাত্মীয়র অভিমত

হাসানের আত্মীয় শামিম চৌধুরী বলেন, হাসান পরিবারের বড় ছেলে। তার অনেক দায়িত্ব ছিল। কিন্তু সব কিছু তুচ্ছ করে সে চলে গেছে। তার আলাদা বাড়ি করে থাকার স্বপ্ন ছিল। আস্তে ধীরে সব হচ্ছিল। সে নতুন বাড়িতে আলাদা কবরস্থান রেখেছে। প্রথম কবরটিই হবে তার, তা কে জানত? বাবা হারা এতিম ছেলেটা সবাইকে কাঁদিয়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নোয়াখালীর আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম বলেন, হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে শনিবার ২৪ মে ২০২৫ রাত ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে হাসানের জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহীদ হাসানের মা মাহিনুর বেগমের ইচ্ছানুযায়ী তাকে রোববার ২৫ মে সকাল ৯টায় দ্বিতীয় জানাজা শেষে নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচরে দাফন করা হয়েছে। হাসান ছিল সাহসী ও সংগ্রামী এক তরুণ। তার আত্মত্যাগ আমাদের পথ দেখাবে।

নোয়াখালী জেলা প্রশাসক খন্দকার ইসতিয়াক আহমেদ বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন জাতিকে নতুন করে ভাবার সুযোগ করে দিয়েছে ও নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। তিনি বলেন, শহীদ হাসান ছিল তার পরিবারের একমাত্র অবলম্বন। স্বৈরাচার পতনে তার আত্মত্যাগ ও অবদান জাতি চিরকাল স্মরণ করবে।

জুলাই আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক উমামা ফাতেমা ফেসবুকে লিখেছেন ‘জুলাই অভ্যুত্থানে আহত হাসান ভাই একটু আগে শহীদ হয়েছেন। হাসান ভাই আহত হওয়ার পর থেকে ‘এম্পাওয়ারিং

আউয়ার ফাইটার্স'র মাধ্যমে তার সাথে কলি আপু সার্বক্ষণিক যুক্ত ছিলেন। কিছুদিন আগে কলি কায়েজ আপু বলেছিলেন হাসানের অবস্থা বেশি ভালো না। আমি ভাবছিলাম দেশে এলে দেখতে যাব। কী বলব! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আহত, শহীদদের পরিবারের জীবন থমকে গেছে। আমরা ঠিকই যাপন করে যাচ্ছি। কিন্তু যাপন করি কই! জুলাই তো কাঁধে বয়ে বেড়াতে হয়। শহীদদের লাশের ভার কি আমাদের কাঁধকেই ভারী করে তোলে?! বাকি সব তো দেখি দিব্যি কেটে যাচ্ছে।

এছাড়া ২২ মে ২০২৫ রাত ১১টা ২১ মিনিটে 'এম্পাওয়ারিং আওয়ার ফাইটারস' নামে একটি ফেসবুক পেজে বলা হয়, জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম আহত যোদ্ধা আমাদের ভাই হাসান থাইল্যান্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একটু আগে শহীদ হয়েছেন। সবাই দোয়া করবেন। ফোনে খবরটি নিশ্চিত করেছেন হাসানের ছোট বোন সুমাইয়া। ওই স্ট্যাটাসে উল্লেখ করা হয়, 'গত সাত মাস ধরে উন্নত চিকিৎসার জন্য থাইল্যান্ডে ছিলেন হাসান। গত ১০ এপ্রিল ২০২৫ হাসানকে লাইফসাপোর্ট থেকে সরিয়ে সাধারণ বেডে আনা হয়। ২৫ এপ্রিল তার অবস্থার অবনতি ঘটায় তাকে ফের লাইফসাপোর্টে নেয়া হয়।' 'গত ৫ আগস্ট টাইগারপাসে আন্দোলনের সময় মাথার ডান পাশে গুলিবিদ্ধ হয়- যা সম্ভাব্য ব্রেন ড্যামেজের কারণ হয়। চট্টগ্রাম মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার খাদ্যনালী ও কণ্ঠনালী এক করে লাইফসাপোর্ট দেয়া হয়। এ সময় ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়ে তার মস্তিষ্কে এবং শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হলে দ্রুত তাকে ঢাকা সিএমএইচে নিয়ে যাওয়া হয়।'

**বাঁশেরকেল্লা- Basherkella**
44m

৪ আগস্ট দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর কদমতলী, বিআরটিসি, সিআরবি ও টাইগারপাশ এলাকায় প্রকাশ্যে শটগান দিয়ে গু*লি চালায় যুবলীগ নেতা শামীম।

সিআরবি এলাকায় সেই গুলিতে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন আন্দোলনে অংশ নেওয়া দুই শিক্ষার্থী সাইফুল ইসলাম আরিফ ও মো. হাসান। ৫৭ দিনের লড়াই শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর শাহাদাত বরণ করেন আরিফ। সর্বশেষ দশমাস পর গতকাল মারা গেলেন আরেক শিক্ষার্থী হাসান।

**নিউজ মিডিয়ায় প্রকাশিত খবরের লিঙ্ক**

1.https://www.bssnews.net/bangla/national/202102
2.https://www.google.com/amp/s/www.prothomalo.com/amp/story/bangladesh/district/lcgyin593m
3. https://www.news24bd.tv/details/223302
4. https://www.kalbela.com/country-news/190870
5.https://www.somoynews.tv/news/2025-05-24/NLU0N1PA
6. https://khoborpatrabd.com/archives/176499

**প্রস্তাবনা**

১. শহীদ পরিবারের জন্য স্থায়ী বাসস্থান উপহার দেওয়া যেতে পারে
২. মাসিক সহায়তা হিসেবে ১৫০০০ সমপরিমাণ অনুদান দেওয়া যেতে পারে
৩. শহীদের মায়ের স্থায়ী কর্মসংস্থান করে দেওয়া যেতে পারে (হাস মুরগীর খামার, দুগ্ধ গাভী পালন)

ঢাকায় আনা হয়েছে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত মো. হাসানের মরদেহ। শনিবার (২৪ মে) সন্ধ্যায় হাসানের কফিন হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়।

বিমানবন্দরে আনুষাঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করে প্রথম জানাজার জন্য তার কফিন শহীদ মিনারে নেয়া হচ্ছে। তার প্রথম জানাজা রাত ৮ থেকে ৯টার মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ৫ আগস্ট চট্টগ্রামের টাইগারপাসে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে গুরুতর আহত হাসানকে প্রথমে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকার সিএমএইচে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বামরুনগ্রাদ হাসপাতাল পাঠানো হয়। শেষে তাকে সেদেশের পায়াথাই পাহোলিওথিন হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এ হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার রাত ১১টা ১০ মিনিটে হাসানের মৃত্যু হয়। তার বয়স হয়েছিল ২৫ বছর।

তার মায়ের ইচ্ছাঅনুযায়ী তাকে নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচরে দাফন করা হবে। তার মহদেহ দাফনের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্বাবধানে জেলা প্রশাসন নোয়াখালী সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

## একনজরে শহীদ প্রোফাইল

| | |
|---|---|
| নাম | : মো: হাসান (হাফেজ হাসান) |
| জন্মস্থান | : লক্ষ্মীপুর |
| পিতা | : মোহাম্মদ সেলিম (মৃত) |
| মাতা | : মাহিনুর বেগম, পেশা: গৃহিণী |
| বোন | : ২ জন , ১. মোসা: সুমাইয়া |
| পেশা | : ছাত্র ও ওয়ার্কশপ শ্রমিক, শ্রেণি: দশম, হালিশহর গরিবে নেওয়াজ উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম |
| স্থায়ী ঠিকানা | : গ্রাম: টুমচর, ইউনিয়ন: চরগাজী, উপজেলা: রামগতি, জেলা: লক্ষ্মীপুর |
| বর্তমান ঠিকানা | : গ্রাম: চরজব্বর, উপজেলা: সুবর্ণচর, জেলা: নোয়াখালী |
| আহত | : ৫ আগস্ট ২০২৪, স্থান: টাইগারপাস চট্টগ্রাম |
| শাহাদত | : ২২ মে ২০২৫ (বৃহস্পতিবার), সময়: রাত ১১:১০ মিনিট, স্থান: পায়াথাই পাহোলিওথিন হাসপাতাল থাইল্যান্ড |
| আক্রমণকারী | : যুবলীগ নেতা শামিম ও পুলিশ বাহিনী |
| চিকিৎসা সেবা | : ১.চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (চমেক)<br>২.ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ)<br>৩.থাইল্যান্ডের ব্যাংকক বামরুনগ্রাদ হাসপাতাল<br>৪. পায়াথাই পাহোলিওথিন হাসপাতাল, থাইল্যান্ড |
| জানাজা | : ১ম - কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ, ঢাকা, ২৪ মে ২০২৫ রাত ১০টা<br>২য় - জামেয়া ইসলামিয়া ফারুকিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ, নোয়াখালী, রোববার ২৫ মে সকাল ৯টা |
| দাফন | : নিজবাড়ি, নোয়াখালি |

# একটি গার্মেন্টস শ্রমিক
# এক পরিবারের সব স্বপ্ন, এক অব্যক্ত প্রতিবাদ

**শহীদ সোহান শাহ**
ক্রমিক : ৭৮১
আইডি : খুলনা বিভাগ ০৬৪

### শহীদ পরিচিতি

সোহান শাহ একজন সাধারণ মানুষ, কিন্তু আজ অসাধারণ এক নাম। গার্মেন্টস শ্রমিক থেকে শহীদ হওয়া এই তরুণ ছিলেন মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার চন্ডিখালী গ্রামের পরিচিত এক চেহারা। পিতা সেকেন্দার শাহ, মা সুফিয়া বেগম আর স্ত্রী শম্পা খাতুন এই ক্ষুদ্র পরিবারই ছিল তাঁর জীবনের কেন্দ্রে।

### শহীদ পরিচিতি

১৯৯৭ সালের ১৩ নভেম্বর, মাগুরার মাটি আর কুয়াশা ভেজা এক সকালে জন্ম নেন সোহান। কৃষিজীবী পরিবারে জন্ম নিয়েও তাঁর চোখে ছিল আলাদা এক স্বপ্ন পরিবারের দারিদ্য পেরিয়ে একদিন ভাল কিছু করার।

সোহান দাখিল পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু অভাব নামক দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে জিততে পারেননি। বইয়ের পাতা ছেড়ে তাঁকে নামতে হয় জীবিকার সংগ্রামে। ঢাকায় এসে রামপুরার ভারগো গার্মেন্টসে চাকরি নেন। সেলাইয়ের মেশিনে দীর্ঘ সময় বসে কাটে তাঁর দিন। স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন রামপুরার ছোট্ট একটি বাসায়। দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন বড়। একদিনের ছুটি মানেই গ্রামের বাড়িতে ফোন করে মায়ের কণ্ঠ শোনা আর একটা নিরব দীর্ঘশ্বাস "আর কতদিন এমন চলবে?"

### অর্থনৈতিক বিবরণ

সোহানের উপার্জনেই চলত পুরো সংসার। বাবা বয়স্ক, কাজ করতে পারেন না। মা অসুস্থ, ওষুধ কিনতে হয় ধার করে। স্ত্রী শম্পার মুখে মাঝে মাঝে হাসি ফুটত সোহানের টাকায় কেনা শাড়িতে। কিন্তু তাও মাসের শেষ দিকে চাল ডাল মিলিয়ে হিসেব করে খেতে হতো।

### আন্দোলনে যোগদান

সোহান রাজনীতিতে ছিলেন না। প্রতিবাদী কোন কর্মসূচিতে যোগ দেননি। ১৯ জুলাই ২০২৪, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার একটি মিছিল হয় রামপুরায়। সোহান নিজের অফিস শেষে বাসায় ফেরার পথে মিছিল দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন। আন্দোলনে যোগ দিয়ে মিছিলে স্লোগান দিতে থাকেন। একজন নাগরিক হিসেবে সামান্য স্লোগানই যে তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তা কে জানতো?

### জুলাই-আগস্টের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট দেশের রাজপথে উত্তেজনার নামান্তর। ছাত্র-জনতার আন্দোলন, পুলিশি বাধা, টিয়ার গ্যাস আর গুলির গর্জন তখন নিত্যদিনের চিত্র। সোহানের মৃত্যু সেই ভয়াবহ সময়ের আরেকটি রক্তাক্ত চিহ্ন।

### যেভাবে তিনি শহীদ হলেন

১৯ জুলাই ২০২৪। রামপুরার উত্তপ্ত রাজপথে শুরু হয় ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া ও গুলিবর্ষণ। হঠাৎ একটি গুলি বুক চিরে হার্টের পাশ দিয়ে শরীরে ঢুকে পড়ে সোহানের। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে ২৩ আগস্ট ২০২৪ সিএমএইচে স্থানান্তর করা হয়। পরে সিএমএইচ-এ অপারেশনের সিদ্ধান্ত হয়। দীর্ঘ একমাসের বেশি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই শেষে, ২৭ আগস্ট ২০২৪, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অপারেশনের পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে সোহান শাহ মারা যান।

**সোহান শহীদ হয়েছেন নীরবে, বিনা অপরাধে, একটিমাত্র গুলিতে।**
**কিন্তু তাঁর গল্প যেন আমাদের না থামায়, বরং প্রশ্ন তোলে এই মৃত্যু কার দায়?**

### নিকটাত্মীয়ের অভিমত

সোহানের দুলাভাই শফিকুল ইসলাম লাবু বলেন, "সে কোনো রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল না। গার্মেন্টসে কাজ করত। শুধু একটি গুলিতে সব শেষ হয়ে গেল। ওর মৃত্যুর পর যেন আমরা বাঁচার পথটাই হারিয়ে ফেলেছি।"

### অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা

সোহান শাহর মৃত্যু শুধু একজন শ্রমিকের প্রাণনাশ নয়, এটি একটি পরিবারকে অনিশ্চয়তায় ফেলে দেওয়া এক নির্মম পরিণতি। তাঁর স্ত্রী শম্পা খাতুন আজ একা, সন্তানবিহীন হলেও ভবিষ্যৎ শূন্যতায় ডুবে গেছে। এই পরিবারের জন্য দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সহায়তা, বাসস্থান ও চাকরির ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

## একনজরে শহীদ প্রোফাইল

| | |
|---|---|
| নাম | : সোহান শাহ, শিক্ষাগত যোগ্যতা: দাখিল পাশ |
| পেশা | : গার্মেন্টস শ্রমিক, ভারগো গার্মেন্টস, রামপুরা, ঢাকা |
| জন্ম তারিখ | : ১৩ নভেম্বর ১৯৯৭, জন্মস্থান: শ্রীপুর উপজেলা, মাগুরা জেলা |
| পিতা | : সেকেন্দার শাহ, (বয়োবৃদ্ধ), মাতা: সুফিয়া বেগম, গৃহিণী |
| স্ত্রী | : শম্পা খাতুন |
| আহত | : ১৯ জুলাই ২০২৪, রামপুরা, ঢাকা |
| চিকিৎসা | : জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট, সিএমএইচ |
| মৃত্যু | : ২৭ আগস্ট ২০২৪, সন্ধ্যা |
| আক্রমণকারী | : পুলিশ |
| গুলির ধরণ | : গুলি হার্টের পাশে বিদ্ধ |

## একটি প্রতিবাদ, একটি আত্মত্যাগ একটি আশার গল্প

**শহীদ আসিফ**

ক্রমিক: ৭৮২

আইডি: বরিশাল বিভাগ ০৮৩

### শহীদ পরিচিতি

একটি নাম কখনো কখনো ইতিহাস হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে জাতির স্মৃতির পাতায় চিরভাসমান। শহীদ আসিফ তেমনই এক নাম। জন্মেছিল এক অজপাড়াগাঁয়ে, মৃত্যুবরণ করেছিলেন রাজধানীর আলো-আঁধারির এক কোণে। বয়স মাত্র তেইশ, কিন্তু আত্মত্যাগে তিনি হয়ে গেছেন কালজয়ী।

২০০১ সালের ৭ অক্টোবর, বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার বাজিত খা গ্রামে জন্ম নেয় এক শিশু, নাম রাখা হয় আসিফ। পিতা মাহেব হোসেন দেওয়ান, একাধারে কৃষক ও দিনমজুর; কিন্তু ছেলেটা যেন জন্ম থেকেই ছিল অন্যরকম। তার জন্মের কিছুদিন পরই পিতা চলে যান না-ফেরার দেশে। তারপর মা শাহিনুর বেগমের কাঁধেই নেমে আসে সংসারের সমস্ত ভার। ঘরের মাটির দেয়ালে টাঙানো আসিফের ছবিটা আজ যেন শুধুই অতীত।

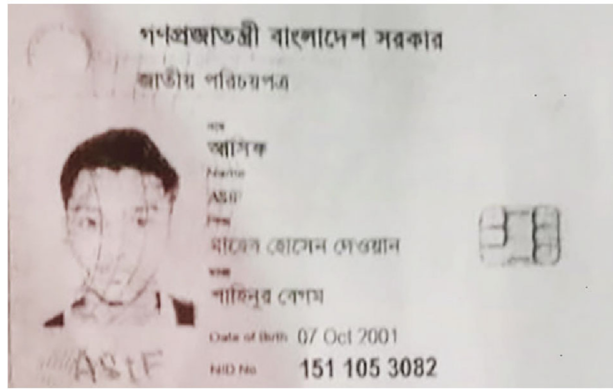


### শহীদ হওয়ার ঘটনা

ঘটনাস্থল মগবাজার, ঢাকা। ৫ আগস্ট ২০২৪, রাজপথে একটি বিজয় মিছিল হয়। মিছিল শেষে আসিফ ও তার সঙ্গীরা মোটরসাইকেলযোগে ফিরছিলেন বাসায়। তারা জানতো না, ছাত্রলীগের কিছু সদস্য তাদের পেছন থেকে অনুসরণ করছে।

সময় রাত ২টা। আচমকা একটি কালো মাইক্রোবাস এসে মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এরপর রাস্তায় ফেলে, মারধর করে। গুরুতর জখম অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই ধীরেধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে শহীদ আসিফ।

### কর্ম ও অর্থনৈতিক বিবরণ

আসিফ ছিলেন পাতার হাটি আরসি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। মেধাবী ছিলেন, চুপচাপ, গম্ভীর। তবে তার চোখে সবসময় স্বপ্নের আগুন দেখা যেত। লেখাপড়ার খরচ আর ছোট ভাই-বোনের মুখে ভাত তুলে দিতে, সে পড়ালেখার পাশাপাশি সাভারের এক চামড়া কারখানায় রিফাইন্ডিংয়ের কাজ করতো। মা গৃহিণী, ঘরে ছোট ভাই আসাদ (১৪), বোন শমী (১৩)। শহরে থাকা, পড়াশোনা চালানো আর সংসার চালানো সবকিছু একাই সামলাতো আসিফ। অথচ কেউ কখনও তাকে কষ্টের কথা বলতে শোনেনি। যেন নিজের জীবন দিয়ে পরিবারের হাসিই ছিল তার জীবনের একমাত্র সাধনা।

### আন্দোলনে যোগদান ও জুলাই-আগস্টের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুলাই। ঢাকার রাজপথ উত্তপ্ত। ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে দিন গুনছিল ৈ
কণ্ঠরোধ। আসিফ, যিনি একসময়ে রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না, তিনিও নেমে আসেন রাজপথে। কারণটা ছিল সহজ ,দেশটাকে ভালোবাসতেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে চুপ থাকা যে পাপ, এই শিক্ষাটা মা-ই তাকে দিয়েছিলেন।

### পরিবারের ভাষ্য

শহীদের মা শাহিনুর বেগম কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন, **"ও ছিল আমার ছায়া। ও চলে যাওয়ার পর আমার ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেছে। আমি গরিব মানুষ, কিন্তু আমি গর্বিত। আমার আসিফ দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে।"** ছোট বোন শমী বলে, **"ভাইয়া বলত, একদিন আমাদের ঘরে আলো আসবে। এখন ও-ই আলো হয়ে গেছে"**

### প্রস্তাবনা

শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না। শহীদ আসিফ আমাদের সেই যুবক, যিনি জীবন দিয়ে প্রতিবাদের এক অনন্ত পথ রচনা করে গেছেন। তার মৃত্যুর রক্ত দিয়ে লাল হয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পতাকা। ইতিহাসের পাতায় আসিফ থাকবেন প্রতিবাদী তরুণদের অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে। আজকের প্রজন্ম যদি শহীদ আসিফদের কথা ভুলে যায়, তবে ইতিহাস ক্ষমা করবে না আমাদের। কিন্তু আমরা ভুলবো না। আমরা শ্রদ্ধা জানাবো তাকে, যিনি স্বপ্ন দেখতেন একটি শোষণমুক্ত, সুন্দর দেশের।

### শেষ কথা

একটি রাত, একটি ধাক্কা, একটি মৃত্যু কিন্তু জন্ম হলো এক শহীদের, যে এখন প্রতিটি প্রগতির মিছিলে ছায়া হয়ে হাঁটে। শহীদ আসিফ একটি নাম, একটি গল্প, একটি চিরজাগরিত বিদ্রোহ।

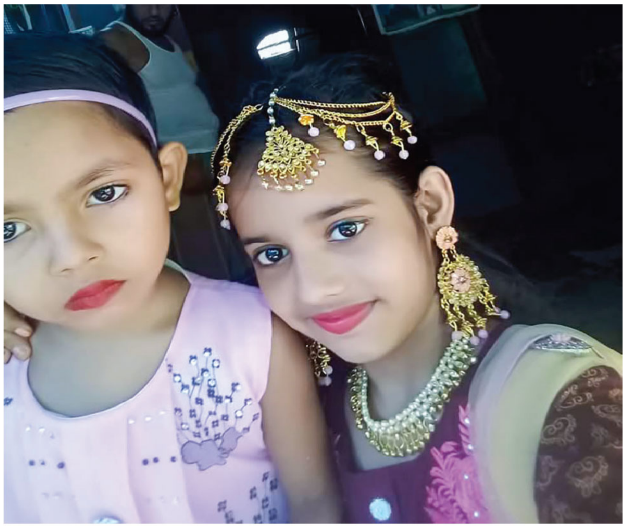

ঈদ
মোবারক

## একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

| | | |
|---|---|---|
| পূর্ণ নাম | : | আসিফ |
| জন্ম | : | ০৭ অক্টোবর ২০০১, বাজিত খা, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল |
| শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | : | পাতার হাটি আরসি কলেজ, দ্বিতীয় বর্ষ |
| পেশা | : | ছাত্র ও চামড়া কারখানার রিফাইন্ড কর্মী |
| মৃত্যু | : | ৬ আগস্ট ২০২৫, ঢাকা মেডিকেল কলেজ |
| কবরস্থানের অবস্থান | : | বাজিত খা, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল |
| পরিবার | : | মা, এক ভাই আসাদ (১৪), এক বোন শমী (১৩) |

## রক্তাক্ত শ্রাবণের কৃষক শহীদ

### শহীদ মো: হাছান মিয়া

ক্রমিক: ৭৮৩

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১৫৫

**শহীদ পরিচিতি**

নরসিংদীর রায়পুরার প্রত্যন্ত এক গ্রাম, বীরগাঁও নিলক্ষা পশ্চিম পাড়া। এই জনপদেরই একজন নিঃস্ব কৃষক ছিলেন মো: হাছান মিয়া। যিনি জীবনের পরতে পরতে সংগ্রাম বুনেছেন, আর মৃত্যুর মুহূর্তে দেশের সঙ্গে আত্মিক বন্ধনে অটুট থেকে জীবন উৎসর্গ করেছেন। ১৯৭৮ সালের ৭ আগস্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেন চুন্নু মিয়া ও আলেছা খাতুনের ঘরে। পিতামাতা বহু আগেই মারা যান। নিজের মতো করে জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন হাছান মিয়া। ছিলেন সরল, সৎ, নিরহংকার। জীবনযুদ্ধে হার না মানা এই কৃষক শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন শহীদের গৌরবময় মৃত্যুতে।

### জন্ম ও কর্ম

গ্রামের জমিনে কাজ করেই জীবন চলত হাছান মিয়ার। নিজের কোনো জমিজমা ছিল না, তবে অন্যের জমিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সারা দিন রোদের মধ্যে ধান কাটতেন, কলা বহন করতেন, কখনো ক্ষেতের আল ঠিক করতেন। দিনে এক মুঠো ভাত, রাতে আধপেটা ঘুম এই ছিল তাঁর জীবন। তাঁর প্রথম স্ত্রী পপির সঙ্গে ২০০৮ সালে বিচ্ছেদ ঘটে। দ্বিতীয় স্ত্রী ফুলমালার সঙ্গেও দাম্পত্য জীবন স্থায়ী হয়নি। দুই সংসারে তিন সন্তান রেখে চলে গিয়েছিলেন একাকীত্বের পথে।

### অর্থনৈতিক বিবরণ

হাছান মিয়ার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যথা ছিল তাঁরসন্তানদের ভবিষ্যৎ। বড় ছেলে রহমত উল্লাহ বর্তমানে বড় চাচার কাছে থেকে টেকনিক্যাল স্কুলে পড়ে। রাকিব মিয়া, দ্বিতীয় ঘরের সন্তান, পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ছে, কিন্তু সংসার ভাঙনের পর মা বাবা কারো ছায়াই সে পায়নি। আর মেয়ে আফসানার কপালে পড়াশোনা নয়, বিবাহই তার একমাত্র গন্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। পরিবারটির নিজস্ব কোনো জমি নেই। ছোট একটি টিনের চালা, তাও ভাঙাচোরা।

### আন্দোলনে যোগদান

২০২৪ সালের জুলাই মাস। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু শিক্ষার্থী নয়, এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয় সাধারণ মানুষও। হাছান মিয়ার মতো খেটে খাওয়া কৃষকরা বুঝে গিয়েছিল এই আন্দোলন তাদেরই অধিকারের জন্য।

২০ জুলাই, সকাল ১০টার দিকে মেহেরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে যখন মিছিল শুরু হয়, তখন হাছান মিয়া নিজ হাতে তৈরি করা একটি পতাকা হাতে নিয়ে সেই মিছিলে যোগ দেন। তাঁর চোখে ছিল আশার ঝিলিক, কণ্ঠে ছিল স্লোগানের আগুন।

### জুলাই-আগস্টের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন জাগরণের সময়। বৈষম্যের বিরুদ্ধে, অধিকার আদায়ের জন্য, অন্যায়ের প্রতিবাদে দেশের আনাচে-কানাচে ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে এসেছিল। বিজিবি এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সেই আন্দোলন দমন করতে মাঠে নামে। শান্তিপূর্ণ মিছিলে বারবার হামলা হয়। কিন্তু জনগণের দৃঢ়তা ভাঙতে পারেনি কেউ।

### যেভাবে তিনি শহীদ হলেন

২০ জুলাই, সকাল ১২টা। হাছান মিয়া তখন ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ছাত্রদের মিছিলে স্লোগান দিচ্ছিলেন। হঠাৎই আকাশ ফাঁটানো শব্দ গুলির শব্দ। বিজিবি বাহিনী মিছিল লক্ষ্য করে গুলি চালায়। নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার চিৎকার, ছোটাছুটি, কান্নার শব্দে ভরে ওঠে বাতাস। সেই মুহূর্তে একটি গুলি এসে হাছান মিয়ার বুকে বিদ্ধ হয়। তিনি লুটিয়ে পড়েন। কেউ ডাকতে পারেনি, কেউ ছুঁতে পারেনি হাছান মিয়া আর ওঠেননি। দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটের দিকে তাঁর নিথর দেহটিকে গ্রামের কিছু যুবক কাঁধে করে নিয়ে যান। সেইদিনই নিজের জন্মভূমিতে, নিজ গ্রামে চিরবিদায় নেন শহীদ হাছান মিয়া।

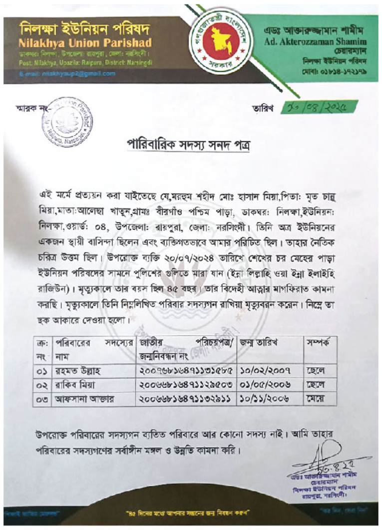

নিলক্ষা ইউনিয়ন পরিষদ
Nilakhya Union Parishad
ডাকঘর: নিলক্ষা, উপজেলা: রায়পুরা, জেলা: নরসিংদী।
Post: Nilakhya, Upazila: Raipura, District: Narsingdi
E-mail: nilakhyaup2@gmail.com

এডঃ আক্তারুজ্জামান শামীম
Ad. Akterozzaman Shamim
চেয়ারম্যান
নিলক্ষা ইউনিয়ন পরিষদ
মোবা: ০১৮১৪-১৭২১৭৯

স্মারক নং-

তারিখ ১০/০৪/২০২৫

পারিবারিক সদস্য সনদ পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে,মরহুম শহীদ মোঃ হাসান মিয়া,পিতা: মৃত চান্নু মিয়া,মাতা:আলেছা খাতুন,গ্রামঃ বীরগাঁও পশ্চিম পাড়া, ডাকঘর: নিলক্ষা,ইউনিয়ন: নিলক্ষা,ওয়ার্ড: ০৪, উপজেলা: রায়পুরা, জেলা: নরসিংদী। তিনি অত্র ইউনিয়নের একজন স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচিত ছিল। তাহার নৈতিক চরিত্র উত্তম ছিল। উপরোক্ত ব্যক্তি ২০/০৭/২০২৪ তারিখে শেখের চর মেহের পাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে পুলিশের গুলিতে মারা যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৪৫ বছর। তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। মৃত্যুকালে তিনি নিম্নলিখিত পরিবার সদস্যগন রাখিয়া মৃত্যুবরন করেন। নিম্নে তা ছক আকারে দেওয়া হলো।

| ক্র: নং | পরিবারের সদস্যের নাম | জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্মনিবন্ধন নং | জন্ম তারিখ | সম্পর্ক |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | রহমত উল্লাহ | ২০০৭৬৮১৬৪৭১১৩১৫৮৫ | ১০/০২/২০০৭ | ছেলে |
| ০২ | রাকিব মিয়া | ২০০৬৬৮১৬৪৭১১২৯৫০৩ | ০১/০৫/২০০৬ | ছেলে |
| ০৩ | আফসানা আক্তার | ২০০৬৬৮১৬৪৭১১৩২৯১১ | ১০/১১/২০০৬ | মেয়ে |

উপরোক্ত পরিবারের সদস্যগন ব্যতিত পরিবারে আর কোনো সদস্য নাই। আমি তাহার পরিবারের সদস্যগণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি কামনা করি।

এডঃ আক্তারুজ্জামান শামীম
চেয়ারম্যান
নিলক্ষা ইউনিয়ন পরিষদ
রায়পুরা, নরসিংদী।

"৪২ দিনের মধ্যে আপনার সন্তানের জন্ম নিবন্ধন করুন"

### শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

শহীদ হাছান মিয়ার ভাই, চোখে জল আর গলায় দমচাপা কান্না নিয়ে বলেছিলেন, **"সে কোনো নেতা ছিল না,**

**বক্তা ছিল না। কিন্তু নিজের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দেশপ্রীতি দেখিয়ে গেছে।"** ছেলে রহমত উল্লাহ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল বাবার কবরের পাশে। বলল না কিছুই, শুধু একবার মাটিতে বসে কবরের মাটি ছুঁয়ে বলল, **"বাবা, আমি পড়ালেখা শেষ করে তোমার মতোই অন্যায়ের প্রতিবাদ করব। তুমি দেখো"**

### অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা

**প্রস্তাবনা-১:** শহীদ হাছান মিয়ার পরিবার বিশেষ করে বড় ছেলে রহমত উল্লাহর পড়াশোনা ও জীবনের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে প্রতি মাসে কমপক্ষে ১৫,০০০/- টাকা সহায়তা প্রদানের অনুরোধ রইল।

**প্রস্তাবনা-২:** বীরগাঁও গ্রামে শহীদ হাছান মিয়ার স্মৃতিকে ধরে রাখতে ও তাঁর সন্তানদের নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করতে একটি টিনশেড ঘর নির্মাণ করা হোক।

### শেষ কথা

শুধুমাত্র একজন শহীদের নয়, বরং হাজারো নামহীন প্রতিবাদীর কণ্ঠস্বর। শহীদ হাছান মিয়া ছিলেন সেই সব মানুষের প্রতিনিধি, যারা চায় না ক্ষমতা চায় ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। তার রক্তে রাঙানো মাটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলাদেশ এখনও প্রতিবাদে বেঁচে আছে।

ZHMAE

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Nilakhya Union Parishad
Raipura, Narsingdi
(Rule 11, 12)

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration 21/11/2024 | Death Registration Number 19786816471129369 | Date of Issuance 21/11/2024

Date of Birth : 07/08/1978 Sex : Male
Date of Death : 20/07/2024
In Word : Twentieth of July Two Thousand Twenty Four

| | | | |
|---|---|---|---|
| নাম | : মোঃ হাছান মিয়া | Name | : Md Hasan Miah |
| মাতা | : আলেহা খাতুন | Mother | : Aleha Khatun |
| মাতার জাতীয়তা | : বাংলাদেশী | Nationality | : Bangladeshi |
| পিতা | : চুন্নু মিয়া | Father | : Chonno Miah |
| পিতার জাতীয়তা | : বাংলাদেশী | Nationality | : Bangladeshi |
| মৃত্যুস্থান | : নরসিংদী, বাংলাদেশ | Place of Death | : Narsingdi, Bangladesh |
| মৃত্যুর কারণ | : হত্যা | Cause of Death (As Per ICD Version) | : Murder |

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
MD. Reman Bhuiyan
Account Assistant Cum-Computer Operator
Nilakhya Union Parishad
Raipura, Narsingdi.

Seal & Signature
Registrar
Ad. Akterozzaman Shamim
Chairman
Nilakhya Union Parishad
Raipura, Narsingdi.

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

## একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

| | | |
|---|---|---|
| নাম | : | মো: হাছান মিয়া |
| জন্ম তারিখ | : | ০৭ আগস্ট ১৯৭৮ |
| জন্মস্থান | : | রায়পুরা, নরসিংদী, পেশা: দিনমজুর |
| পিতার নাম | : | চুন্নু মিয়া (মৃত) |
| মাতার নাম | : | আলেছা খাতুন (মৃত) |
| পেশা | : | কৃষক |
| বিয়ে | : | ১ম - পপি (ডিভোর্স), ২য় - ফুলমালা (ডিভোর্স) |
| সন্তান | : | ১. রহমত উল্লাহ ২. রাকিব মিয়া ৩. আফসানা |
| আহত ও মৃত্যু | : | ২০/০৭/২৪, মেহেরপাড়া ইউনিয়ন, পরিষদের সামনে, বিজিবির গুলিতে শহীদ |
| কবরস্থান | : | নিজ গ্রামে |
| অর্থনৈতিক অবস্থা | : | জমিজমা নেই, সন্তানদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত |

# একটি হোটেল ব্যবসায়ী, একজন পিতা এক সাহসী শহীদের কথা

**শহীদ মোঃ ইসমাইল মোল্লা**

ক্রমিক: ৭৮৪

আইডি: ঢাকা বিভাগ: ১৫৬

### শহীদ পরিচিতি

তাঁর নাম ছিল  মোঃ ইসমাইল মোল্লা। নিঃশব্দ জীবন যাপনকারী এক সাধারণ মানুষ, যিনি ছিলেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, একজন পরিবারের কর্তা, একজন আশাবাদী বাংলাদেশি। কিন্তু ২০২৪ সালের এক নির্মম আগষ্ট দুপুরে, তিনি হয়ে উঠলেন ইতিহাসের অংশ একজন শহীদ।

১৯৫৭ সালের ২ মে, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার দপ্তিয়র ইউনিয়নের মাইঝাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ইসমাইল মোল্লা। পিতা মৃত জয়েন মোল্লা ও মাতা মৃত জহিরন বেগমের বড় আদরের সন্তান ছিলেন তিনি। দারিদ্র্য ঘেরা এক গ্রামীণ জীবনে তাঁর শৈশব কেটেছিল নিঃস্বভাবে, কিন্তু অসীম আত্মসম্মানবোধ নিয়ে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card
নাম
মোঃ ইসমাইল মোল্লা
Name
MD ISMAIL MOLLA
পিতা
মোঃ জয়েন মোল্লা
মাতা
মোসাঃ জহিরন
Date of Birth 02 May 1957
NID No 644 056 1295

### কর্মজীবন

জীবিকার তাগিদে তিনি গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন রাজধানীর কাছাকাছি ঢাকা জেলার সাভারের নবীনগর এলাকায়। সেখানে পলাশবাড়ী মহল্লায় শুরু করেন ছোট একটি খাবারের হোটেল। তাঁর হোটেল ছিল শ্রমজীবী মানুষের আস্থার জায়গা। স্বচ্ছতা ও সৎভাবে ব্যবসা করাটাই ছিল তার অহংকার। স্ত্রী মোসা: সাজেদা গৃহিণী, সংসারের গোছালো নারী। চার সন্তানের মধ্যে দুই কন্যার বিয়ে হয়ে গেছে। বড় ছেলে সজিব প্রাইভেট গাড়ি চালায়, আর ছোট ছেলে সুমন অটো চালিয়ে পরিবারের খরচ চালাতে সহায়তা করে।

### অর্থনৈতিক বিবরণ

ইসমাইল মোল্লার দাদার বাড়িতে মাত্র ৯ শতাংশ জমি, যার ওপর একটি ভাঙ্গা টিনের ঘর। অথচ পাঁচ সদস্যের পরিবার নিয়ে এখন তারা থাকে নবীনগরের পল্লীবিদ্যুৎ এলাকায় একটি ভাড়া বাসায়। সেখানে বাসা ভাড়া, বাজার খরচ আর ছেলেদের অসংগঠিত উপার্জন মিলিয়ে তাদের জীবন প্রতিনিয়তই টালমাটাল। ইসমাইল মোল্লা ছিলেন পরিবারের চালিকাশক্তি। তার মৃত্যু শুধু একজন মানুষের প্রস্থান নয় একটি পরিবারের স্বপ্নের পতন।

### আন্দোলন যোগদান

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাস এক অগ্নিঝরা সময়। গোটা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন। "হাসিনার পদত্যাগ" দাবিতে রাস্তায় নামে ছাত্র-জনতা। ইসমাইল মোল্লা সরাসরি রাজনীতিতে না থাকলেও দেশের চলমান অবিচারের প্রতিবাদ করতেন নিজের মত করে। বাইপাইল চত্বরে তাঁর হোটেল ছিল ছাত্রদের অন্যতম ভরসাস্থল। তিনি নিজেও মনে-প্রাণে আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

### যেভাবে তিনি শহীদ হলেন

৫ আগস্ট, ২০২৪। সকাল ১১টা বাজে। বাইপাইল চত্বরে তখন উত্তেজনা তুঙ্গে। চারপাশে প্রতিবাদ, স্লোগান, মানুষের ঢল। আর ঠিক তখনই শুরু হয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। পুলিশ বাহিনী, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সন্ত্রাসীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের উপর। হঠাৎ করেই শুরু হয় ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ। ইসমাইল মোল্লা তখন নিজের হোটেলে অবস্থান করছিলেন। আন্দোলনের গর্জনে আশঙ্কা করছিলেন কিছু একটা হবে। একপর্যায়ে সন্ত্রাসীরা তাঁর হোটেলে ঢুকে পড়ে, ভাংচুর চালায় এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে তাঁর পা পুড়ে যায়। তাঁর ছেলেরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাইপাইল থেকে সাভারের হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তা ছিল রণক্ষেত্র। গুলির শব্দে আকাশ ভারী, সেনাবাহিনী সাধারণ মানুষের চলাচলে বাধা দিচ্ছে। চরম কষ্টে, রক্তাক্ত শরীরে, বিকেল ৩টার সময় তাঁকে গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে নেওয়া হয় কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। ডাক্তার জানিয়ে দেন, মো: ইসমাইল মোল্লা আর নেই।

### নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

তাঁর স্ত্রী মোসা: সাজেদা কাঁদতে কাঁদতে বলেন- "উনি তো কারো ক্ষতি করেননি। সারা জীবন কষ্ট করে সংসার চালাইছে। ওর অপরাধ কী ছিল? আমার বাচ্চাগুলার কি হবে এখন?"

### ছেলে সজিব বলেন

"বাবারে হাসপাতালে নেওয়ার সময় পুলিশের গুলির শব্দ আর সেনাবাহিনীর ভয় দেখানো সব মিলায়া আমরা থেমে গেছিলাম। যদি একটু আগে পারতাম নিতে... এখন সারাজীবন আফসোস কইরা যাইতে হইব।"

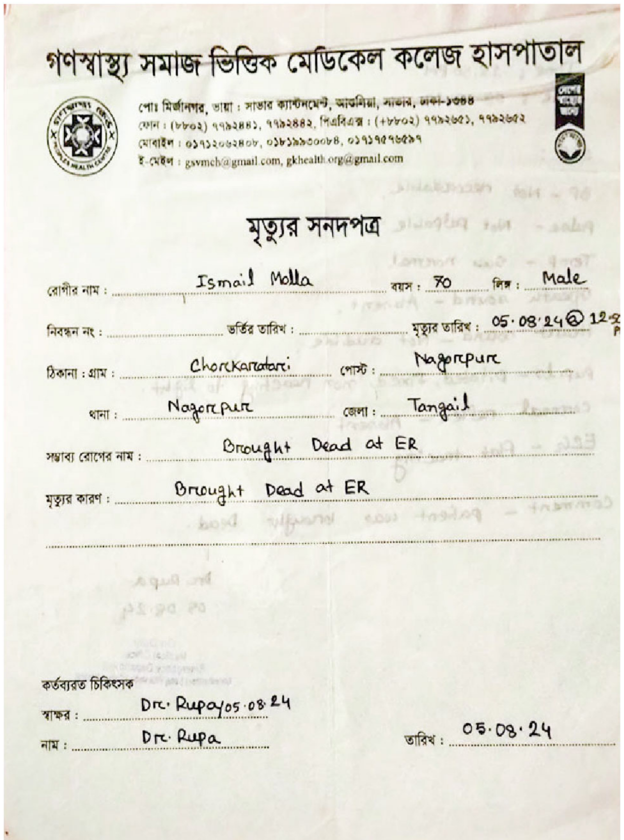
গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
পোঃ মির্জানগর, ভায়া : সাভার ক্যান্টনমেন্ট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪
ই-মেইল : gsvmch@gmail.com, gkhealth.org@gmail.com

মৃত্যুর সনদপত্র

রোগীর নাম : Ismail Molla বয়স : 70 লিঙ্গ : Male
নিবন্ধন নং : ভর্তির তারিখ : মৃত্যুর তারিখ : 05.08.24 @ 12...
ঠিকানা : গ্রাম : Chorkaratari পোস্ট : Nagorpur
থানা : Nagorpur জেলা : Tangail
সম্ভাব্য রোগের নাম : Brought Dead at ER
মৃত্যুর কারণ : Brought Dead at ER

কর্তব্যরত চিকিৎসক
স্বাক্ষর : Dr. Rupa 05.08.24
নাম : Dr. Rupa তারিখ : 05.08.24

**অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা**

**এই পরিবার এখন দিশেহারা।**

**প্রস্তাবনা-১ :** শহীদের ছোট ছেলে সুমনের জন্য একটি অটো রিকশা কিনে দিলে তার রোজগার নিশ্চিত হবে।

**প্রস্তাবনা-২:** শহীদ পরিবারের জন্য মাসিক ১০,০০০/- টাকা সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

**প্রস্তাবনা-৩:** গ্রামের বাড়িতে একটি টিনের ঘর তৈরি করে দিলে তারা অন্তত মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবে।

**শেষ কথা**

মো: ইসমাইল মোল্লা শুধু একজন ব্যবসায়ী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি পরিবারের সাহস, নির্ভরতা আর নিরব প্রতিবাদ। রাষ্ট্রের নির্মম আক্রমণে তার জীবন কেড়ে নেওয়া হলেও, ইতিহাস তাকে ভুলবে না। তার মৃত্যু আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এ দেশে প্রতিবাদ করাও অপরাধ। আর সেই অপরাধেই শহীদ হতে হয়।

## একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

| | | |
|---|---|---|
| নাম | : | মো: ইসমাইল মোল্লা |
| জন্ম | : | ০২ মে ১৯৫৭, মাইঝাইল, দপ্তিয়র, নাগরপুর, টাঙ্গাইল |
| পেশা | : | হোটেল ব্যবসায়ী |
| স্ত্রী | : | মোসা: সাজেদা |
| সন্তান | : | ৪ জন (২ ছেলে, ২ মেয়ে) |
| শহীদ হওয়ার তারিখ | : | ০৫ আগস্ট ২০২৪ |
| আক্রমণকারীরা | : | পুলিশ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগ |
| মৃত্যুর কারণ | : | আগুনে পুড়ে আহত, চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু |
| দাফনস্থান | : | পলাশবাড়ী, বাইপাইল, নবীনগর, ঢাকা |

**শহীদ হৃদয় মিয়া**
ক্রমিক: ৭৮৫
আইডি: ময়মনসিংহ বিভাগ: ০৮০

# একটি গুলি নিঃস্ব পরিবার ও এক অপূর্ণ স্বপ্ন

**জন্ম ও পরিচিতি**

ছোটখাটো গড়ন, কাঁধে স্কুলব্যাগ, আর মাঝে মাঝে হাতে থাকত পিকআপ ভ্যানের ঝুলন্ত বার। এমন একটি জীবনই ছিল হৃদয় মিয়ার। তবে ২০ জুলাই ২০২৪ এর বিকেলের পর, হৃদয়ের পরিচয় শুধু এতটুকুই নয় সে এখন একটি নাম, একটি প্রতিবাদের প্রতীক, একজন শহীদ।ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার সাখুয়া ইউনিয়নের গন্ডখোলা গ্রামে ২০০৯ সালের ৫ জানুয়ারি জন্ম নেয় হৃদয় মিয়া। বাবা সুলতান মিয়া, যিনি বর্তমানে কর্মহীন ও শারীরিকভাবে দুর্বল, বয়স ৫২। মা সাজেদা, একজন গৃহিণী, বয়স ৫০। সংসারের হাল ধরে রেখেছেন হৃদয়ের বড় ভাই মো. গোলাপ ইসলাম, যিনি নিজেও বেকার। হৃদয় গাছা উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছিল। তবে লেখাপড়ার পাশাপাশি পেটের দায়ে পিকআপ ভ্যানে হেলপারের কাজ করত সে। নিজস্ব কোনো ঘর নেই, দাদার ভাইয়ের বাড়িতে ঠাঁই। দাদার কিছু সাহায্যে কোনোভাবে চলে সংসার। ভাত, নুন আর ঘামে ভেজা দিনগুলোতে হাসিমুখে কাটিয়ে দিত হৃদয়। স্বপ্ন ছিল স্কুল পাশ করে ভাইকে অটো কিনে দেবে, বাবা-মাকে দুঃখ থেকে মুক্তি দেবে।

**কর্মজীবনের বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক বিবরণ**

হৃদয়ের জীবনটা শুরু থেকেই সংগ্রামের। দিনভর স্কুল শেষে, অথবা ছুটির দিনে সে গাজীপুরের রাস্তায় পিকআপে হেলপারের কাজ করত। কখনও মালামাল তোলা, কখনও যাত্রীদের ডেকে ওঠানো এইসব ছোটখাটো কাজই তার বড় আশার জ্বালানি ছিল। ঘরে ভাত রান্না হবে কিনা তা নির্ভর করত হৃদয়ের রোজগারের ওপর। দাদার ভাইয়ের ছোট্ট টিনের ঘরে গাদাগাদি করে একসাথে রাত কাটাত তারা। কিন্তু মুখে কোনো অভিযোগ ছিল না। মা বলতেন- **"আমার ছেলে খুব চুপচাপ, তবু সংসারের সব কাজ বুঝে করে। ঈদের নতুন জামা নেয়নি, ভাইয়ের জন্য রেখেছিল।"**

**আন্দোলন যোগদান ও প্রেক্ষাপট: জুলাই-আগস্ট ২০২৪**

২০২৪ সালের জুলাই মাস ছিল বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার উত্তাল প্রতিবাদের মাস। দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ বাহিনীর দমন-পীড়ন, ভোটাধিকার হরণের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে তরুণরা। গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ সব জায়গায় ছাত্ররা রাস্তায় নামে। এই আন্দোলনে হৃদয়ও ছিল প্রথম সারির একজন। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করত **"এইভাবে আর থাকা যায় না ভাই, কিছু তো করতে হবে।"** ২০ জুলাই ২০২৪, শনিবার। সকাল ১০টায় বাসা থেকে বের হয় হৃদয়। মা বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন-**"বাবা দুপুরে আসবি তো?"** হৃদয় হেসে বলেছিল- **"আসব মা, আগে একটু দেখে আসি কী হয়।"** সেই **'দেখে আসা'**ই ছিল তার শেষ যাওয়া।

**শহীদ হওয়ার দিন: ২০ জুলাই ২০২৪**

বিকেল ৫.৩০টা। গাজীপুরের গাছা রোডের মাথায় ছাত্রদের উপর পুলিশ হঠাৎ গুলি চালায়। চারদিক ধোঁয়া আর চিৎকারে ভরে যায়। সবার মাঝে পড়ে থাকে একটি রক্তাক্ত দেহ হৃদয় মিয়া। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নিথর হয়ে যায় সে। সময় ছিল ৫.৩৫ মিনিট।

স্থানীয়রা জানায়-**"ও বাঁচতে পারত, কিন্তু পুলিশ কাউকে কাছে আসতে দেয়নি।"**

হৃদয়ের নিথর দেহটি কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হয় বড়বাড়ীর নুরে আকসা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের কবরস্থানে। সেই মাটির নিচেই ঘুমিয়ে আছে এখন সে, যে একদিন পেটের ক্ষুধায় পিকআপে উঠেছিল, আর প্রতিবাদের তীব্রতায় শহীদ হয়ে গেছে।

**পরিবারের প্রস্তাবনা**

মা সাজেদা চোখের জল মুছতে মুছতে বলেন- **"হৃদয় মারা গেছে, তবু আমাদের সংসার তো রয়ে গেছে। ভাইটা কিছু করতে পারে না। কেউ যদি একটা অটো কিনে দিত ওর জন্য এইটুকুই চাওয়া।"** একটি অটোভ্যান পেলে হৃদয়ের ভাই সংসারটা চালাতে

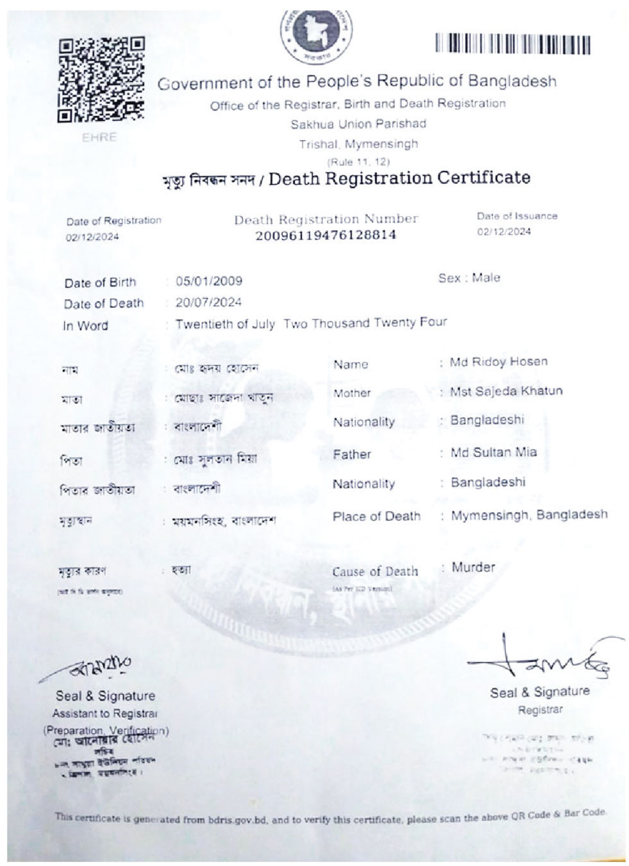

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Sakhua Union Parishad
Trishal, Mymensingh
(Rule 11, 12)

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration 02/12/2024 | Death Registration Number 20096119476128814 | Date of Issuance 02/12/2024

Date of Birth : 05/01/2009 | Sex : Male
Date of Death : 20/07/2024
In Word : Twentieth of July Two Thousand Twenty Four

| | | | |
|---|---|---|---|
| নাম | : মোঃ হৃদয় হোসেন | Name | : Md Ridoy Hosen |
| মাতা | : মোছাঃ সাজেদা খাতুন | Mother | : Mst Sajeda Khatun |
| মাতার জাতীয়তা | : বাংলাদেশী | Nationality | : Bangladeshi |
| পিতা | : মোঃ সুলতান মিয়া | Father | : Md Sultan Mia |
| পিতার জাতীয়তা | : বাংলাদেশী | Nationality | : Bangladeshi |
| মৃত্যুস্থান | : ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ | Place of Death | : Mymensingh, Bangladesh |
| মৃত্যুর কারণ | : হত্যা | Cause of Death (As Per ICD Version) | : Murder |

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
মোঃ আনোয়ার হোসেন

Seal & Signature
Registrar

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

পারবে। বাবা-মায়ের বাকি জীবনটুকু হয়তো একটু শান্তিতে কাটবে। এইটুকু সহযোগিতাই হৃদয়ের আত্মত্যাগের প্রতি আমাদের দায়মুক্ত শ্রদ্ধা হতে পারে।

**শেষ কথা**

হৃদয়ের গল্প আমাদের কেবল কাঁদায় না, আমাদের বিবেকেও নাড়া দেয়। একটা রাষ্ট্র কতোটা নিষ্ঠুর হলে, সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্র পেটের দায়ে হেলপার হয়, আর স্বপ্নের দাবিতে আন্দোলন করে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়?

এই গল্প যেন হারিয়ে না যায় কাগজে নয়, হৃদয়ে রয়ে যাক চিরকাল। একটি জীবন নিভে গেল, কিন্তু তার স্বপ্ন আলো হয়ে রয়ে গেছে আমাদের পথচলায়।

## একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

| | |
|---|---|
| পূর্ণ নাম | : হৃদয় মিয়া |
| জন্ম তারিখ | : ০৫/০১/২০০৯ |
| জন্মস্থান | : ত্রিশাল, ময়মনসিংহ |
| শ্রেণি | : সপ্তম |
| বিদ্যালয় | : গাছা উচ্চ বিদ্যালয় |
| পেশা | : ছাত্র ও পিকআপ হেলপার |
| পিতার নাম | : সুলতান মিয়া, পেশা ও বয়স: বেকার, ৫২ |
| মায়ের নাম | : সাজেদা, পেশা ও বয়স: গৃহিণী, ৫০ |
| স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা | : গ্রাম: গন্ড খোলা, ইউনিয়ন: সাখুয়া, থানা: ত্রিশাল, জেলা: ময়মনসিংহ |
| পরিবারের সদস্য | : ভাই: ১,মোঃ গোলাপ ইসলাম (২৬), বেকার |
| | আহত হওয়ার তারিখ: ২০/০৭/২৪, সময়: বিকাল ৫.৩০ টা |
| স্থান | : গাছা রোডের মাথা, বড়বাড়ী, গাজীপুর |
| শহীদ হওয়ার তারিখ | : ২০/০৭/২০২৪, সময়: বিকেল ৫.৩৫ মিনিট |
| আক্রমণকারী | : পুলিশ বাহিনী |
| কবরস্থান | : নুরে আকসা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ কবরস্থান, গাছা রোড, বড়বাড়ী, গাজীপুর |
| অর্থনৈতিক অবস্থা | : দারিদ্র সীমার নিচে, নিজস্ব জমি/ঘর নেই |

# রক্তজাগানো সাহসের নাম : শহীদ মো: বিপ্লব

# একটি আলো জ্বালানোর প্রয়াস

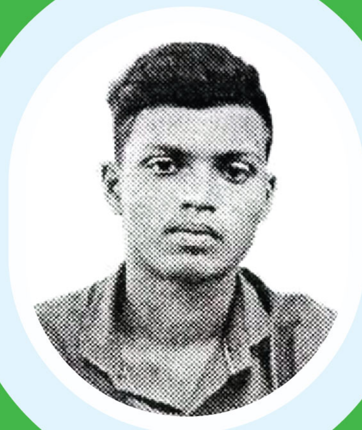

**শহীদ মো: বিপ্লব**

ক্রমিক: ৭৮৬

আইডি: ঢাকা বিভাগ: ১৫৭

**শহীদ পরিচিতি**

মো: বিপ্লব, নামের মধ্যেই যেন প্রতিবাদের এক অগ্নিশিখা লুকিয়ে ছিল। জন্মেছিলেন ২০০৯ সালের ৫ জানুয়ারি, টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী থানার কদমতলী গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে। পিতা আ: খালেক জীবনের কঠিন সংগ্রামে অন্যের জমিতে কাজ করে সংসার চালাতেন। মা বিলকিস বেগম ছিলেন একজন গৃহিণী। সংসারে ছিল আরেকটি ছোট মুখ ভাই বিজয়, বয়স মাত্র ৮ বছর, পড়ছে নার্সারিতে প্রত্যাশা মডেল স্কুলে।

**জন্ম ও কর্ম**

বিপ্লব ছোটবেলা থেকেই জীবনকে দেখেছিলেন অভাবের আয়নায়। বাবার ঘামে ভেজা পরিশ্রম, মায়ের ক্লান্ত চোখ, আর ছোট ভাইয়ের অসহায় চাহনিই তাকে জীবনসংগ্রামে জয়ের দৃপ্ত সংকল্প দিয়েছিল। তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করতেন গাজীপুরের মাওনা এলাকায় কোথাও কোনো কারখানায়, কখনো দোকানে  একমাত্র উদ্দেশ্য, বাবাকে আর দিনমজুরির জীবন থেকে মুক্ত করা, মাকে ভালো একটা চিকিৎসা ও স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া, আর ছোট ভাইকে মানুষ করে গড়া। এই শিশু-কিশোরটি জীবনের দায়িত্ব বুঝেছিল অপ্রাপ্তবয়স্ক বয়সেই।

**অর্থনৈতিক বিবরণ**

পরিবারটি ছিল দরিদ্র নিঃসন্দেহে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। আঃ খালেকের কাজের উপরই ছিল পুরো পরিবারের ভরণপোষণ। বিপ্লব মাওনায় গিয়ে কাজ করে যতটুকু আয় করতেন, তা মায়ের হাতে পাঠিয়ে দিতেন। ফোনে বলতেন, "মা, বিজয়রে মানুষ করবা। আমি তুমারে আর আব্বারে কষ্ট করতে দিব না।" এই কথাগুলিই এখন মা'র কানে ঘোরে, চোখে অশ্রুর নদী বয়ে যায়।

**আন্দোলন যোগদান ও জুলাই-আগস্টের প্রেক্ষাপট**

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট সময়টা ছিল এক রক্তক্ষরা অধ্যায়ের সূচনা। দেশের মানুষ বঞ্চনা, শোষণ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল। ছাত্ররা পথে নেমেছিল, গরিব শ্রমিকরা তাদের কণ্ঠে সুর মিলিয়েছিল। ৫ আগস্ট ছিল গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত দিন। গাজীপুরের মাওনা চৌরাস্তা ছিল ছাত্র-জনতার দখলে। সরকারবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল ময়মনসিংহ-ঢাকা মহাসড়ক। সেদিন কারখানাগুলো বন্ধ ছিল। বিপ্লবও সহকর্মীদের সঙ্গে বিজয় মিছিলে যোগ দেন। হৃদয়ে তার স্বপ্ন, চোখে আগামীর পথ। কিন্তু সেই পথ রক্তাক্ত হলো হঠাৎই।

**যেভাবে তিনি শহীদ হলেন**

বিকেল সাড়ে তিনটা। বিজয় মিছিল পৌঁছায় পল্লী বিদ্যুৎ মোড়ে। এমন সময় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের লোকজনের উসকানিতে পুলিশ বাহিনী মিছিলে গুলি চালায়। একের পর এক গুলি ছুটে আসে যেন বজ্রপাতের মতো। একটি গুলি বিপ্লবের চোখের সামনে ঢুকে মাথা ভেদ করে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। বন্ধুরা দৌড়ে নিয়ে যায় মাওনা আল-হেরা মেডিকেল সেন্টারে। সেখানেই চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঠিক বিকাল সাড়ে তিনটায়  একই সময়ে যখন গুলি লেগেছিল  হারিয়ে যায় একটি তরতাজা প্রাণ, একটি স্বপ্ন, একটি প্রতিজ্ঞা।

**প্রিয়জনের অনুভূতি**

বাবা আঃ খালেক কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "সংসারের হাল ধরা ছেলেকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে গেছি। সে সবসময় আমাদের খবর নিত। ছেলের শোকে ওর মা কাতর। আমি সরকারের কাছে

অনুরোধ জানাচ্ছি, আমাদের সহযোগিতা করা হোক। ছেলের হত্যার বিচার চাই।”

**প্রতিবেশী ইকবাল হোসেন বলেন**

“ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, অনিয়ম-অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবসময় সোচ্চার ছিল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বিজয় মিছিলে গুলিতে শহীদ হয়েছে সে। তার পরিবার মামলা করার চেষ্টাও করতে পারেনি, কারণ তারা খুবই দরিদ্র।”

বিপ্লবের মৃত্যু একটি সংখ্যা নয়, এটি একটি সময়ের প্রতীক। তার রক্ত শুধু একটি তরুণ প্রাণের অবসান নয়  বরং তা জাতিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, “আর কত প্রাণ গেলে আমরা ন্যায়ের পথে ফিরব?” তার সাহসিকতা, আত্মত্যাগ এবং আদর্শ একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে, যেটি আমাদের ভবিষ্যৎ আন্দোলন-সংগ্রামে আলোকবর্তিকা হয়ে জ্বলতে থাকবে। আল্লাহ যেন তাঁকে শহীদের মর্যাদা দান করেন। আমিন।

**প্রস্তাবনা**

১. শহীদ বিপ্লবের বাবার জন্য একটি ছোট ব্যবসার ব্যবস্থা করা হোক, যেন তিনি পরিবার নিয়ে সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারেন।

২. শহীদের পরিবারের জন্য সরকার বা সমাজের পক্ষ থেকে মাসিক ১৫,০০০ টাকা সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

৩. শহীদের ছোট ভাই বিজয়ের জন্য শিক্ষা বৃত্তি চালু করা হোক, যেন বিপ্লবের অসম্পূর্ণ স্বপ্ন কিছুটা হলেও পূর্ণ হয়।

## একনজরে শহীদ প্রোফাইল

| | |
|---|---|
| নাম | : মো: বিপ্লব |
| জন্ম তারিখ | : ০৫/০১/২০০৯ |
| জন্মস্থান | : টাঙ্গাইল |
| পেশা | : চাকুরিজীবি, ছাত্র |
| স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা | : গ্রাম: কদমতলী, ইউনিয়ন: বীরতলা: থানা: ধনবাড়ী: জেলা: টাঙ্গাইল |
| পিতার নাম | : আ: খালেক |
| পেশা | : কৃষক |
| মায়ের নাম | : বিলকিস বেগম |
| পেশা | : গৃহিণী |
| পরিবারের সদস্য | : ভাই: ১, মোঃ বিজয়, বয়স: ০৮, প্রত্যাশা মডেল স্কুল, নার্সারী |
| ঘটনার স্থান | : মাওনা, গাজীপুর |
| আক্রমণকারী | : পুলিশ বাহিনী |
| আহত হওয়ার তারিখ | : তারিখ: ০৫/০৮/২৪ |
| সময় | : বিকাল ৩.৩০ মিনিট |
| শহীদ হওয়ার তারিখ | : ০৫/০৮/২০২৪, আল-হেরা মেডিকেল সেন্টার |
| সময় | : বিকাল ৩.৩০ মিনিট |
| শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান | : ০৬/০৮/২০২৪ নিজ গ্রামে কদমতলীতে দাফন করা হয় |

# একজন সিএনজি চালক থেকে গণআন্দোলনের শহীদ

## মো: শাহজাহান মিয়া

ক্রমিক: ৭৮৭

আইডি: সিলেট বিভাগ: ০৩৪

### শহীদ পরিচিতি

মো: শাহজাহান মিয়া। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ সিএনজি চালক। কিন্তু তার মৃত্যু তাকে করে তুলেছে অসাধারণ। বেঁচে থাকাকালীন জীবনের প্রতিটি দিন তিনি কাটিয়েছেন পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে। আজ তিনি নেই। কিন্তু তার রক্তে ভেজা ভূমি গাইছে তার বীরত্বের গান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ শাহজান মিয়া
Name: MD. SHAJAN MIAH
পিতা: মোঃ আরস আলী
মাতা: রাবিয়া বেগম
Date of Birth: 03 Feb 1997
ID NO: 5556450772

**জন্ম ও শৈশব**

শাহজাহান মিয়ার জন্ম ১৯৮০ সালে মৌলভীবাজার জেলার ছোট্ট গ্রাম সনকাঁপনে। তাঁর পিতা আরশ আলী মিয়া, মা রাবেয়া খাতুন। একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারে বেড়ে ওঠা। বয়স যখন কিশোর, তখন থেকেই সংসারের হাল ধরেন। স্বপ্ন ছিল, একদিন পরিবারের মুখে হাসি ফোটাবেন, সন্তানদের স্কুলে পাঠাবেন, মা-বাবাকে আর কষ্ট করতে দেবেন না।

**কর্মজীবন**

দুঃখ-দারিদ্র তাকে কখনো দমাতে পারেনি। জীবনের কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে তিনি সিলেটে চলে যান রোজগারের জন্য। সেখানে সিএনজি চালিয়ে সামান্য আয় করতেন। বর্তমান ঠিকানা ছিল ধরাতেপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট। সেই আয়েই চলত সংসার বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে। প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে বাড়ি ফিরতেন মাঝেমাঝে। পরিবারের মুখে হাসি দেখতেন আর নিজের ক্লান্তি ভুলে যেতেন। তাঁর আট বছরের ছেলে সম্রাট পড়ে কওমি মাদ্রাসার নার্সারিতে। তার মেয়ে সায়মা আর কোনদিন বাবার মুখ দেখতে পাবে না।

**অর্থনৈতিক বিবরণ**

নিজেদের কোনো জমি-জমা ছিল না। সিলেটে ভাড়া বাসায় থাকতেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন শাহজাহান। তাঁর ভাই, যিনি দুবাই প্রবাসী, মাঝেমধ্যে সাহায্য করতেন। দিন চলে যেত অনেক কষ্টে। তাঁর মৃত্যুতে পুরো পরিবার যেন ছিন্নমূল হয়ে গেছে।

**আন্দোলন যোগদান ও প্রেক্ষাপট**

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট। দেশজুড়ে শুরু হয় কোটা সংস্কার আন্দোলন। বিচারহীনতা, বৈষম্য, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে উঠেছিল তরুণদের গর্জন। এই আন্দোলন রূপ নেয় এক গণঅভ্যুত্থানে। পতন ঘটে সাড়ে ১৫ বছরের দুঃশাসনের। ৫ আগস্ট দেশজুড়ে আনন্দ মিছিল হয়। নিরীহ মানুষ, শ্রমজীবী, ছাত্র, শিক্ষক সবাই আনন্দে ফেটে পড়ে। শাহজাহান মিয়াও এই আনন্দের শরিক হতে বেরিয়ে পড়েন। তিনি শুধু একজন সিএনজি চালক ছিলেন না, ছিলেন এই দেশের একজন জাগ্রত নাগরিক। যিনি বিশ্বাস করতেন এই পরিবর্তনের ঢেউ তার জীবনেও আলো আনবে।

**যেভাবে তিনি শহীদ হন**

দক্ষিণ সুরমা থানার সামনে আনন্দ মিছিল হয়। মিছিলের স্রোত যখন থানার ফটক ছুঁয়ে যায়, তখন পুলিশ গুলিবর্ষণ শুরু করে। বিনা উস্কানিতে, শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলির হুলস্থুল পড়ে যায়। শাহজাহান মিয়াও ছিলেন সেই মিছিলে। বিকাল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে, হঠাৎ গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। সেখানেই বিনা চিকিৎসায় তার প্রাণ যায়। এমনকি লাশটুকুও তার পরিবার ফিরে পায়নি। পুলিশ তার মরদেহ গুম করে দেয়।

শোকস্তব্ধ পরিবার আজও খুঁজে ফিরছে প্রিয় সন্তানের লাশ। তার মৃত্যুর ঠিক এক সপ্তাহ পর, ১২ আগস্ট, জন্ম নেয় তার মেয়ে সায়মা। বাবার মুখ দেখার আগেই সে হয়ে ওঠে পিতৃহীন।

# উৎসব নয়, শোকে ঈদ কাটল শহীদ শাহজাহানের পরিবারের

**ইসমাইল মাহমুদ, মৌলভীবাজার**

প্রকাশ : ০১ এপ্রিল ২০২৫ ১৪:১১ পিএম

ছেলে শহীদ শাহজাহানের ছবি হাতে বাবা আরশ আলী। প্রবা ফটো

**২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে গড়ে ওঠা গণঅভ্যুত্থানে দেড় সহস্রাধিক প্রাণ বিসর্জন দেয়। শেখ হাসিনার সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের পতনের পর ৫ আগস্ট দেশের বিভিন্ন স্থানে আনন্দ মিছিলে গিয়েও প্রাণ হারান অনেকে। তাদেরই একজন মৌলভীবাজারের শাহজাহান মিয়া।**

সিএনজি অটোরিকশা চালক শাহজাহান মিয়া মৌলভীবাজার সদর উপজেলার ১ নম্বর আমতৈল ইউনিয়নের সনকাপন গ্রামের বাসিন্দা হলেও জীবিকার প্রয়োজনে সিলেটের দক্ষিণ সুরমার ধরাতেপুর গ্রামে বসবাস করতেন। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। গত বছরের ঈদে পরিবারের জন্য নতুন পোশাক ও খাবার নিয়ে বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন স্বজনরা। কিন্তু এবারের ঈদে সেই আনন্দ ম্লান হয়ে গেছে।

গত ৫ আগস্ট সরকারের পতনের খবরে শাহজাহান আনন্দ মিছিলে যোগ দেন। মিছিলটি দক্ষিণ সুরমা থানার ফটক ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করার পর পুলিশের এলোপাতাড়ি গুলিতে তিনি নিহত হন। মৃত্যুর সময় তার স্ত্রী ছিলেন সন্তানসম্ভবা। তার মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর ১২ আগস্ট জন্ম নেয় তার কন্যাসন্তান, যে বাবার মুখ দেখার আগেই এতিম হয়ে যায়।

পরিবারের সদস্যরা এখনো শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে দিশেহারা পুরো পরিবার। এবারের ঈদ তাদের জন্য আর উৎসবের নয়, বরং বেদনার প্রতীক হয়ে এসেছে। শাহজাহানের বাবা আরশ আলী বলেন, "আগের ঈদগুলোতে আমাদের পরিবার ছিল আনন্দে ভরপুর। এবার সেই আনন্দ নেই, কেবল কান্না আর শূন্যতা। আমার ছেলে সিলেটে সিএনজি চালিয়ে সংসার চালাতো, ঈদের আগের দিন বাড়ি ফিরতো। এবার সে আর নেই, আমরা তার লাশটাও পাইনি।"

প্রতিবেশীরা জানান, শাহজাহানের অনুপস্থিতিতে তার পরিবার চরম কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. আব্দুর রহমান বলেন, শাহজাহান মিয়ার পরিবার এখন অসহায়। তার সাত মাস বয়সী শিশুসন্তান রয়েছে। এলাকাবাসী সাহায্য করার চেষ্টা করছে, তবে সরকারের উচিত এই পরিবারকে সহযোগিতা করা।

**পরিবারের কান্না, প্রতিবেশীর কষ্ট**

শাহজাহান মিয়ার পিতা আরশ আলী মিয়া বলেন- "গত বছরের ঈদেও ছিল আমাদের পরিবারের আনন্দ। এবার শুধু কান্না। আমার ছেলে আর আসবে না। ঈদের আগের দিন আমরা তার জন্য অপেক্ষা করতাম। এবার সেই দিনটা এলো, কিন্তু ছেলে আসেনি। বুকটা ফেটে যায়। আমরা ভিডিওতে দেখেছি, কিভাবে আমার ছেলেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আমি ছেলে হত্যার বিচার চাই"

প্রতিবেশী জাহানারা বেগম বলেন- "সিলেটে সিএনজি চালিয়ে কোনোমতে চলত ওর সংসার। প্রতি বছর ঈদের আগের দিন নতুন জামা নিয়ে বাড়ি আসত। এ বছর সে নেই। ওর স্ত্রী ও সন্তানদের দিকে তাকালে চোখ ভিজে আসে।"

**পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ**

নিজেদের কোনো জমি-জমা নেই। সিলেটে বাসা ভাড়া করে থাকতেন। ভাইদের সহযোগিতায় তার পরিবার চলে। এক ভাই দুবাই থাকে। সে সহযোগীতা করে শহীদের পরিবারকে। পরিবারের সদস্যরা এখনো শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে দিশেহারা পুরো পরিবার।

**ঘটনা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ**

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে গড়ে ওঠা গণঅভ্যুত্থানে দেড় সহস্রাধিক প্রাণ বিসর্জন দেয়। শেখ হাসিনার সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের পতনের পর ৫ আগস্ট দেশের বিভিন্ন স্থানে আনন্দ মিছিলে গিয়েও প্রাণ হারান অনেকে। তাদেরই একজন মৌলভীবাজারের শাহজাহান মিয়া। ০৫/০৮/২০২৪ তারিখে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফলে দুপুর বেলায় সরকার পতন হয়। পতনের খবরে আনন্দ মিছিল বের হয়। সিএনজি চালক শাহজাহান মিয়া ও সেই মিছিলে যোগ দেয়। মিছিল দক্ষিণ সুরমা থানার ফটক ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করলে পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলি করে। পুলিশের গুলিতে শাহজাহান মিয়া নিহত হন। মৃত্যুর সময় তার স্ত্রী ছিলেন সন্তানসম্ভবা। তার মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর ১২ আগস্ট জন্ম নেয় তার কন্যাসন্তান, যে বাবার মুখ দেখার আগেই এতিম হয়ে যায়। পুলিশ তার লাশটাও গুম করে ফেলে। পরিবার আজও তার লাশ খুঁজে পায়নি।

**শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়র অনুভূতি**

শহীদ শাহজাহান মিয়ার ছোট কুটিরে গেলে তার বাবা আরশ আলী মিয়া বলেন, 'গত বছরের ঈদেও আমাদের পরিবারে ছিল আনন্দ আর আনন্দ। ছিল পরিপূর্ণ একটি পরিবার। কিন্তু আমাদের আনন্দ আর নেই। ছেলে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে ফেলেছি বেঁচে থাকার প্রেরণাও। এবার ঈদের দিনে ছেলের জন্য শুধুই কেদেছি। আমার ছেলে সিলেটে থেকে সিএনজি চালাত। প্রতি সপ্তাহে বা পনের দিনে বাড়িতে এসে পরিবারের খরচ দিয়ে যেত। আর ঈদের আগের দিন আমরা সন্ধ্যা হলেই অপেক্ষায় থাকতাম কখন ছেলে বাড়িতে আসবে, একসাথে সবাই মিলে ঈদ করব। কিন্তু এ বছর ছেলে আমার নেই। বুকটা শুন্য করে দিয়ে গেছে। গত বছর ৫ আগস্টের সরকার পতনের পর সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় পুলিশের গুলিতে আমার ছেলে শহীদ হয়। এখনো আমরা আমাদের ছেলের লাশ পাইনি। আমরা ভিডিওতে দেখেছি কিভাবে তাকে গুলি করে মারা হয়েছে।'

শাহজাহান মিয়ার প্রতিবেশি জাহানারা বেগম জানান, 'সিলেটে সিএনজি চালিয়ে কোনো রকম সংসার চালাতো সে। প্রতি বছর ঈদের আগের দিন তার মা ও বাবাসহ পরিবারের সদস্যদের জন্য নতুন কাপড় কিনে আনতো শাহজাহান। এ বছর ঈদে সেতো এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। শাহজাহান এবারের ঈদে আর নেই। তার পরিবারে কিভাবে ঈদের আনন্দ করবে? তার পরিবারটা কষ্টে রয়েছে। তার ও তার পরিবারের জন্য আমাদের খুবই কষ্ট হচ্ছে।'

**প্রস্তবনা**

প্রস্তাবনা-১: ছেলে-মেয়ের জন্য মাসিক খরচ বাবদ ১৫০০০ টাকার সহযোগীতা করা যেতে পারে।

প্রস্তাবনা-২: থাকার জন্য একটি ঘর করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

## একনজরে শহীদ প্রোফাইল

| | |
|---|---|
| নাম | : মো: শাহজাহান মিয়া |
| জন্ম তারিখ | : ১৯৮০ (বয়স:৪৫) |
| জন্মস্থান | : মৌলভীবাজার |
| পেশা | : সিএনজি চালক |
| স্থায়ী ঠিকানা | : গ্রাম: সনকাঁপন, ইউনিয়ন: ৯ নং আমতৈল, থানা: সদর, জেলা: মৌলভীবাজার |
| বর্তমান ঠিকানা | : মহল্লা: ধরাতেপুর, থানা: দক্ষিণ সুরমা, জেলা: সিলেট |
| পিতার নাম | : আরশ আলী (৭৫) |
| মায়ের নাম | : রাবেয়া খাতুন (৬৫) |
| পেশা | : গৃহিণী |
| স্ত্রীর নাম | : ঝর্ণা (২৬) |
| পেশা | : গৃহিণী |
| পরিবারের সদস্য | : ছেলে: ১, মেয়ে: ১ |
| | : ১. সম্রাট, বয়স: ৮, পেশা: ছাত্র, কওমী মাদ্রাসা, শ্রেণি: নার্সারী, সম্পর্ক: ছেলে |
| | : ২. সায়মা, বয়স: ১০ মাস, সম্পর্ক: মেয়ে |
| ঘটনার স্থান | : দক্ষিণ সুরমা থানার সামনে, সিলেট |
| আক্রমণকারী | : পুলিশ বাহিনী |
| আহত হওয়ার তারিখ | : ০৫/০৮/২৪ |
| সময় | : বিকাল ৩-৪ টার মধ্যে, থানার সামনে |
| শহীদ হওয়ার তারিখ | : ০৫/০৮/২৪ |
| সময় | : বিকাল ৩-৪ টার মধ্যে, থানার সামনে |
| শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান | : লাশ পাওয়া যায়নি |

শাহজাহান মিয়া ছিলেন একজন সৎ, পরিশ্রমী, নিরীহ মানুষ। তিনি চেয়েছিলেন শুধু পরিবারের ভালো রাখতে। কিন্তু সময় তাকে নিয়ে গেছে এক ভিন্ন ইতিহাসের পাতায়। তার রক্তে লিখে গেছে একটি গণজাগরণ, একটি পরিবর্তনের গল্প। শাহজাহান মিয়ার মতো মানুষেরা আমাদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্তান যারা রক্ত দিয়ে কিনে এনেছেন মুক্তির ভোর। তার জন্য আমরা কেবল একটি ঘর চাই। তার সন্তানদের জন্য চাই শিক্ষার নিশ্চয়তা। তাহলেই শহীদ শাহজাহান মিয়ার আত্মত্যাগ পূর্ণতা পাবে।

# গণঅভ্যুত্থানে শহীদ হয়ে ওঠার বেদনাহত কাহিনী; রক্তে ভেজা হল রোড -শহীদ মো: আবুল বাশার

**শহীদ মো: আবুল বাশার**

ক্রমিক: ৭৮৮

আইডি: বরিশাল বিভাগ: ০৮৪

### শহীদ পরিচিতি

মো: আবুল বাশার। এক নিভৃত পল্লীর প্রাণখোলা মানুষ। জন্মেছিলেন ১৯৮২ সালের ১ মার্চ, বরগুনার পাথরঘাটায়। ছিলেন একজন সাধারণ ব্যবসায়ী পাথরঘাটা বাজারের এক কোণায় ছোট্ট একটি ফ্লেক্সি ও রিচার্জের দোকান ছিল তার জীবন ও জীবিকার কেন্দ্রবিন্দু। জীবন চলছিল নিরবে, শান্তভাবে। কিন্তু ইতিহাস তাকে ডেকে নিয়েছিল অন্য এক উচ্চতর পরিচয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন শহীদ আবুল বাশার। ইসলামী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে তিনি ছিলেন অনন্য।

### জন্ম ও পরিবার

পাথরঘাটা উপজেলার উত্তর গহরপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আবুল বাশার। বাবা মৃত মতিউর রহমান শিকদার, মা জয়তন নেসা, যিনি এখনও জীবিত, বয়স সত্তর ছুঁয়েছে। মা এক গৃহিণী; তাঁর চোখে আজও জ্বলজ্বল করে ছেলের স্মৃতি। স্ত্রী তানিয়া বেগম, এইচএসসি পাস, গৃহিণী হিসেবে সংসার সামলাতেন নিঃশব্দে। তাদের দুটি সন্তান এক কন্যা ও এক পুত্র। মেয়ে মোছা. জুবাইদা আক্তার, বয়স ১১, পাথরঘাটা আদর্শ গার্লস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। ছেলে মু জুবায়ের, বয়স ৪, নার্সারি পড়ুয়া, পাথরঘাটা মহিলা মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। এই পরিবার ছিল আবুল বাশারের জীবনের ধ্রুবতারা। প্রতিদিন দোকান থেকে ফিরে সন্তানের কপালে চুমু খেয়ে দিন গোনার মানুষটি আওয়ামী রাজনীতির বলি হয়ে শহীদের তালিকায় নাম লেখালেন। রচিত করলেন একটি নির্মম বাস্তবতার ইতিহাস।

### কর্ম ও জীবনযাপন

ছোট্ট একটি রিচার্জের দোকান চালিয়ে সংসার চলত কোনোমতে। নিজের কোনো জমি নেই, সহায়সম্পদও নেই। ভাইয়ের সাহায্যে কোনোরকমে চলছে পরিবারটি। আবুল বাশার কখনও কারও কাছে হাত পাতেননি, নিজের ঘামেই রুটিরুজি করতেন। সন্ধ্যা নামলে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরতেন। ৮ আগস্ট ২০২৪ সাল, সে রাতটাও ছিল তেমনই একটি সাধারণ রাত যদিও তা হয়ে উঠেছিল ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ রাত।

### আন্দোলনের পটভূমি ও যোগদান

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে কোটা সংস্কার আন্দোলন। দেশের তরুণ-তরুণী, ছাত্র-শিক্ষক, পেশাজীবীরা যুক্ত হন এই ন্যায্য দাবির লড়াইয়ে। আন্দোলন রূপ নেয় গণঅভ্যুত্থানে। দেড় হাজারের বেশি মানুষ শহীদ হন এই বিপ্লবে। আবুল বাশার প্রতিবাদে গলা মিলিয়েছিলেন, কথা বলেছিলেন দোকানে আসা শিক্ষার্থীদের পক্ষে। এই ক্ষুদ্র সমর্থনই হয়ে দাঁড়ায় তার মৃত্যুর কারণ।

### যেভাবে তিনি শহীদ হলেন

২০২৪ সালের ৮ আগস্ট, রাত ১০টা। দোকান বন্ধ করে বাড়ির পথে হাঁটছেন আবুল বাশার। পাথরঘাটা হল রোডে পৌঁছাতেই ওঁৎ পেতে থাকা স্থানীয় আওয়ামী সন্ত্রাসী মুছা, সোহেল, সিদ্দিক, সাত্তার তার পথরোধ করে। কথা বলার সুযোগ না দিয়েই তাদের একজন মুখে ধারালো রড ঢুকিয়ে দেয়। বাশার লুটিয়ে পড়েন রক্তাক্ত অবস্থায়। এরপরও সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে যায় অমানবিকভাবে। তিনি ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। চারপাশে ছিল নিস্তব্ধতা, শুধু দুর্বৃত্তদের উল্লাসময় চিৎকার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল পাথরঘাটার বাতাসে। মৃত্যুর পরের দিন নিজ গ্রামে জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়। জানাজায় হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে, বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে। প্রতিবেশী ঈসা বিল্লাহ বলেন: "তিনি ছিলেন সদা হাস্যজ্জ্বল ও মিষ্টভাষী। কখনও রাগ করতেন না কারও সাথে। আমি এই হত্যার বিচার চাই।"

### পরিবার এখন কোথায়?

আজ সেই পরিবার দিশেহারা। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে তারা। মা, স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তান চারটি মুখ প্রতিদিন অপেক্ষা করে সেই মানুষটির, যিনি আর কখনও ফিরবেন না। পরিবারের নেই কোনো আয়ের উৎস। ভাইয়ের অল্প সহযোগিতায় চললেও তাতে টিকে থাকা দুঃসাধ্য। দুই সন্তানের শিক্ষা, খাবার, চিকিৎসা সবই এখন অনিশ্চয়তার মুখে।

একজন নিরীহ, ভালোবাসার মানুষ মো: আবুল বাশার আজ শহীদ আবুল বাশার। তার রক্তের ঋণ কোনোদিন শোধ করা যাবে না, কিন্তু তার পরিবারকে সাহায্য করা আমাদের মানবিক দায়িত্ব। এই লেখাটি শুধু একটি পরিবারের কান্না নয়, এটি বাংলাদেশের প্রতিটি বিবেকবান মানুষের আত্মার স্পর্শ। আবুল বাশারের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ইতিহাসে তার নাম থাকবে সম্মানের সঙ্গে, বীরত্বের সঙ্গে।

### অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা

শহীদ পরিবারের প্রতি কিছু মানবিক প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হলো:

১. মাসিক ১৫,০০০ টাকা সহযোগিতার মাধ্যমে ছেলে-মেয়ের শিক্ষা ও জীবিকা নিশ্চিতকরণ।

২. থাকার জন্য একটি ঘর নির্মাণের ব্যবস্থা, যাতে তারা একটি নিরাপদ আশ্রয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

Galaxy A71

## একনজরে শহীদ প্রোফাইল

| | |
|---|---|
| নাম | : মো: আবুল বাশার |
| জন্ম তারিখ | : ০১-০৩-১৯৮২ |
| জন্মস্থান | : পাথরঘাটা, বরগুনা |
| পেশা | : ব্যবসায়ী (রিচার্জের দোকান) |
| স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা | : গ্রাম: উত্তর গহরপুর, ইউনিয়ন: সদর, থানা: পাথরঘাটা, জেলা: বরগুনা |
| পিতার নাম | : মৃত মতিউর রহমান শিকদার |
| মায়ের নাম | : জয়তন নেসা (৭০), পেশা: গৃহিণী |
| স্ত্রীর নাম | : তানিয়া বেগম (৩৪), পেশা: গৃহিণী, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি |
| পরিবারের সদস্য | : ছেলে: ১, মেয়ে: ১ |
| | : ১. মু জুবায়ের, বয়স: ৪, ছাত্র, পাথরঘাটা মহিলা মাদ্রাসা, শ্রেণি: নার্সারী, সম্পর্ক: ছেলে |
| | : ২. মোসা: জুবাইদা আক্তার, বয়স: ১১, পাথরঘাটা আদর্শ গার্লস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রেণি: ৬, সম্পর্ক: মেয়ে |
| ঘটনার স্থান | : পাথরঘাটা হল রোড, বরগুনা |
| আক্রমণকারী | : মুছা, সোহেল, সিদ্দিক, সাত্তারসহ স্থানীয় আওয়ামী সন্ত্রাসী |
| আক্রমণের ধরণ | : গলার মধ্যে ধারালো রড ঢুকিয়ে হত্যা |
| আহত হওয়ার তারিখ | : ০৮/০৮/২৪, সময়: রাত ১০টা |
| শহীদ হওয়ার তারিখ | : ০৮/০৮/২৪, সময়: রাত ১০টা (ঘটনাস্থলে) |
| দাফন | : নিজগ্রাম |

## শহীদ মো: রিয়াজুল ইসলাম

ক্রমিক : ৭৮৯

আইডি : বরিশাল বিভাগ: ০৮৫

**শহীদ পরিচিতি**

মো: রিয়াজুল ইসলাম বরগুনার সন্তান, দেশের জন্য যিনি জীবন দিলেন এক উত্তাল সময়ে, এক অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো আন্দোলনে। তিনি শুধু একজন ডিজাইনার ছিলেননা, ছিলেন একজন সাহসী মানুষ, একজন প্রাজ্ঞ পিতা, একজন নির্ভরযোগ্য স্বামী, একজন দায়িত্বশীল সন্তান।

## কর্মজীবন

জীবনের প্রয়োজনে বরগুনা ছেড়ে রাজধানীর প্রান্তে, শিল্পাঞ্চল আশুলিয়ায় পাড়ি জমান। জীবিকার জন্য কাজ নেন এস সুহি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক লিমিটেড এবং প্রিটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক লিমিটেড কোম্পানির একজন দক্ষ ডিজাইনার হিসেবে। নিপুণ হাতে তৈরি করতেন পোশাকের ডিজাইন, যা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশের বাজারে পৌঁছাতো। সবকিছু পেরিয়ে পরিবারের অর্থনৈতিক হাল ধরাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

## পরিবার ও অর্থনৈতিক অবস্থা

তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তাঁর স্ত্রী মরিয়ম একজন গৃহিণী; একমাত্র কন্যা তাবাসসুম ইসলাম তুবা পড়ে বরগুনা মাধ্যমিক কলেজিয়েট স্কুলে, অষ্টম শ্রেণিতে। তুবাকে ঘিরেই ছিল রিয়াজুলের যত স্বপ্ন। তাঁদের নিজস্ব কোনো স্থায়ী ঘর নেই একটি ভাড়া বাড়িতে দিন যাপন করতেন। শহীদ হবার পর পরিবার একপ্রকার দিশেহারা "আমাদের তো আর কেউ রইলো না," স্তব্ধ গলায় বলে ওঠেন মরিয়ম।

## আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট। বাংলাদেশের রাজপথ উত্তাল। শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলন তখন রূপ নিয়েছে এক সর্বস্তরের গণআন্দোলনে। দীর্ঘদিনের দুঃশাসন, অবিচার ও দমন-পীড়নের প্রতিবাদে ফেটে পড়ে লাখো মানুষ। "এই দেশ আমাদের, সিদ্ধান্তও আমাদের" এই বিশ্বাস নিয়েই রিয়াজুল যোগ দেন আন্দোলনে। ৫ আগস্ট ২০২৪ ছিল এক অবিস্মরণীয় দিন। সেদিন খুনি হাসিনা সরকার পতনের সংবাদে আশুলিয়ার রাজপথে বয়ে যায় বিজয়ের স্রোত। মিছিল, স্লোগানের অপার উল্লাসে উদ্ভাসিত ছিল বাইপাস রোড। কিন্তু সেই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

## যেভাবে শহীদ হলেন

বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে, বাইপাস মোড়, জামগড়া এলাকায় হঠাৎ করেই শুরু হয় গুলি। বিজয় মিছিল লক্ষ্য করে ছোড়া হয় সরাসরি গুলি। লক্ষ্যভ্রষ্ট নয়, বরং টার্গেটেড হত্যা করা হয়। রিয়াজুল ইসলাম ছিলেন মিছিলের সামনের সারিতে। হঠাৎ করেই তাঁর বুকে লেগে যায় এক গুলি। রাস্তার মাঝেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। চারদিকে হৈচৈ, চিৎকার, রক্ত, কান্নাকেউ ধরে রাখার আগেই নিঃশ্বাস থেমে যায় তাঁর।

## একজন সহযোদ্ধা বলছিলেন-

"রিয়াজ ভাই বলছিলেন, মেয়ে বড় হোক, ভালো মানুষ হোক, আজ সেই মেয়ে বাবাহারা হয়ে গেল।"

## পরিবারে শোকের ছায়া

বাবা হাতেম আলী হাওলাদার, বয়স প্রায় ৭০ ছুঁইছুঁই। ছেলের কবরের পাশে বসে বলছিলেন- "দুনিয়ায় মানুষ আয় করে ঘর করে, পোলাপান বড় করে। আমার ছেলেরে তো মাটিত দিয়া ঘর করাইয়া রাখছি।" মা বিলকিচ বেগমের দুচোখে যেন জল শুকায় না। তিনি কেবল একটাই কথা বলেন "ও যে আমার মা কইয়া ডাকতো। সেই ডাক আর শোনা হইবো না।"

এই শহীদের রক্ত শুধু রাজপথ রাঙায়নি, রাঙিয়েছে আমাদের বিবেক। এই মৃত্যুর দায় ইতিহাসের; এই আত্মত্যাগ আমাদের করণীয় নির্ধারণ করে দিয়েছেযেন আর কোনো রিয়াজুল এইভাবে শহীদ না হন। আর আমরা যেন ভুলে না যাই, এই দেশ গড়ে উঠেছে এমন শহীদদের রক্তে, যারা নিজের সব হারিয়ে দিয়েও আমাদের জিতিয়ে গেছেন। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় শহীদ রিয়াজুল ইসলামের প্রতি নতমস্তকে শ্রদ্ধা।

**অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা**

বর্তমানে রিয়াজুলের পরিবার নিদারুণ অর্থকষ্টে দিন কাটাচ্ছে। তার স্ত্রী মরিয়ম ও মেয়ে তুবার ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত। শহীদ রিয়াজুলের স্মরণে ও পরিবারকে টিকিয়ে রাখতে প্রস্তাব করা হচ্ছে-

১. মাসিক ১৫,০০০ টাকা মেয়ের লেখাপড়া ও পরিবারের খরচ বাবদ সহায়তা।

২. স্থায়ী থাকার জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা।

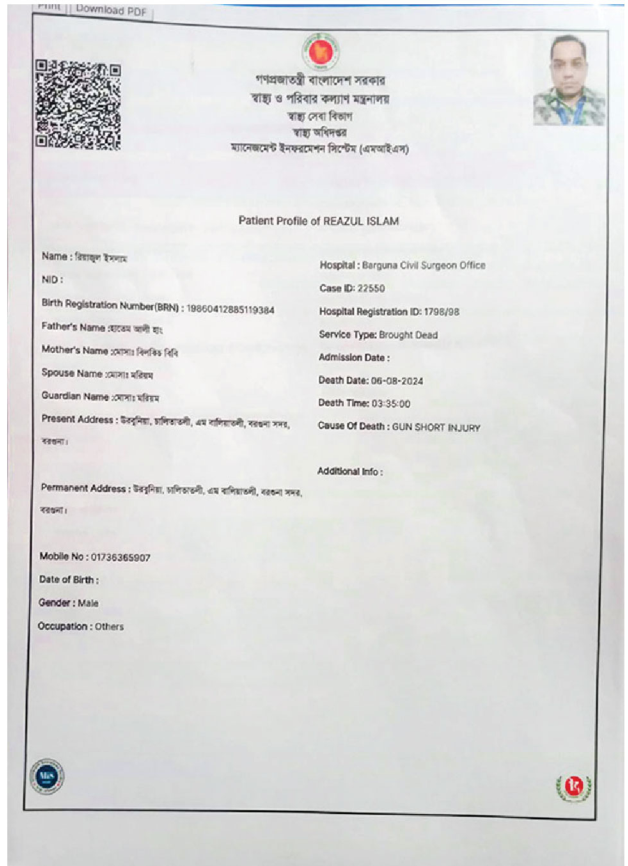

Print | Download PDF

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)

Patient Profile of REAZUL ISLAM

Name : রিয়াজুল ইসলাম
NID :
Birth Registration Number(BRN) : 19860412885119384
Father's Name :হাতেম আলী হাং
Mother's Name :মোসাঃ বিলকিচ বিবি
Spouse Name :মোসাঃ মরিয়ম
Guardian Name :মোসাঃ মরিয়ম
Present Address : উত্তরবুনিয়া, চালিতাতলী, এম বালিয়াতলী, বরগুনা সদর, বরগুনা।

Permanent Address : উত্তরবুনিয়া, চালিতাতলী, এম বালিয়াতলী, বরগুনা সদর, বরগুনা।

Mobile No : 01736365907
Date of Birth :
Gender : Male
Occupation : Others

Hospital : Barguna Civil Surgeon Office
Case ID: 22550
Hospital Registration ID: 1798/98
Service Type: Brought Dead
Admission Date :
Death Date: 06-08-2024
Death Time: 03:35:00
Cause Of Death : GUN SHORT INJURY

Additional Info :

নয়া দিগন্ত

অস্থিরতা সৃষ্টিতে মদদের অভিযোগ ২০ জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ

আনিসুল ও সালমান ১০ দিনের রিমান্ডে

হাসিনা ভারতে গিয়ে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করছে

খালেদা জিয়ার জন্মদিন আজ

আয়নাঘরের ভয়ঙ্কর বর্ণ… দিলেন ব্যারিস্টার আরম…

ভারতে থাকা হাসিনার বক্তব্য সম্পর্কোন্নয়নে সহায়ক নয়

গণহত্যার দায়ে শেখ হাসিনার বিচারে কমিশন গঠনের দাবি

শহীদ স্মরণে পদযাত্রা ও আলোক প্রজ্বলন কর্মসূচি পালন

বিজয় মিছিলে গুলিতে নিহত রিয়াজুলের পরিবার দিশেহারা

128 S… CT S…

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতাল

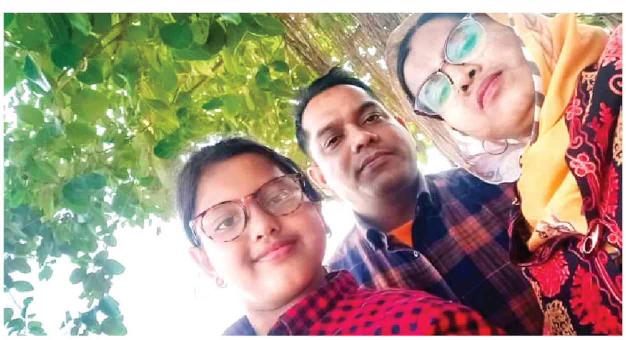

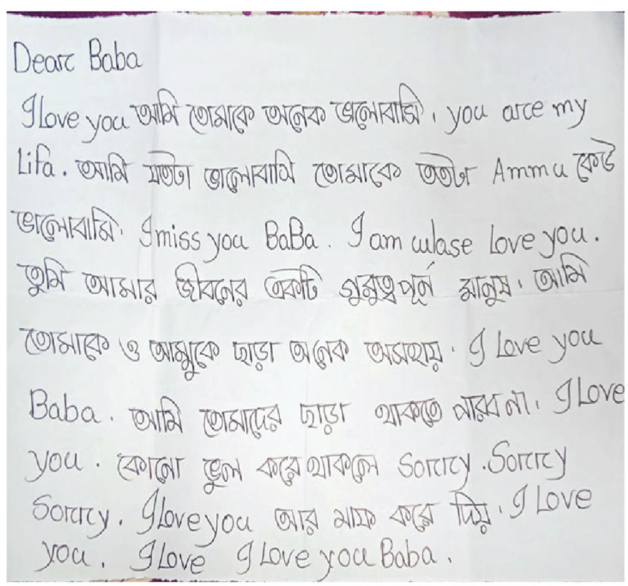

Dear Baba

I love you আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। you are my Lifa. আমি যতটা ভালোবাসি তোমাকে ততটা Ammu কেউ ভালোবাসি। I miss you BaBa. I am ulase love you. তুমি আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। আমি তোমাকে ও আম্মুকে ছাড়া অনেক অসহায়। I Love you Baba. আমি তোমাদের ছাড়া থাকতে পারব না। I Love you. কোনো ভুল করে থাকলে Sorry. Sorry Sorry. I love you আর মাফ করে দিও। I Love you. I Love I Love you Baba.

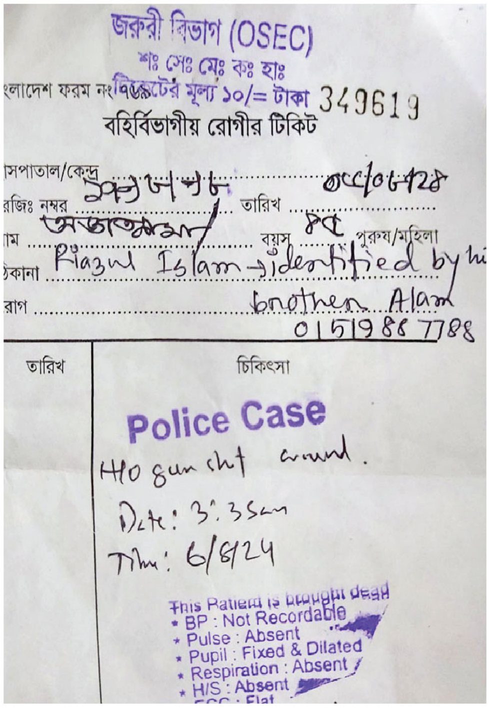


## একনজরে শহীদ মো: রিয়াজুল ইসলাম

নাম : মো: রিয়াজুল ইসলাম
জন্ম তারিখ : ০৮-০৯-১৯৮৬
জন্মস্থান : বরগুনা
পেশা : ডিজাইনার
কর্মরত প্রতিষ্ঠান : এস সুহি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক লিমিটেড, প্রিটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক লিমিটেড
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম: উরবুনিয়া চালিতাতলী, ইউনিয়ন: চালিতাতলী, থানা: সদর, জেলা: বরগুনা
পিতা : হাতেম আলী হাওলাদার, (৭০)
মায়ে : বিলকিচ বেগম (৭০), পেশা: গৃহিণী
স্ত্রী : মরিয়ম (৩৭), পেশা: গৃহিণী, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি
পরিবারের সদস্য : মেয়ে: ১
: ১. মোসা: তাবাসসুম ইসলাম তুবা, বয়স: ১৩, বরগুনা মাধ্যমিক কলেজিয়েট স্কুল
: শ্রেণি: ৮ম, সম্পর্ক: মেয়ে
ঘটনার স্থান : বাইপাস রোড, আশুলিয়া
আক্রমণকারী : পুলিশ
আক্রমণের ধরণ : শরীরে গুলিবিদ্ধ
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ : ০৫/০৮/২৪, সময়: ৩-৪টা, বাইপাস রোড, আশুলিয়া
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান : নিজগ্রাম
পারিবারিক অবস্থা : দারিদ্রক্লিষ্ট

# রক্তাক্ত মার্চের কিশোর বীর

## -শহীদ মো: হাসান

**শহীদ মো: হাসান**

ক্রমিক: ৭৯০

আইডি: বরিশাল বিভাগ: ০৮৬

### শহীদ পরিচিতি

মো: হাসান। ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি ভোলার কাচিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই দারিদ্রতা ছিল তাঁর সঙ্গী, কিন্তু চেতনায় ছিল স্বপ্নের আকাশ। পিতা মনির হোসেন ছিলেন একজন দিনমজুর, মা গোলেনুর বেগম একজন গৃহিণী। তিন ভাই-বোনের মধ্যে হাসান ছিলেন সবার বড়, তাই দায়িত্ব যেন ছায়ার মতো অনুসরণ করত তাঁকে।

### জন্ম ও বেড়ে ওঠা

গ্রামের মাটির ঘ্রাণেই তাঁর শৈশব গড়া। কাচিয়া সাহামাদার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিতে পড়তেন। ঢাকায় এসেছিলেন জীবিকার টানে, "ইসমাইল ইলেকট্রনিক্স" নামক দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন। কর্ম আর শিক্ষা দুইয়ের ভার নিয়েই চলছিল তাঁর জীবন।

### অর্থনৈতিক বাস্তবতা

হাসানের পরিবারটি ভাড়াটিয়া, মাত্র ৫০০০ টাকার ভাড়ার একটি ছোট ঘরে বাস করে। হাসানের আয়েই চলত পুরো পরিবার, যা ছিল মাসে সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা। ভাই হাসিব দশম শ্রেণির ছাত্র, বোন জুমাইয়া নবম শ্রেণিতে। আরেক বোন শাহনাজ বিবাহিত। হাসানই ছিলেন পরিবারের একমাত্র সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল বাতি, যে আলোর উৎস দিয়ে পরিবারের দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়েছিলেন।

### জুলাই-আগস্টের গণজাগরণ

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট বাংলার ইতিহাসে এক আগুনঝরা অধ্যায়। শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক গণঅভ্যুত্থান, যে অভ্যুত্থান দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে পুরো দেশে। হাসান ছিলেন সে আন্দোলনের এক সাহসী অংশীদার। ৫ আগস্ট ২০২৪, যখন স্বৈরশাসনের পতনের পর চারদিকে বিজয়ের ঢেউ উঠেছিল, হাসানও দেরি করেননি। "আমিও যাচ্ছি বিজয়ের মিছিলে"এই বলে বাসা থেকে বেরিয়ে যান যাত্রাবাড়ীর দিকে। আর সেখানেই ঘটে সেই নির্মমতা, যা বাংলার প্রতিটি হৃদয়ে রক্ত ঝরায়।

### শহীদ হওয়ার ঘটনা

মিছিল চলছিল, চারপাশে উচ্ছ্বাস, জয়ধ্বনি, পতাকা উড়ছিল বাতাসে। ঠিক তখনই রাষ্ট্রযন্ত্রের নিষ্ঠুর রূপ দেখা দেয়। পুলিশ ছোড়ে গুলি ভয়ার্ত, তবু দৃঢ়চেতা কিশোর হাসান গুলিবিদ্ধ হন। মুহূর্তেই রক্তাক্ত হয়ে পড়ে যান রাস্তায়। তারপর দীর্ঘ সময় নিখোঁজ। পরিবার পাগলপ্রায় হয়ে খুঁজে ফেরে তাঁকে। কেটে যায় দিন, মাস। একসময় প্রায় আশা ছেড়েই দেয় পরিবার। এরপর ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় সেই নিখোঁজ কিশোর শহীদের পরিচয়। ঢাকা মেডিকেল মর্গ থেকে বুঝে পায় তাঁর লাশ। জানাজা শেষে নিজের প্রিয় গ্রাম কাচিয়ার মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত হন শহীদ হাসান।

### পরিবারের বর্তমান অবস্থা

শহীদ হাসানের পরিবার আজ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। যিনি রোজগারের মূল ভরসা ছিলেন, তিনিই নেই। স্থায়ী বাসস্থান নেই, কোনো আয়ের পথ নেই। বাবা দিনমজুর, বয়স ৫৫ পেরিয়েছে। ছোট ভাই-বোন এখনো লেখাপড়ায় যুক্ত, কিন্তু অর্থাভাবে তা থমকে গেছে। হাসানের

হাসানের বাবা মনির হোসেন জানান, দীর্ঘ ৬ মাস হাসানকে খোঁজা-খুঁজি করে কোথাও না পেয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গের ফরেনসিক বিভাগে আমরা একটি লাশ শনাক্ত করি।এরপর তারা আমাদের ডিএনএর নমুনা পরীক্ষা করে শনাক্তপূর্বক আমাদের কাছে শুক্রবার দুপুরে হাসানের লাশ হস্তান্তর করেন।

হাসানের বড় বোন শাহনাজ বেগম জানান, আমার ভাই কী দোষ করল, তাকে প্রাণে মেরে ফেলতে হয়েছে।আমরা দীর্ঘ ৬ মাস পর ভাইয়ের লাশ পেয়েছি।আমার ভাইয়ের হত্যার সঠিক বিচার চাই।হাসানকে যারা হত্যা করেছে তাদের ফাঁসি দিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।এদিকে একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন মা গোলেনুর বেগম।স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠেছে পরিবেশ।শেষবারের মতো হাসানকে একনজর দেখতে ভিড় করছেন স্বজন ও প্রতিবেশীরা।

দৈনিক ভোলার বাণী

THE DAILY BHOLAR BANI

দীর্ঘ ৬ মাস পর দাফন হলো ভোলার ছেলে শহীদ হাসানের

৪নং কাটিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
MORTUARY VAN

DHAKA POST

## ৫ আগস্ট আন্দোলনে নিখোঁজ হাসানের মরদেহ শনাক্ত

জেলা প্রতিনিধি · ভোলা
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ০৬:৩৯

**গত ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ীতে আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন ভোলার মো. হাসান। দীর্ঘ ছয় মাসেও সন্ধান পাওয়া যায়নি তার। অবশেষে খোঁজ মিলল নিখোঁজ সেই হাসানের। ঢাকা মেডিকেলের মর্গে তার মরদেহ পাওয়া গেছে।**

বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকা মেডিকেলে কলেজ কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে হাসানের পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। ঢাকা পোস্টকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন হাসানের বাবা মো. মনির।

জানা গেছে, শুক্রবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) জুমার নামাজ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল মসজিদে শহীদ হাসানের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে কফিন মিছিল হওয়ার কথা রয়েছে। আগামীকাল শনিবার সকাল ১০টায় গ্রামের বাড়িতে আরেকদফা জানাজা শেষে নিজ গ্রামে শহীদ হাসানকে সমাহিত করা হবে।

গুলিবিদ্ধ হয়ে মো. হাসান নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় গত ১৭ আগস্ট **'মুই বিচার চাই না, সরকার যেন খালি মোর পোলার লাশের খোঁজডা দেয়'** এবং গত ১৪ ডিসেম্বর **'আজও বাবা-মা জানেন না ছেলে বেঁচে আছে না মারা গেছে'** শিরোনামে দুটি সংবাদ প্রকাশিত হয় ঢাকা পোস্টে।

শহীদ মো. হাসান ভোলা সদর উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাচিয়া গ্রামের জাহাঙ্গীর বেপারি বাড়ির ভাড়াটিয়া দিনমজুর মো. মনির ও গোলেনুর বেগম দম্পতির দ্বিতীয় সন্তান ও সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সন্তান ছিলেন।

এর আগে গত ১২ জানুয়ারি দুপুরে হাসানের পরিবার ঢাকা মেডিকেলের মর্গে থাকা অজ্ঞাত কয়েকটি মরদেহের মধ্য থেকে প্রাথমিকভাবে হাসানের মরদেহ শনাক্ত করে তার পরিবার। পরে ১৩ জানুয়ারি যাত্রাবাড়ী থানার মাধ্যমে আদালতের নির্দেশে মালিবাগের সিআইডি অফিসে হাসানের বাবা-মা ডিএনএ নমুনা দেন এবং হাসানের ডিএনএ নমুনার সঙ্গে তাদের ডিএনএ নমুনা মেলে।

নিহত হাসানের বাবা মো. মনির ঢাকা পোস্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, আমার ছেলে নিখোঁজ হওয়ার খবরটি গুরুত্বসহ সর্বপ্রথম প্রকাশ হয় ঢাকা পোস্টে। দীর্ঘ ৬ মাস ৮ দিনের মাথায় অনেক চেষ্টার পর আমার ছেলের মরদেহ খুঁজে পেয়েছি। আমার ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে, আমি ছেলে হত্যার বিচার চাই।

তিনি আরও বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা আমাকে বলেছেন, শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে জানাজা শেষে গণহত্যার বিচারের দাবিতে হাসানের মরদেহ নিয়ে কফিন মিছিল হবে। এরপর হাসানের মরদেহ ভোলায় গ্রামের বাড়িতে এনে দাফন করব।

হাসানের মরদেহ শনাক্তের বিষয়ে জানতে চাইলে ভোলা সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আবু শাহাদাত মো. হাচনাইন পারভেজ ঢাকা পোস্টকে বলেন, এ বিষয়ে এখনও কোনো তথ্য পাইনি।

খাইরুল ইসলাম/এমএ

© dhakapost.com
অনলাইনে পড়তে স্ক্যান করুন

'আল্লায় আমার কতা হোনছেন, আমি আমার জাদুর লাশ খুঁইজ্জা পাইছি' | প্রথম আলো

প্রথম আলো

জেলা

## 'আল্লায় আমার কতা হোনছেন, আমি আমার জাদুর লাশ খুঁইজ্জা পাইছি'

নেয়ামতউল্যাহ ভোলা
প্রকাশ: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ২২: ১৭

মো. হাসান ছবি: সংগৃহীত

গত বছরের ৬ আগস্ট ফেসবুকে একটি ভিডিও দেখে বাবা-মা জানতে পারেন, তাঁদের সন্তান হাসান (১৮) গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। খোঁজ না পেয়ে রাজধানী ঢাকায় ছুটে যান। সেখানে সব হাসপাতাল খুঁজেও ছেলের সন্ধান পাননি তাঁরা। পরে নানাভাবে প্রচার চালিয়ে জানুয়ারি মাসে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে এক তরুণের লাশের খবর পান। প্রাথমিকভাবে সেটিকে হাসানের বলে দাবি করেন তাঁরা। অবশেষে গতকাল বৃহস্পতিবার ডিএনএ প্রতিবেদন পেয়ে নিশ্চিত হন লাশটি নিজেদের ছেলের।

আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে হাসানের মরদেহের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। আগামীকাল শনিবার সকাল ১০টায় ভোলা সদর উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের সাহমাদার গ্রামে দ্বিতীয় জানাজার পর হাসানের দাফন করার কথা আছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে হাসানের বাবা মো. মনির হোসেন (৪৮) ও ভগ্নিপতি মো. ইসমাইল (২৯) জানান, আজ (শুক্রবার) থেকে এক মাস আগে তাঁরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে হাসানের লাশ শনাক্ত করেন। তারপর সিআইডি ডিএনএ পরীক্ষা শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

মনির হোসেন আরও জানান, দুই ছেলে, দুই মেয়ে ও স্ত্রীর সংসারে হাসানের উপার্জনের অনেকটা নির্ভর করতে হতো। নদীভাঙনে সব হারিয়ে কাচিয়া ইউনিয়ন পরিষদ-সংলগ্ন অন্যের বাড়িতে ঘর তুলে বসবাস করছেন। দিনমজুরের কাজ করে কোনোরকমে সংসার চালান। সংসারে অভাবের কারণে হাসান আট বছর আগে রাজধানীর গুলিস্তানে কাপ্তানবাজার এলাকায় একটি ইলেকট্রনিকসের দোকানে কাজ নেন। সেখানে কাজ করে নিজের খরচ চালিয়ে মাসে মাসে কিছু টাকা সংসারের জন্য পাঠাতেন। আর থাকতেন যাত্রাবাড়ীর বালুর মাঠের কাছে ধলপুর এলাকায় ভগ্নিপতি ইসমাইলের বাসায়।

এ পর্যায়ে কান্নারত অবস্থায় মনির জানান, হাসানের সঙ্গে মুঠোফোনে তাঁর সর্বশেষ কথা হয়েছে ৫ আগস্ট দুপুরের দিকে। বিকেলে তাঁর মুঠোফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। এরপর ছেলের সঙ্গে আর কথা হয়নি। ঢাকায় আত্মীয়স্বজনও হাসানের খবর পাননি। ইসমাইলের কাছে জানতে পারেন, যাত্রাবাড়ী এলাকায় গত ৫ আগস্ট দুপুরের পর কয়েক দফায় গোলাগুলি হয়েছে। হাসান তখন গোলাগুলির মধ্যে পড়েন। ওই সময় তাঁর কাছে দুটি মুঠোফোন ছিল। সেগুলো নিয়ে যায় কেউ। পরদিন গত ৬ আগস্ট ফেসবুকে একটি ভিডিও দেখে হাসানের গুলিবিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হন।

হাসানের খোঁজ চেয়ে ঢাকা ও ভোলার বিভিন্ন স্থানে তাঁর নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তির পোস্টার সেঁটে দেন। দুই শহরেই মাইকিং, মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করেছেন। তাঁর পরিবার সরকারের কাছে দাবি করেন, জীবিত বা মৃত হোক, তাঁর ছেলেকে যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পোস্টারে হাসানের নাম-ঠিকানা ও যোগাযোগের মুঠোফোন নম্বর দেন। একপর্যায়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে এক তরুণের লাশের খোঁজ পেয়ে আবার ছুটে যান। গত মাসের শুরুর দিকে সেখানে মরদেহটি হাসানের বলে শনাক্ত করেন তাঁর বাবা-মা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গতকাল মরদেহটি বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মা আজও ছেলের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন।

### নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

হাসানের ছোট ভাই হাসিব কাঁপা কণ্ঠে বলেন, “ভাইয়া সব সময় বলত, আমি একদিন বড় হবো, আমাদের একটা ভালো ঘর বানাবো। এখন সেই ভাইয়াই নেই!” আর মা গোলেনুর বেগম বলেন, “সেইদিন দুপুরে বলল, মা আমি একটু যাচ্ছি। ও যে আর ফিরবে না, ভাবিনি।”

### সমাপ্তি নয়, শুরু

হাসানের মতো শহীদেরা হারিয়ে যায় না, তাঁরা বেঁচে থাকেন নতুন প্রজন্মের চোখে, হৃদয়ে ও সংগ্রামে। তিনি শহীদ হয়েছেন গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের স্বপ্নে, তাঁর আত্মত্যাগ এ দেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

**প্রস্তাবনা**

১. শহীদ হাসানের পিতা বা ভাইয়ের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা গেলে পরিবারটি কিছুটা স্থিতি পেতে পারে।
২. থাকার জন্য একটি স্থায়ী ঘর তৈরি করে দেওয়া প্রয়োজন, যাতে শহীদের স্মৃতি রক্ষিত হয়।
৩. ভাই-বোনদের পড়ালেখার পূর্ণ খরচ বহন করলে শহীদের স্বপ্নকে জীবিত রাখা সম্ভব।

গণ-অভ্যুত্থানে নিহত হওয়ার ছয় মাস পর গ্রামের বাড়িতে হাসানের লাশ দাফন | প্রথম আ

প্রথম আলো

জেলা

## গণ-অভ্যুত্থানে নিহত হওয়ার ছয় মাস পর গ্রামের বাড়িতে হাসানের লাশ দাফন

প্রতিনিধি ভোলা

আপডেট: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ২০: ২১

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের গুলিতে নিহত মো. হাসানের দ্বিতীয় জানাজা গতকাল ভোলার সদর উপজেলার সাহমাদার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ছবি: প্রথম আলো

গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের দিন (গত ৫ আগস্ট) রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে গুলিতে নিহত মো. হাসানের (১৯) লাশ দাফন করা হয়েছে। মারা যাওয়ার ৬ মাস ১০ দিন পরে শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বাড়ির পাশে ভোলার সদর উপজেলার সাহমাদার গ্রামে রাড়ি বাড়ি জামে মসজিদ কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। লাশ দাফনের সময় তাঁর মা-বাবা আহাজারি করতে থাকেন। এলাকাজুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া।

ভোলার সদর উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়ন পরিষদের পাশে সাহমাদার মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে মো. হাসানের দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় নাগরিক কমিটিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীসহ ভোলার গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং হাসানের পরিবারের সদস্য ও স্বজনেরা অংশ নেন। হাসানের প্রথম জানাজা গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে অনুষ্ঠিত হয়।

মো. হাসান রাজধানীর কাজলাবাজারে একটি দোকানে কাজ করতেন। তাঁদের গ্রামের বাড়ি ভোলা সদর উপজেলার সাহমাদার গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের মনির হোসেনের (৪৮) ছেলে। মনির হোসেন পেশায় একজন দিনমজুর। আটবার নদীভাঙনে সবকিছু হারিয়ে অন্যের জমিতে ঘর তুলে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাস করছেন তিনি। তাঁর দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। বড় ছেলে হাসান আয়রোজগার ভালো করলে জমি কিনে বাড়ি করার আশা ছিল তাঁর। কিন্তু হাসান মারা যাওয়ায় তাঁর সেই আশা পূরণে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

হাসানের বাবা মনির হোসেন জানালেন, ইচ্ছা ছিল হাসানকে পড়াশোনা করাবেন। কিন্তু অভাবের কারণে পড়াতে পারেননি। অভাবের কারণে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত ছেলেকে পড়াতে পেরেছেন। এরপর হাসান আট বছর আগে ঢাকায় গিয়ে ইলেকট্রনিকসের দোকানে কাজ নেন। নিজের খরচ চালিয়ে মাসে মাসে কিছু সংসারের জন্য পাঠাতেন। ব্যবসাটি বুঝে উঠতে পারলে ভবিষ্যতে ইলেকট্রনিকসের দোকান দিয়ে ব্যবসা করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। দিনমজুরি, আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতা ও হাসানের আয়ে কোনো রকম সংসার চালাতেন। কিন্তু হাসান মারা যাওয়ায় তাঁর সংসারে অভাব বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় তাঁরা সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তার দাবি করছেন। এ ছাড়া হাসানের কবরটি বাঁধাই করাসহ হাসান হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি জানাচ্ছেন।

আজ সকালে হাসানদের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে, লাশ দাফনের আগে হাসানের বাবা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। বারবার ছেলের লাশ আগলে ধরতে চাচ্ছেন। লোকজন তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কবরে নেওয়ার পথে হাসানের মা গোলেনূর বেগম ও বোনদের বিলাপ করতে করতে লাশ নিতে বাধা দিচ্ছেন। তাঁদেরও সামাল দেন গ্রামের নারীরা।

## একনজরে শহীদ প্রোফাইল

| | |
|---|---|
| নাম | : মো: হাসান |
| জন্ম তারিখ | : ০১-০১-২০০৬ |
| জন্মস্থান | : ভোলা |
| পেশা | : দোকান কর্মচারী ও ছাত্র, প্রতিষ্ঠান: কাচিয়া সাহামাদার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শ্রেণি: ৭ম |
| কর্মরত প্রতিষ্ঠান | : ইসমাইল ইলেক্ট্রনিক্স, গুলিস্তান, কাপ্তান বাজার |
| স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা | : গ্রাম: কাচিয়া, ইউনিয়ন: সাহামাদার, থানা: সদর, জেলা: ভোলা |
| পিতার নাম | : মনির হোসেন |
| পেশা | : দিনমজুর |
| বয়স | : ৫৫ বছর |
| মায়ের নাম | : গোলেনুর বেগম |
| পেশা | : গৃহিণী |
| বয়স | : ৪০ বছর |
| মাসিক আয় | : ১৫০০০ |
| উৎস | : শহীদের পিতার আয় |
| স্ত্রীর নাম | : মরিয়ম (৩৭), পেশা: গৃহিণী, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি |
| পরিবারের সদস্য | : ভাই: ১, বোন: ২ |
| | : ১. মো: হাসিব, বয়স: ১৬, শ্রেণি: ১০ম, সম্পর্ক: ভাই |
| | : ২. মোসা: জুমাইয়া, বয়স: ১৪, শ্রেণি: ৯ম, সম্পর্ক: বোন |
| | : ৩. মোসা: শাহনাজ বেগম, বিবাহিতা, সম্পর্ক: বোন |
| ঘটনার স্থান | : যাত্রাবাড়ী |
| আক্রমণকারী | : পুলিশ |
| আক্রমণের ধরণ | : শরীরে গুলিবিদ্ধ |
| শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান | : নিজগ্রাম |
| লাশ হস্তান্তর | : আন্দোলন পরবর্তী সময়ে নিখোঁজ থাকার পর গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে লাশ চিহ্নিতকরণ করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের ফরেনসিক মর্গ থেকে লাশ বুঝে পায় শহীদ পরিবারটি। |

## শহীদ রকিবুল ইসলাম

ক্রমিক: ৭৯১

আইডি: খুলনা বিভাগ: ০৬৫

**শহীদ পরিচিতি**

চাঁদখালীর শান্তপ্রিয় গ্রাম কালীদাসপুরের বাতাস আজও বয়ে আনে এক তরুণের আকুতি। এক প্রত্যয়ী, নিরহংকারী ছাত্র নাম ছিল রকিবুল ইসলাম। খুলনার বিএল কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ৪র্থ বর্ষের ছাত্র ছিলেন তিনি। বাবার একমাত্র সন্তান, মায়ের প্রিয় "রকি" একে একে সবাই তাকে ডেকে উঠত ভালোবাসায়।

### জন্ম ও শৈশব

রকিবুল ইসলামের জন্ম চাঁদখালী, পাইকগাছার এক গাঁয়ের নিভৃত প্রান্তে। কালীদাসপুর গ্রামেই তার শৈশবের দিনগুলো কেটেছে কাঁদা-মাটির গন্ধ মেখে। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, বই আর দেশের প্রতি ভালোবাসাই ছিল তার প্রাণের দুই রং। শিক্ষকরা বলতেন, "এই ছেলেটা একদিন সমাজ বদলাবে।"

### কর্ম জীবন ও সংগ্রাম

রকিবুলের পরিবার ছিল একদম স্বল্প আয়ের। তার বাবা রফিকুল ইসলাম এক চোখে অন্ধ চাঁদখালী বাজারে একটি ছোট্ট চায়ের দোকান চালিয়ে কোনোরকমে সংসার টেনে নিতেন। শহীদ রকিবুল ইসলাম তার পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে বাবাকে সাহায্য করতেন। কখনো চায়ের কাপ ধুতে, কখনো দোকানে চিনি-মুড়ি এনে দিতে ব্যস্ত থাকতেন। পড়ালেখা ও পারিবারিক দায় এই দুই ভার কাঁধে তুলে নিয়েই তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ছোট এক বোন আছে, পড়াশোনা করছে স্থানীয় বিদ্যালয়ে। কিন্তু ভাইয়ের এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে সেই শিক্ষাজীবনও এখন অনিশ্চয়তার মুখে।

### অর্থনৈতিক বাস্তবতা

রকিবুল ছিলেন পরিবারে একমাত্র ছেলে। সংসারে জমিজমা বলতে কিছুই নেই। বাবার দোকানে তেমন আয় নেই বললেই চলে।

অভাব-অনটনের মধ্যেও রকিবুলের একটাই স্বপ্ন ছিল শিক্ষিত হয়ে দেশের জন্য কিছু করা। অথচ সেই স্বপ্ন এখন স্মৃতির মলিন পাতা।

### আন্দোলনে যোগদান ও জুলাই-আগস্ট প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুলাই মাস ছিল উত্তাল। দেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল সারাদেশে। নানা অন্যায়ের প্রতিবাদে নতুন প্রজন্ম দাঁড়িয়েছিল বুক টান করে। রকিবুল ছিলেন সেই সাহসী কণ্ঠের একজন, যিনি রাজনীতির জন্য নয়, ন্যায়ের জন্য এক হলেন। ৫ আগস্ট আন্দোলনের বিজয়ের এক মাস পূর্তি উপলক্ষে চাঁদখালী বাজারে আয়োজিত হয়েছিল জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান। রকিবুলের মনের ভিতরে ছিল এক রকম গর্ব "আমি নিজ হাতে পতাকা তুলব।" এই পতাকা ছিল তার স্বাধীনতার, তার বিশ্বাসের, তার প্রেরণার প্রতীক।

### যেভাবে তিনি শহীদ হলেন

ঘটনার দিন ৫ আগস্ট ২০২৪। চাঁদখালী বাজারে মানুষের ভিড়। সকলে অপেক্ষা করছে পতাকা উত্তোলনের মুহূর্তটির জন্য। রকিবুল উঠে দাঁড়াল মঞ্চে। হাতে পতাকা। সে সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ লাইনের তার ছিঁড়ে পড়ে যায় মঞ্চের পাশে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই, রকিবুল পতাকাটি উঠিয়ে ধরতেই সেই ভেজা মঞ্চ এবং ছেঁড়া তারের সংস্পর্শে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পড়ে যান তিনি। মুহূর্তেই নিথর হয়ে যান নিস্তব্ধ হয়ে যায় চারদিক। সকলের চোখে জল, চারদিকে শুধু আহাজারি। কে জানত, স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে ওঠা পতাকাই কেড়ে নেবে এমন একটি প্রাণ?

### শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থা

শহীদ রকিবুল ইসলামকে গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। কবরের পাশে আজও পড়ে থাকে তার ব্যবহৃত সেই বইখাতা, যার শেষ পাতায় লেখা ছিল "আমার দেশ, আমার পতাকা, আমার বিশ্বাস এটাই আমার জীবন।"

### শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

তার মা রেবেকা খাতুন আজও ছেলের নামে ডাকেন "রকি, তুই বলেছিলি মাকে একটা ভালো ঘর দিবি, কিন্তু ঘর না দিয়ে তুই নিজেই চলে গেলি চিরঘুমে।"

শিক্ষক বলেছিলেন, "রকিবুল পড়াশোনায় যেমন ভালো, মানুষ হিসেবেও ছিল অনন্য। সে ছিল একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক।"

রকিবুল ইসলামের শহীদ হওয়া শুধু একটি মৃত্যু নয় এটি একটি পতাকা হাতে মৃত্যুকে আলিঙ্গনের গল্প। তিনি পতাকার নিচে প্রাণ দিলেন, যেন ভবিষ্যতের প্রজন্ম স্বাধীনতার অর্থ বুঝতে পারে। তার আত্মত্যাগ যেন বৃথা না যায় এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

**অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা**

এই শহীদ পরিবারের জন্য এখনই প্রয়োজন সহায়তার হাত।

**প্রস্তাবনা-১:** শহীদের বাবার ছোট চায়ের দোকানে কিছু মালামাল ও ফার্নিচার সহায়তা দেয়া হলে তারা কিছুটা স্বচ্ছলতা ফিরে পাবে।

**প্রস্তাবনা-২:** একটি গরু বা ছাগল কিনে দিলে পরিবারটি দীর্ঘমেয়াদে উপকৃত হবে এবং বোনটির পড়াশোনাও চালিয়ে যেতে পারবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card

নাম
রকিবুল হাসান
Name
ROKIBUL HASAN
পিতা
রফিকুল গাজী
মাতা
রেবেকা খাতুন
Date of Birth 25 Nov 2000
NID No. 196 406 7324

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Chandkhali Union Parishad
Paikgachha, Khulna
(Rule 11, 12)
মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

| Date of Registration | Death Registration Number | Date of Issuance |
|---|---|---|
| 01/09/2024 | 20004716416111550 | 01/09/2024 |

Date of Birth : 25/11/2000    Sex : Male
Date of Death : 05/08/2024
In Word : Fifth of August Two Thousand Twenty Four

| | | | |
|---|---|---|---|
| নাম | রকিবুল হাসান | Name | Rokibul Hasan |
| মাতা | রেবেকা খাতুন | Mother | Rebeka Khatun |
| মাতার জাতীয়তা | বাংলাদেশী | Nationality | Bangladeshi |
| পিতা | রফিকুল গাজী | Father | Rofiqul Gazi |
| পিতার জাতীয়তা | বাংলাদেশী | Nationality | Bangladeshi |
| মৃত্যুস্থান | খুলনা, বাংলাদেশ | Place of Death | Khulna, Bangladesh |
| মৃত্যুর কারণ | বৈদ্যুতিক শক | Cause of Death | Electric Shock |

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
G.M. ABBAS UDDIN
Secretary
9No Chandkhali Union Parishad
Paikgachha, Khulna.

Seal & Signature
Registrar
MD.ABDULLAH SARDAR
CHAIRMAN PANEL-1
9NO CHANDKHALI UNION PARISHAD
PAIKGACHA KHULNA

IDENTITY CARD
Govt. Brajalal College, Khulna
Ested.: 1902

Name : Rokibul Hasan
Father's Name : Rofiqul Gazi
Hon's. Subject : Political Science (1901)
Roll No.: 1919122
Session: 2019-20
Duration : 30 June 2023
Principal

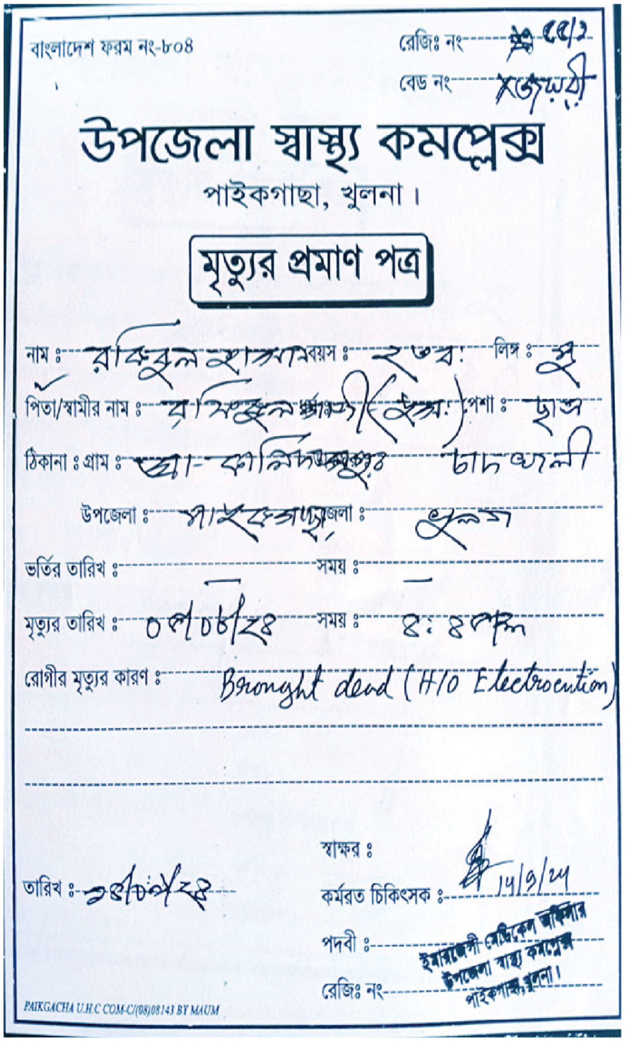

বাংলাদেশ ফরম নং-৮০৪

রেজিঃ নং

বেড নং

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

পাইকগাছা, খুলনা।

মৃত্যুর প্রমাণ পত্র

নাম : রকিবুল হাসান বয়স : ২৫ বঃ লিঙ্গ : পুঃ

পিতা/স্বামীর নাম : রফিকুল গাজী পেশা : ছাত্র

ঠিকানা : গ্রাম : চাঁদখালী

উপজেলা : পাইকগাছা জেলা : খুলনা

ভর্তির তারিখ : সময় :

মৃত্যুর তারিখ : ০৫/০৮/২৪ সময় : ৪:৪৫ pm

রোগীর মৃত্যুর কারণ : Brought dead (H/O Electrocution)

স্বাক্ষর :

তারিখ :

কর্মরত চিকিৎসক : 14/8/24

পদবী : ইমারজেন্সী মেডিকেল অফিসার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পাইকগাছা, খুলনা।

রেজিঃ নং :

PAIKGACHA U.H.C COM-C/(08)08143 BY MAUM

## একনজরে শহীদ প্রোফাইল

| | |
|---|---|
| নাম | : রকিবুল ইসলাম |
| জন্মস্থান | : চাঁদখালী, পাইকগাছা, খুলনা |
| স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা | : গ্রাম: কালীদাসপুর, ইউনিয়ন: চাঁদখালী , থানা: পাইকগাছা, জেলা: খুলনা |
| শিক্ষা | : রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ৪র্থ বর্ষ, খুলনা বিএল কলেজ |
| পেশা | : ছাত্র |
| পরিবার | : ১ ভাই ১ বোন |
| আর্থিক অবস্থা | : অত্যন্ত দুর্বল |
| মৃত্যুর তারিখ | : ০৫ আগস্ট ২০২৫ |
| কারণ | : বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে শহীদ |
| কবরস্থান | : পারিবারিক কবরস্থান, কালীদাসপুর, পাইকগাছা, খুলনা |

# রক্তাক্ত আগস্টের আর্তনাদ

-শহীদ মহিউদ্দিন

**শহীদ মহিউদ্দিন**

ক্রমিক: ৭৯২

আইডি: বরিশাল বিভাগ: ০৮৭

### শহীদ পরিচিতি

মহিউদ্দিন নামটি যেন এক সাধারন জীবনের অসাধারণ সাহসিকতার প্রতিচ্ছবি। যিনি ছিলেন ভোলার প্রত্যন্ত জনপদ পশ্চিম ইলিশার এক নিভৃত পল্লীর সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, সেই তিনিই ২০২৪ সালের আগস্টে এই দেশের ইতিহাসে এক লাল অক্ষরে লেখা শহীদের নাম হয়ে ওঠেন।

### জন্ম ও শৈশব

ভোলার সদর থানার পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নের ছোট্ট গ্রামে জন্ম হয় মহিউদ্দিনের। বাবা আবুল হাসেম বয়াতি ও মা মল্লিকা খাতুন ছিলেন অভাবী দিনমজুর শ্রেণির মানুষ। দারিদ্র্য, সংগ্রাম আর শূন্যতার মাঝেই কেটেছে মহিউদ্দিনের শৈশব। যেখানে শিক্ষা নয়, জীবনের মূল পাঠ ছিল বেঁচে থাকার লড়াই। শৈশবে পিতা-মাতা দুজনেই না ফেরার দেশে চলে যান। এতিম হয়ে উঠেও মহিউদ্দিন কখনো বিভ্রান্ত হননি। গ্রামের পরম্পরা মূল্যবোধ আর আত্মীয়-প্রতিবেশীদের ভালোবাসায় বড় হয়েছেন এক নীরব, ভদ্র ও আত্মমর্যাদাশীল যুবক হিসেবে। "স্বভাব চরিত্রের দিক দিয়ে অনেক ভালো ছিলেন", একথাই বলেন প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা।

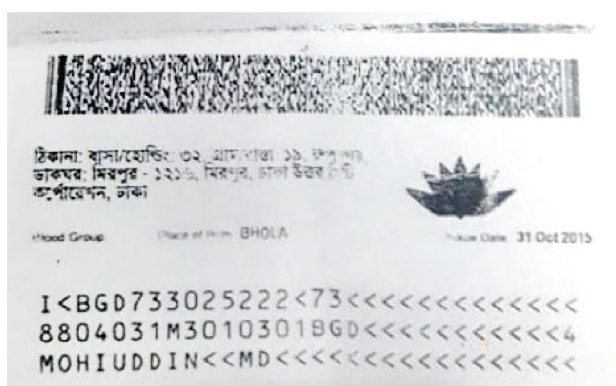


### কর্মজীবনের গল্প

বড় ভাই আব্দুল মান্নানের আশ্রয়ে ও উৎসাহে জীবিকার সন্ধানে পাড়ি জমান রাজধানী ঢাকায়। ঢাকার মিরপুর এলাকায় একটি নামবিহীন মুদি দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ নেন। হালাল উপার্জনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল তার জীবনের চালিকাশক্তি। তিনি ছিলেন পরিশ্রমী, সৎ ও নির্ভরযোগ্য একজন নিঃশব্দ সংগ্রামী। কখনো দুঃখ করেননি নিজের অবস্থা নিয়ে, কিন্তু ভাই-বোনদের খোঁজখবর রাখা ও

তাদের ভালো-মন্দ জানার চেষ্টা করতেন সবসময়। আত্মত্যাগী এই মানুষটি জীবনে ছোট ছোট স্বপ্ন দেখতেন, কিন্তু তার স্বপ্নের আকাশ যেন থমকে গেল ২০২৪ সালের আগস্টে।

### পরিবার ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

মহিউদ্দিনের পারিবারিক অবস্থা ছিল টানাপোড়েনময়। ভাই-বোনরা সবাই বিবাহিত এবং নিজ নিজ সংসারে ব্যস্ত। পরিবারে কার্যত তিনি নির্ভর করতেন বড় ভাই আব্দুল মান্নানের উপর। কোনোদিন কেউকে বোঝা হননি, আবার নিজের দুঃখ-কষ্টও কখনো প্রকাশ করেননি। শহরের জীবনেও গ্রামের গন্ধ ছিল তার হৃদয়েসাদামাটা, বিশ্বাসী আর আপনজনদের প্রতি ভালোবাসায় ভরা।

### আন্দোলন ও জুলাই-আগস্টের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে দেশের রাজনীতিতে এক নতুন জোয়ার ওঠে। সরকারের পতনের দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে ঢাকার রাজপথ। সেই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে মিরপুরেও। সেদিন ৫ আগস্ট ২০২৪, ঢাকা শহরের বুকে মিরপুর ২নং সেক্টরের সামনে জনতার ঢল নামে। মহিউদ্দিন সেই মিছিলে শরিক হয়েছিলেন, কোনো পদ বা নেতৃত্বের জন্য নয়তিনি গিয়েছিলেন ন্যায়ের দাবিতে, দেশপ্রেমের তাগিদে। যখন চারপাশে স্লোগানের গর্জন আর বিক্ষোভের আগুন জ্বলছিল, তখনই পুলিশ ছুড়ে দেয় গুলি। গুলিবিদ্ধ হন মহিউদ্দিন।

### যেভাবে তিনি শহীদ হলেন

গুলিবিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মহিউদ্দিন। দ্রুত তাকে নেয়া হয় শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগী গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়! যেন একবার নয়, দুবার গুলি খায় তিনিএকবার পুলিশের হাতে, আরেকবার রাষ্ট্রযন্ত্রের নিষ্ঠুরতায়। পরবর্তী সময়ে শ্যামলীর একটি বেসরকারি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয় তাকে। কিন্তু ততক্ষণে সময় ফুরিয়ে এসেছে। ৬ আগস্ট ২০২৪ রক্তে ভেজা সেই দিনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মহিউদ্দিন। দেশের জন্য, মানুষের অধিকারের জন্য জীবন দিলেন, তবু কেউ সেই জীবনের মূল্য বুঝে উঠলো না।

### কবর ও প্রস্থান

তার দেহ ফিরে যায় প্রিয় ভোলায়। গ্রামের স্থানীয় কবরস্থানে শায়িত হন তিনি। সেই মাটিতে এখন শান্তিতে ঘুমাচ্ছেন শহীদ মহিউদ্দিন। এক নিরীহ যুবক, যিনি ইতিহাসে নিজের নাম লেখালেন রক্ত দিয়ে।

### শহীদকে নিয়ে নিকটজনদের অনুভূতি

"ছোটবেলায় বাবা-মা মারা গেলেও স্বভাব চরিত্রের দিক দিয়ে অনেক ভালো ছিলেন। পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক ছিল। সৎ ও হালাল উপার্জনের লক্ষ্যে ঢাকা গমন করলেও ভাইবোনদের খোঁজখবর রাখতেন।" এই অনুভব থেকেই স্পষ্ট, মহিউদ্দিন কেবল রক্ত নয়, রেখে গেছেন এক গভীর ভালোবাসার স্মৃতি।

শহীদ মহিউদ্দিনের গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া মানুষেরা সবসময় বড় কোনো পদে থাকা রাজনীতিবিদ হন না; তারা হন আমাদের আশপাশের সাধারণ মানুষ। যাঁদের চোখে থাকে স্বপ্ন, জীবনে থাকে সংগ্রাম আর হৃদয়ে থাকে দেশপ্রেম। মহিউদ্দিন, তোমার আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না।

### অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা

একটি শহীদ পরিবার যেন কখনো অভুক্ত না থাকেএই চেতনায় সমাজ ও রাষ্ট্রের উচিত শহীদ মহিউদ্দিনের পরিবারকে স্থায়ী আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। বড় ভাই আব্দুল মান্নান যেন দায়িত্বভার বহন করতে না করতে ভেঙে না পড়েন। একটি শহীদের পরিবারের ভবিষ্যৎ যদি অন্ধকারে ডুবে যায়, তবে শহীদের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়ে যায়।

## একনজরে শহীদ প্রোফাইল

| | |
|---|---|
| নাম | : মহিউদ্দিন |
| জন্মস্থান | : পশ্চিম ইলিশা, ভোলা |
| পিতা | : মৃত আবুল হাসেম বয়াতি |
| মাতা: | মৃত মল্লিকা খাতুন |
| পেশা | : মুদি দোকানের কর্মচারী |
| আহত হওয়ার তারিখ | : ৫ আগস্ট ২০২৪ |
| শহীদ হওয়ার তারিখ | : ৬ আগস্ট ২০২৪ |
| স্থান: | মিরপুর ২নং সেক্টর, ঢাকা |
| কার্যকারণ | : পুলিশের গুলিতে শহীদ |
| দাফন | : স্থানীয় কবরস্থান, ভোলা |

# রক্তাক্ত জুলাইয়ের সাক্ষী

-শহীদ মো: জাহিদ-এ-রহিম

**শহীদ মো: জাহিদ-এ-রহিম**

ক্রমিক : ৭৯৩

আইডি : ঢাকা সিটি: ১৩৮

**শহীদ পরিচিতি**

মো: জাহিদ-এ-রহিম একজন শান্ত স্বভাবের ব্যবসায়ী, একজন দায়িত্বশীল স্বামী, এক আদর্শ বাবা, আবার একইসাথে একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক, যিনি রাষ্ট্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজের পেশাগত জীবনে যতটাই নিবেদিত ছিলেন, সমাজের অসংগতি দেখলে ততটাই দ্রোহী হয়ে উঠতেন। জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে তিনি প্রমাণ করে গেছেন, ন্যায় ও সততার মূল্য কখনও বৃথা যায় না, যদিও এর বিনিময় হয় প্রাণ।

**জন্ম**

১৯৭৯ সালের ১২ জুলাই ঢাকা শহরের এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন জাহিদ-এ-রহিম। পিতা আব্দুর রহমান মন্ডল ও মাতা বেগম জরিনা মন্ডলের কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন তিনি। শৈশব থেকেই ছিলেন নম্র স্বভাবের, মিশুক ও আত্মপ্রত্যয়ী। তাঁর শেকড় ছিল জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি থানার দমদমা গ্রামে, যেখানে তাঁর পরিবারের আত্মিক টান আজও অটুট।

**কর্মজীবনের শুরু**

বয়স বাড়ার সাথে সাথে তিনি ব্যবসায়ী জীবনে প্রবেশ করেন। প্রতিষ্ঠা করেন নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ফীজা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল। পেশাগত জীবনে সততা ও নিষ্ঠার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, তেমনি মানুষের আস্থা অর্জন করেছিলেন। স্ত্রী শারমিন জাহিদ ও দুই সন্তান নিয়ে তাঁর জীবন ছিল সুসংগঠিত, যতটা সম্ভব স্থিতিশীল। বর্তমানে তাদের স্থায়ী ঠিকানা জয়পুরহাট হলেও পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন ঢাকার বাসাবো এলাকায় (পূর্ব বাসাবো, সবুজবাগ)। সেখানে তিনতলার একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকেন। বর্তমানে পরিবারটি দুশ্চিন্তায় দীন অতিবাহিত করছে। সন্তানদের বয়স অল্প হওয়ায় পিতার ব্যবসা বুঝে নিতেও পারছেনা।

**পরিবার ও অর্থনৈতিক বিবরণ**

মো: জাহিদ-এ-রহিম পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল চার। স্ত্রী ও দুই সন্তান। একমাত্র ছেলে দ্বাদশ শ্রেণিতে, মেয়ে নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। স্ত্রী শারমিন জাহিদ একজন গৃহিণী। শহীদ হওয়ার পর থেকেই পরিবারের আর্থিক অবস্থা চরম দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে। শারমিন জাহিদ আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতা, কিছু মানুষের সহানুভূতি এবং সীমিত সহায়তার উপর নির্ভর করেই দিনাতিপাত করছেন। তিনি বলেন, "ছেলে-মেয়ের পড়ালেখা চালিয়ে নিতে হিমসিম খেতে হচ্ছে আমাকে। কখনো আত্মীয়, কখনো প্রতিবেশীর সাহায্যে চলছে দিনকাল।"

**আন্দোলন ও প্রেক্ষাপট**

২০২৪ সালের জুলাই মাস। দেশে তখন কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে উত্তাল সময়। দেশের নানা প্রান্তে মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে ন্যায্য অধিকার আদায়ের দাবিতে। রাজধানী ঢাকাও সেই দাবির আগুনে জ্বলছিল। পরিস্থিতি ছিল অস্থির, থমথমে ও আতঙ্কজনক। এই অবস্থায় অনেকের মতো জাহিদ-এ-রহিমও সরাসরি আন্দোলনে

নামেননি, কিন্তু অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন বিবেকের জায়গা থেকে। সহিংস পরিস্থিতি বিবেচনায় তিনি ১৯ জুলাই কর্মস্থল থেকে বাড়ি না ফিরে বন্ধুর বাসায় অবস্থান করেন।

### শহীদ হওয়ার বর্ণনা

১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার। জাহিদ-এ-রহিম জুমার নামাজ শেষে শনির আখড়া এলাকায় এক পরিচিতের বাসায় যাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে ছিল বৈধ লাইসেন্সধারী পিস্তল, যা তিনি সবসময় নিজের নিরাপত্তার জন্য বহন করতেন। তখন শহরজুড়ে উত্তেজনা, গুজব ও সন্দেহের ঢল নেমেছিল। এই সময় কয়েকজন লোক তাঁর হাতে পিস্তল দেখে আতঙ্কিত হয় এবং সন্দেহভাজন হামলাকারী মনে করে তাঁর উপর অতর্কিত হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্র ও ভারী বস্তু দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়। বিকাল চারটায় আহত হন তিনি। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে, বিকাল পাঁচটায়, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাঁর প্রিয় শরীর চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছে সরদার বাড়ি কবরস্থান, বাসাবো, সবুজবাগে।

### শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

তার মৃত্যুর পরে প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা বলেন, "সে ছিল অনেক ভালো মানুষ। সবার খোঁজখবর রাখতো। ভাই-বোনদের সাথে সম্পর্ক ছিল মধুর। নিজের সংসার নিয়েই শুধু ভাবেনি, ভাবতো অন্যেদের নিয়েও।"

এক প্রতিবেশী বলেন, "আমরা এখনও বিশ্বাস করতে পারি না, সে আমাদের মাঝে নেই। এত ভদ্র, এত ভালোমানুষ এভাবে চলে যাবে?"

### শেষ কথা

শহীদ মো: জাহিদ-এ-রহিমের আত্মদান শুধু তাঁর পরিবারের জন্য নয়, দেশের জন্য এক গভীর প্রতীক হয়ে থাকবে। যে রাষ্ট্রের নাগরিকদের সচেতনতা ও ন্যায়ের জন্য জীবন দিতে হয়, সে রাষ্ট্রকে ভালোবাসার দায় প্রতিটি বিবেকবান মানুষের। জাহিদ এ-রহিম ছিলেন সেই ভালোবাসার এক জ্বলন্ত প্রদীপ।

### নিউজ মিডিয়ায় প্রকাশিত খবরের লিঙ্ক

1. https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/lastpage/106970
2. https://mzamin.com/news.php?news=153642

### অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা

শহীদ পরিবারের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট বিবেচনায় কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি:

১. সন্তানদের লেখাপড়া যাতে ব্যাহত না হয়, সেজন্য সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতায় শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করা।

২. বর্তমান বাসার পিছনে শহীদের নিজস্ব জমি রয়েছে। সেখানে একটি স্থায়ী ঘর নির্মাণ করে পরিবারকে নিরাপদ আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে।

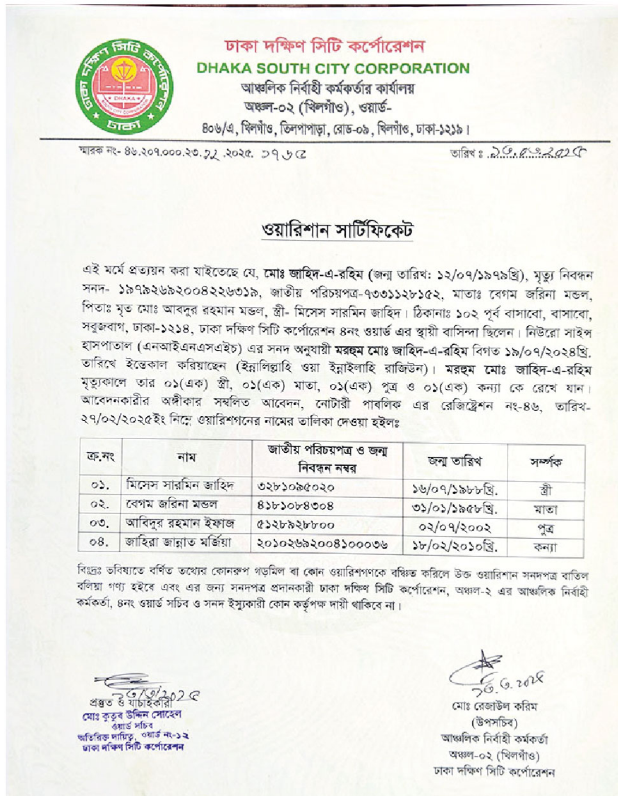

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
DHAKA SOUTH CITY CORPORATION
আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়
অঞ্চল-০২ (খিলগাঁও), ওয়ার্ড-
৪০৬/এ, খিলগাঁও, তিলপাপাড়া, রোড-০৯, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

স্মারক নং- ৪৬.২০৭.০০০.২৩.৭১.২০২৫. ১৭৬৫ তারিখ: ১৩.০৩.২০২৫

ওয়ারিশান সার্টিফিকেট

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, **মোঃ জাহিদ-এ-রহিম** (জন্ম তারিখ: ১২/০৭/১৯৭৯খ্রি), মৃত্যু নিবন্ধন সনদ- ১৯৭৯২৬৯২০০৪২২৬৩১৯, জাতীয় পরিচয়পত্র-৭৩৩১১২৮১৫২, মাতাঃ বেগম জরিনা মন্ডল, পিতাঃ মৃত মোঃ আবদুর রহমান মন্ডল, স্ত্রী- মিসেস সারমিন জাহিদ। ঠিকানাঃ ১০২ পূর্ব বাসাবো, বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ৪নং ওয়ার্ড এর স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। নিউরো সাইন্স হাসপাতাল (এনআইএনএসএইচ) এর সনদ অনুযায়ী **মরহুম মোঃ জাহিদ-এ-রহিম** বিগত ১৯/০৭/২০২৪খ্রি. তারিখে ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন)। **মরহুম মোঃ জাহিদ-এ-রহিম** মৃত্যুকালে তার ০১(এক) স্ত্রী, ০১(এক) মাতা, ০১(এক) পুত্র ও ০১(এক) কন্যা কে রেখে যান। আবেদনকারীর অঙ্গীকার সম্বলিত আবেদন, নোটারী পাবলিক এর রেজিস্ট্রেশন নং-৪৬, তারিখ-২৭/০২/২০২৫ইং নিম্নে ওয়ারিশগনের নামের তালিকা দেওয়া হইলঃ

| ক্র.নং | নাম | জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্ম নিবন্ধন নম্বর | জন্ম তারিখ | সম্পর্ক |
|---|---|---|---|---|
| ০১. | মিসেস সারমিন জাহিদ | ৩২৮১০৯৫০২০ | ১৬/০৭/১৯৮৮খ্রি. | স্ত্রী |
| ০২. | বেগম জরিনা মন্ডল | ৪১৮১০৮৪৩০৪ | ৩১/০১/১৯৫৮খ্রি. | মাতা |
| ০৩. | আবিদুর রহমান ইফাজ | ৫১২৮৯২৮৮০০ | ০২/০৭/২০০২ | পুত্র |
| ০৪. | জাহিরা জান্নাত মর্জিয়া | ২০১০২৬৯২০০৪১০০০৩৬ | ১৮/০২/২০১০খ্রি. | কন্যা |

বিঃদ্রঃ ভবিষ্যতে বর্ণিত তথ্যের কোনরূপ গড়মিল বা কোন ওয়ারিশগণকে বঞ্চিত করিলে উক্ত ওয়ারিশান সনদপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং এর জন্য সনদপত্র প্রদানকারী ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, অঞ্চল-২ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, ৪নং ওয়ার্ড সচিব ও সনদ ইস্যুকারী কোন কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না।

প্রস্তুত ও যাচাইকারী
মোঃ কুতুব উদ্দিন সোহেল
ওয়ার্ড সচিব
অতিরিক্ত দায়িত্ব, ওয়ার্ড নং-১২
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ রেজাউল করিম
(উপসচিব)
আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা
অঞ্চল-০২ (খিলগাঁও)
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

BANGLADESH
BANGLADESH

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

**ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন**

ওয়ার্ড নং-০৪

ক্রমিক নং 458 **মৃত্যু সনদ** তারিখ : ২৮/৮/২৪

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, জনাব/জনাবা মো: জাহিদ-এ-রহিম

পিতা/স্বামী : মো: আবদুর রহমান মন্ডল মাতা : বেগম জরিনা মন্ডল

বর্তমান ঠিকানা : ১০২ পূর্ব বাসাবো, বাসাবো, থানা : সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : ঐ ডাকঘর : বাসাবো, থানা : সবুজবাগ জেলা : ঢাকা।

জাতীয় পরিচয়পত্র / জন্ম নিবন্ধন নং : ৭৩৩১১২৮১৫২ আমার পরিচিত। তিনি ৪নং ওয়ার্ডের একজন স্থায়ী / অস্থায়ী বাসিন্দা এবং জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। ডাক্তার/হাসপাতালের সনদ অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর তারিখ ১৭/৭/২৪

সময় ........ মৃত্যুর কারণ দুর্ঘটনা

মৃত্যুর স্থান শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ।

আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
কাউন্সিলর
ওয়ার্ড নং-০৪, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

সংযুক্তি : ডাক্তার / হাসপাতালের মৃত্যুর সনদ।

## একনজরে শহীদ মো: জাহিদ-এ-রহিমের প্রোফাইল

| | |
|---|---|
| নাম | : মো: জাহিদ-এ-রহিম |
| জন্ম তারিখ | : ১২-৭-১৯৭৯ |
| জন্মস্থান | : ঢাকা |
| পেশা | : ব্যবসায়ী |
| কর্মরত প্রতিষ্ঠান | : ফীজা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল |
| স্থায়ী ঠিকানা | : গ্রাম: দমদমা, ইউনিয়ন: বালিঘাটা, ৫ নং ওয়ার্ড, থানা: পাঁচবিবি, জেলা: জয়পুরহাট |
| বর্তমান ঠিকানা | : #১০২, ৩য় তলা, পূর্ব বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা সিটি দক্ষিণ |
| পিতা | : আব্দুর রহমান মন্ডল |
| মাতা | বেগম জরিনা মন্ডল |
| স্ত্রী | : মিসেস শারমিন জাহিদ, পেশা: গৃহিনি, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এস.এস.সি |
| পরিবারের সদস্য | : ৩ জন, স্ত্রী, ১ ছেলে, ১ মেয়ে |
| ঘটনার স্থান | : শনির আখড়া, যাত্রাবাড়ি |
| আক্রমণের ধরণ | : ধারালো ও ভারী বস্তুর আঘাত |
| আহত হওয়ার তারিখ | : ১৯ জুলাই ২০২৪ |
| সময় | : বিকাল ০৪টা |
| শহীদ হওয়ার তারিখ | : ১৯ জুলাই ২০২৪, সময়: বিকাল ০৫টা |
| শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান | : সরদার বাড়ি কবরস্থান, বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা |

# চিকিৎসা না পেয়ে মারা গেলেন জুলাই যোদ্ধা ইমরান

## শহীদ ইমরান হোসেন

ক্রমিক: ৭৯৪

আইডি: ময়মনসিংহ বিভাগ: ০৮১

### শহীদ পরিচিতি

ইমরান হোসেন একজন সাধারণ মানুষ, কিন্তু এক অসাধারণ আত্মত্যাগের প্রতীক। তাঁর জন্ম ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার মুশলী ইউনিয়নের চপই মোহনপুর গ্রামের এক সাধাসিধে পরিবারে। পিতার নাম ইসলাম ইমুদ্দিন। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে ইমরান গাজীপুরের তারাগাছ এলাকায় বসবাস শুরু করেন স্ত্রী ও ১৮ মাস বয়সী শিশুসন্তানকে নিয়ে। জীবনের চাকা সচল রাখতে তিনি প্রায় সাত বছর ধরে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করে যাচ্ছিলেন। যন্ত্রের মত জীবন চালিয়ে গেলেও তাঁর হৃদয় ছিল দেশের মানুষের মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নিবেদিত।

**যেভাবে তিনি শহীদ হলেন**

ইমরান হোসেন ছিলেন সেইসব সাহসী মানুষের একজন, যাঁরা ২০২৪ সালের 'জুলাই বিপ্লব' বা গণ-অভ্যুত্থানে নিজেদের জীবনের পরোয়া না করে রাজপথে নেমেছিলেন। গত ১৮ জুলাই ২০২৪, বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কালো দিন, যেদিন গাজীপুরে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে মিছিল করছিলো ইমরান ও তাঁর সহকর্মীরা। তারা বিশ্বাস করতেন এই দেশটা তাদের, মানুষের রক্ত-ঘামে গড়া; তাই শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব। সেদিনের সেই বিক্ষোভে অতর্কিতভাবে গুলিবর্ষণ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গুলির ঝাঁকে ক্ষতবিক্ষত হয় ইমরান হোসেনের শরীর বুক, পিঠ, চোখ ও শরীরের নানা অংশে গুলির আঘাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সহযোদ্ধারা তাঁকে দ্রুত স্থানীয় এক হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু রাষ্ট্রের ভয়ে, হয়রানির আতঙ্কে হাসপাতালে বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি তিনি। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই রাতের আঁধারে হাসপাতাল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর থেকে শুরু হয় তাঁর এক নিঃসঙ্গ, নিঃশব্দ যুদ্ধ। বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করিয়েছেন, শরীর থেকে গুলি বের করেছেন কিন্তু যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাননি কখনোই। এরপরও থেমে যাননি ইমরান। শরীরের রক্তাক্ত ক্ষত বয়ে নিয়ে প্রতিদিনের জীবিকার যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। পরিবারকে নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছেন, সন্তানকে বুকের পাশে আগলে রেখেছেন। কিন্তু যে বুক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় গর্জে উঠেছিল একদিন, সেই বুকে গভীর ক্ষত ছিল; সে ক্ষত শুধু শারীরিক ছিল না, ছিল এক অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি। এইভাবে প্রায় এক বছর ধরে মৃত্যুকে বুকে ধারণ করে তিনি বেঁচে ছিলেন। অবশেষে, দীর্ঘ সেই যন্ত্রণা আর মৃত্যুর দিকে হেলে যাওয়া দিনশেষে তিনি শহীদ হন। ১৩ জুন ২০২৫, শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে গাজীপুরের তারাগাছ এলাকার ভাড়া বাসায় ইমরান হোসেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এক বুক স্বপ্ন, এক বুক যন্ত্রণা আর এক গভীর ভালোবাসা নিয়ে তিনি চলে গেলেন এই পৃথিবী থেকে। পরদিন ভোরেই তাঁর নিথর দেহ নিয়ে আসা হয় চপই মোহনপুর গ্রামে। গ্রামজুড়ে তখন এক নীরব বিষাদ। দুপুর ২:০০ টায়, ১৪ জুন ২০২৫, পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। সেখানে কাঁদছিলেন মা-বাবা, স্ত্রী, শিশু সন্তান ও এলাকার মানুষজন যাঁরা আজও বিশ্বাস করতে পারছেন না, যে ইমরান আর কখনও বাড়ির উঠোনে পা রাখবে না।

শহীদ ইমরান হোসেন আমাদের জন্য শুধু একজন ব্যক্তি নন; তিনি প্রতীক একজন সাহসিকতার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দৃঢ়তা, নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার সাহস। তাঁর আত্মত্যাগ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এদেশের মাটিতে এখনও এমন সন্তান জন্ম নেয়, যারা বুকে গুলি নিয়েও মাথা নত করে না। ইমরানের মতো শহীদদের রক্তে যে গণতন্ত্র, যে ন্যায়ের স্বপ্ন গাঁথা আছে, তা একদিন বাস্তব হবে এই আশা নিয়েই আমরা তাঁদের গল্প বলি, স্মরণ করি এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দিই তাঁদের অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগের চিহ্ন।

**পরিবারের অভিমত**

ইমরানের স্ত্রী রিতা আক্তার জানান, তাঁর স্বামী জুলাই যুদ্ধে আহত হলেও নিজেকে কখনো জাহির করতেন না। সবসময় বলতেন, নতুন একটা দেশ তো পেয়েছি। মাঝেমধ্যে ভীষণ অসুস্থ হয়ে

6/16/25, 12:29 PM চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন জুলাই যোদ্ধা

যুগান্তর

প্রিন্ট: ১৬ জুন ২০২৫, ১২:২৫ পিএম

সারাদেশ

**চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন জুলাই যোদ্ধা**

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
প্রকাশ: ১৪ জুন ২০২৫, ০৯:১৯ পিএম

নিহত ইমরান হোসাইন। ছবি: যুগান্তর

ময়মনসিংহের নান্দাইলে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত ইমরান হোসাইনের (৩০) মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (১৪ জুন) দুপুর ২টায় নান্দাইল উপজেলার মুশুল্লী ইউনিয়নের চপই মোহনপুর নিজ গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়েছে।

ইমরান চপই মোহনপুর গ্রামের ইসলাম উদ্দিনের ছেলে। পেশায় একজন গার্মেন্টিসকর্মী ছিলেন। পরিবারে তার স্ত্রী ও এক সন্তান রয়েছেন।

https://www.jugantor.com/country-news/965307 1/2

গেলেও কেউ কখনো খবর নেয়নি। টাকার অভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও করানো যায়নি। তাঁর সঙ্গে যারা আহত ও নিহত হয়েছিল, সবাই তালিকাভুক্ত হওয়া ছাড়াও সরকারের সব ধরনের অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে। কিন্তু তাঁর স্বামীর খবর কেউ নেয়নি।

বাবা ইসলাম ইমুদ্দিন বলেন, **'বেহেই কইছে, আমার ছেড়া যুদ্ধ কইরা আহত অইছে। অহন সরকার খোঁজখবর নিবো, এমনকি অনেক কিছু দিবো। কিন্তু গত ১১ মাসে একটা বারের লাইগ্যাও কেউ আমার খোঁজ নিলো না। ছেড়াডা অসুখ লইয়া ঈদো বাড়িত আইছিন। পরদিনই চইল্যা গেছে। যাওনের সময় কইয়া গেছে, আরেকবার আইলে ঘরডা ঠিকঠাক করবো। অহন হে তো আর বাড়িত আইতো না।'**

ভগ্নিপতি খোকন মিয়ার ভাষ্য অনুযায়ী, ইমরানের শরীরে একাধিক গুলির ক্ষত ছিল বুকে দুটি, চোখে একটি ও অন্যান্য স্থানে আরও। কিন্তু চিকিৎসা না পেয়ে শারীরিক অবস্থা দিনদিন খারাপ হতে থাকে। সে নিজের নাম তালিকায় তোলার জন্য কোথাও যেতে রাজি ছিল না। সেটা তার আত্মসম্মানের বিষয় ছিল।

### বিশেষ ব্যক্তিদের অভিমত

ইমরান মারা যাওয়ার খবর পেয়ে ১৪ জুন ২০২৫ শনিবার তাঁর গ্রামের বাড়িতে যান সমন্বয়ক আশিকিন আলম। চিকিৎসার সব কাগজ দেখে শতভাগ নিশ্চিত, ইমরান একজন জুলাই যোদ্ধা। তালিকায় নাম না থাকলেও এখন সংশ্লিষ্ট জায়গায় আবেদন করা হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. ফয়জুর রহমান জানান, মারা যাওয়ার খবর পেয়ে তিনি ইমরানের বাড়িতে যান। সেখানে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। পরে আহত হওয়ার সময় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় বেশ কিছু কাগজপত্র দেখানো হয়। এতে প্রমাণ হয়, ইমরান জুলাই যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন।

### শেষ কথা

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেয়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যে সকল সুযোগ সুবিধার বাইরে রয়েছে তার জ্বলন্ত উদাহরণ ইমরান হোসাইন। গার্মেন্টস কর্মী ইমরান হোসাইনের নাম জুলাই বিপ্লবে আহতের তালিকায় উঠেনি। পাননি কোন উন্নত চিকিৎসাও। প্রায় ১১ মাস ক্ষত নিয়ে নিজ বাসায় কষ্ট পেয়েছেন এই জুলাই যোদ্ধা।

কালের কণ্ঠ ই-পেপার

/ খবর

প্রকাশ: ১৫ জুন, ২০২৫ ০০:০০

**চিকিৎসা না পেয়ে মারা গেলেন জুলাই যোদ্ধা ইমরান**

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

অ + অ -

ইমরান হোসেন

জুলাই বিপ্লবে বুক, পিঠ, চোখ ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের গুলি খেয়ে যন্ত্রণায় ভুগছিলেন ইমরান হোসেন (২৬)। আহত হয়ে দুই দিন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফিরে একরকম বিনা চিকিৎসায় জীবনযুদ্ধ চালিয়ে আসছিলেন। অবশেষে জীবনযুদ্ধে হেরে গেলেন। গত শুক্রবার রাত ১২টার দিকে গাজীপুরের ভাড়া বাসায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রাতেই তাঁর মরদেহ আনা হয় গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের নান্দাইলের মুশলী ইউনিয়নের মোহনপুর গ্রামে। পরে গতকাল দুপুরে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

## একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

পুরো নাম : ইমরান হোসাইন
বয়স : ৩০ বছর
পেশা : গার্মেন্টস শ্রমিক
স্ত্রী : রিতা আক্তার, পেশা: গৃহিণী
সন্তান : ০১ জন, বয়স: ১৮ মাস
পিতা : ইসলাম ইমুদ্দিন
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা : জেলা: ময়মনসিংহ, উপজেলা: নান্দাইল, ইউনিয়ন: মুশলী, গ্রাম: চপই মোহনপুর
আহত : ১৮ জুলাই ২০২৪, স্থান: গাজীপুর
আক্রমণকারী : পুলিশ
আঘাতের ধরণ : শরীরে একাধিক গুলির ক্ষত, বুকে দুটি গুলি, ও চোখে একটি গুলি (ভগ্নিপতি খোকন মিয়ার ভাষ্যমতে)
শাহাদত : তারিখ: শুক্রবার, ১৩ জুন ২০২৫, সময়: রাত ১২টা, তারগাছ, গাজীপুর (ভাড়া বাসা)
জানাজা : ১৪ জুন ২০২৫ দুপুর ২:০০টা
দাফন : নিজ গ্রাম

**প্রস্তাবনা**

১. স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ
২. শহীদ স্ত্রীকে কর্মসংস্থান
৩. শহীদের একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যতের লেখাপড়ার সকল খরচ বহন
৪. শহীদের পিতামাতাকে এককালীন সহযোগিতা

## শহীদ সাইফ আরাফাত শরীফ

ক্রমিক: ৭৯৫

আইডি: ঢাকা বিভাগ: ১৫৮

### শহীদ পরিচিতি

সাইফ আরাফাত শরীফ। জন্ম ২০০৪ সালের ১০ মার্চ, নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার কদমির চর গ্রামে। জীবনের শুরু থেকে সংগ্রামই ছিল তার নিত্যসঙ্গী। পরিবারে অভাব ছিল প্রতিদিনকার বাস্তবতা, আর অসুস্থ বাবার ভার কাঁধে নিয়ে ছোটবেলা থেকেই দায়িত্ব নিতে হয়েছিল তাকে।

### শৈশব ও পরিবারের ছবি

পিতা কোভিদ হোসেন, শারীরিকভাবে দুর্বল ও কর্মক্ষমতাহীন। মাতা মরিয়ম বেগম গৃহিণী; সংসারের প্রতিটি দুঃসময়ে ছেলেকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। দুই বোনের একমাত্র ভরসা ছিল এই তরুণ। ছোটবোন বলেন **"ভাই ছিল আমাদের পরিবারের সবার আদরের। সে না থাকায় আমাদের পুরো পরিবার এলোমেলো হয়ে গেছে। ভাইকে ছাড়া বেঁচে তো আছি ঠিকই, কিন্তু ভালো নেই আমরা।"**

### কর্মজীবন ও জীবনের লড়াই

জীবিকার তাগিদে সাইফ আরাফাত অনলাইনে ব্যবসা শুরু করেন। **'ইভিকন'** নামে একটি অনলাইন প্রতিষ্ঠানেই কাজ করতেন। যাত্রাবাড়ীতে মদিনা মসজিদের গলিতে ভাড়া বাসায় থাকতেন মায়ের সাথে। সংসারের প্রতিটি খরচ তাকেই চালাতে হতো। এক অর্থে তিনিই ছিলেন পুরো পরিবারের প্রাণভোমরা।

### আন্দোলনের ময়দানে এক সাহসী যোদ্ধা

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট। এক অভূতপূর্ব গণআন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে দেশের শহর থেকে শহরতলি। বৈষম্যের বিরুদ্ধে তরুণদের এই জাগরণে সামনে এসে দাঁড়ায় কিছু সাহসী কিশোর-তরুণ, যাদের অন্যতম ছিলেন সাইফ আরাফাত। বিজয়ের পরদিনও বসে থাকেননি তিনি। বন্ধুদের নিয়ে সকালের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে, রাতের পাহারায় থানার বাইরে সর্বত্র ছুটে বেড়িয়েছেন সেবার দায়িত্বে।

### একটি রক্তাক্ত রাতের বর্ণনা

১৩ আগস্ট বিকালে, যাত্রাবাড়ী থানার পাশে ছাত্র ছদ্মবেশে ১৫-২০ জনের একটি ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী দল আসে। তারা নিজেদের থানা পাহারায় সাহায্যকারী হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু বাস্তব উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তারা টার্গেট করে সাইফ আরাফাত শরীফ ও শহীদ সাইদুল ইসলাম ইয়াসিনকে কারণ তারাই নেতৃত্ব দিচ্ছিল ছাত্রদের। রাত গভীর হলে অধিকাংশ ছাত্র

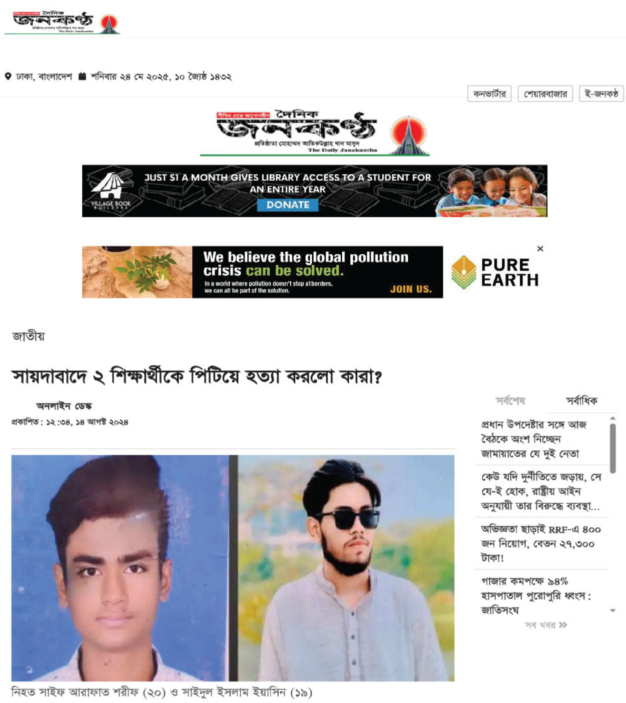

দৈনিক জনকণ্ঠ

ঢাকা, বাংলাদেশ  শনিবার ২৪ মে ২০২৫, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

কনভার্টার | শেয়ারবাজার | ই-জনকণ্ঠ

দৈনিক জনকণ্ঠ
প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ
The Daily Janakantha

JUST $1 A MONTH GIVES LIBRARY ACCESS TO A STUDENT FOR AN ENTIRE YEAR
DONATE
VILLAGE BOOK BUILDERS

We believe the global pollution crisis can be solved.
In a world where pollution doesn't stop at borders, we can all be part of the solution.
JOIN US.
PURE EARTH

জাতীয়

সায়দাবাদে ২ শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে হত্যা করলো কারা?

অনলাইন ডেস্ক
প্রকাশিত : ১২ :৩৪, ১৪ আগষ্ট ২০২৪

নিহত সাইফ আরাফাত শরীফ (২০) ও সাইদুল ইসলাম ইয়াসিন (১৯)

সর্বশেষ | সর্বাধিক

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আজ বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন জামায়াতের যে দুই নেতা

কেউ যদি দুর্নীতিতে জড়ায়, সে যে-ই হোক, রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা...

অভিজ্ঞতা ছাড়াই RRF-এ ৪০০ জন নিয়োগ, বেতন ২৭,৩০০ টাকা!

গাজার কমপক্ষে ৯৪% হাসপাতাল পুরোপুরি ধ্বংস : জাতিসংঘ

সব খবর >>

বাড়ি ফিরলেও সাইফ ও অল্প কয়েকজন থেকে যান। ভোর ৩:৩০ টার দিকে শেষবার বাসায় ফোন করে বলেন, **"ভোরে ফিরে আসব, চিন্তা কোরো না মা।"** ভোর ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে, সাইফ ও ইয়াসিন এক দোকান থেকে পানি কিনে ফেরার পথে অতর্কিত হামলায় পড়ে। ছাত্রলীগের সেই দল নির্মমভাবে সাইফকে মারধর করে, শরীরের নানা স্থানে গুরুতর আঘাত করে থানার সামনে ফেলে রেখে যায়।

### শেষ নিঃশ্বাসের পথে

সকালে একটি অচেনা নাম্বার থেকে ফোন আসে। ছাত্রলীগের একজন সন্ত্রাসী-ই কল করে জানায়: "আপনার ছেলেকে কেউ মারধর করে থানার কাছে ফেলে রেখে গেছে।" মা মরিয়ম বেগম ছুটে যান থানায়। ছেলেকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। জিজ্ঞেস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: সাইফ আরাফাত শরীফ
Name: SAIF ARAFAT SARIF
পিতা: মোঃ কবির হোসেন
মাতা: মোসাঃ মরিয়ম
Date of Birth: 10 Mar 2004
ID NO: 9176824937

করলে ইশারায় কয়েকজন ছেলে দেখিয়ে দেন যারা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলের অবস্থা খারাপ দেখে প্রথমে স্থানীয় একটি প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে যান, কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

সেখানে ১৪ আগস্ট ২০২৪, সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে সাইফ আরাফাত শরীফ শহীদ হন। ফ্লোরে পড়ে থাকা ছেলের নিঃশেষ দেহ যখন মা বুকে জড়িয়ে ধরেন, তখন চারপাশ নিস্তব্ধ। রক্তমাখা কিশোরটি চিরতরে নীরব হয়ে যায়।

### অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট: শোকের ঋণ ও বাস্তবতা

এই তরুণ শহীদের মৃত্যু তার পরিবারকে এক গভীর অন্ধকারে ঠেলে দেয়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্যের মৃত্যুতে তারা আজ দিশেহারা। মায়ের বুক খালি, দুই বোন আজ ভাইহারা। কোনো স্থায়ী বাসস্থান নেই, আয় নেই, তবু বুকভরা গর্ব নিয়ে মা বলেন "ছেলেটা দেশের জন্য মরে গেল, আমি গর্বিত কিন্তু আমার সংসার কীভাবে চলবে?"

## একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

| | |
|---|---|
| শহীদের পূর্ণ নাম | : সাইফ আরাফাত শরীফ |
| জন্ম তারিখ | : ১০ মার্চ ২০০৪ |
| জন্মস্থান | : আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ |
| পেশা | : ব্যবসায়ী (অনলাইন) |
| কর্মরত প্রতিষ্ঠান | : ইভিকন |
| স্থায়ী ঠিকানা | : গ্রাম: কদমির চর, ইউনিয়ন: কালাপাহাড়িয়া : থানা: আড়াইহাজার, জেলা: নারায়ণগঞ্জ |
| বর্তমান ঠিকানা | : মহল্লা: মদিনা মসজিদের গলি, এলাকা: যাত্রাবাড়ী : জেলা: ঢাকা, (দক্ষিণ সিটি) |
| পিতার নাম | : কোভিদ হোসেন, বয়োবৃদ্ধ |
| মায়ের নাম | : মরিয়ম বেগম, পেশা: গৃহিণী |
| পরিবারের সদস্য | : বোন: ২ |
| ঘটনার স্থান | : যাত্রাবাড়ী থানার সামনে, ঢাকা |
| আক্রমণকারী | : ছাত্রলীগ |
| আক্রমণের ধরণ | : শরীরে জখম, মারাত্মক আঘাত |
| আহত হওয়ার তারিখ | : ১৪ আগস্ট ২০২৪, সময়: ভোর ৫:০০-৬:০০ টা |
| শহীদ হওয়ার তারিখ | : ১৪ আগস্ট ২০২৪, সময়: সকাল ১০:১৫ মিনিট |
| শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান | : নিজগ্রাম |
| আন্দোলনে ভূমিকা | : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য, ট্রাফিক ও নিরাপত্তায় অংশগ্রহণ |
| আক্রমণকারীর পরিচয় | : ছাত্রলীগের ছদ্মবেশী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী |
| কবরস্থান | : নিজ গ্রাম, কদমির চর |
| অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা | : পরিবারকে এককালানী প্রদান মা-বাবার চিকিৎসা ব্যায় প্রদান । |

**সাইফ আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তার রক্তে রাঙানো পথ আজও বলছে "আমি মরিনি, আমি হয়ে গেছি পতাকার ছায়া।"**

# আমার স্বামী দেশের জন্য শহীদ হয়েছেন

**শহীদ মোঃ কামরুজ্জামান**
ক্রমিক: ৭৯৬
আইডি: ময়মনসিংহ বিভাগ: ০৮১

### শহীদ পরিচিতি

শহীদ কামরুজ্জামান ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার চর কামারিয়া গ্রামে সৌদি আরব প্রবাসী মো. আব্দুর রাজ্জাকের দ্বিতীয় ছেলে। দাম্পত্য জীবনে কামরুজ্জামান দুই ছেলে ও এক মেয়ে মেয়ের বাবা। বাবাহারা সন্তানদের এখন একমাত্র সঙ্গী মা সামিরা জাহান পপি। স্বামীকে হারিয়ে তিন শিশু সন্তান নিয়ে বিপাকে এই নারী। শহীদ কামরুজ্জামান ঢাকার উত্তরায় ভাড়া বাসায় থেকে প্রাইভেট কার চালাতেন। তবে জুলাই বিপ্লবের কিছুদিন আগে তিনি পোল্যান্ড যাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। এরই মাঝে দেশে আন্দোলন শুরু হলে রাজধানীর উত্তরায় ছাত্রদের সঙ্গে মিছিলে অংশ নেন।

### আন্দোলন ও শাহাদতের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের ৪ আগস্ট। উত্তাল রাজধানী ঢাকার উত্তরায় রাস্তায় নেমেছিল হাজারো প্রতিবাদী মুখ। রাষ্ট্রের অবিচার আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল ছাত্র-জনতা। সেই জনতার ভীড়ে ছিলেন একজন সাহসী তরুণ কামরুজ্জামান। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছিল তার স্বভাবে। বুকভরা স্বপ্ন আর চোখভরা প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি অংশ নিয়েছিলেন সেই আন্দোলনে, যেখানে দাবি ছিল ন্যায়ের, অধিকার ছিল সত্যের। কিন্তু সেদিন উত্তরার রাস্তায় কথা বলেছিল গুলি। সেই গুলির নিশানা হয়েছিল কামরুজ্জামান। মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিদ্ধ হয় আটটি গুলি। জনসমুদ্রের মাঝে এক সাহসী কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু এই ঘটনার পরও পাওয়া যায়নি তার খোঁজ। পরবর্তী ১৫ দিন ধরে পরিবার ও স্বজনেরা খুঁজে ফিরেছেন তাকে হাসপাতাল, পুলিশ স্টেশন কোথাও ছিল না কোনো সন্ধান। যেন তাকে গ্রাস করে নিয়েছিল নিস্তব্ধ অন্ধকার।১৯ আগস্ট ২০২৪, রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে হঠাৎ এক অজানা লাশের খবর পেয়ে ছুটে যান পরিবারের সদস্যরা। পরিচয় মেলে এ সেই কামরুজ্জামান, যার জন্য কাঁদছিল মা, স্ত্রী, সন্তান। জেগে ছিল এক প্রতিবাদমুখর জাতি। গুলির ক্ষতচিহ্ন তখনও সাক্ষ্য দিচ্ছিল তার ওপর চালানো নৃশংসতার। একদিন পর, ২০ আগস্ট ২০২৪ নিজগ্রামের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। পরিবারের কান্নায়, প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধায়, বন্ধুবান্ধবের ভালোবাসায় শেষ বিদায় জানানো হয় তাকে। তার কবরের মাটিতে মিশে যায় এক সাহসী স্বপ্নবাজ তরুণের রক্তে রাঙানো অধ্যায়। শুধু মৃত্যু নয়, কামরুজ্জামানের জীবন ও শাহাদত হয়ে থাকে এক অনন্ত চেতনার নাম। তিনি হারিয়ে যাননি, বরং রয়ে গেছেন আন্দোলনের প্রতিটি শ্লোগানে, প্রতিটি সাহসী বুকে একজন শহীদ হয়ে।

### পরিবার ও প্রতিবেশীর অভিমত

কামরুজ্জামানের স্ত্রী শারমীন জাহান পপি বলেন, প্রতিদিনই স্বামীর সঙ্গে কথা হতো। গত ৪ আগস্ট ব্যস্ততার কারণে সকালে আমার কথা হয়নি। পরে বেলা ২টার দিকে কল দিলে অপরিচিত এক ব্যক্তি রিসিভ করে জানান, কামরুজ্জামান আহত হয়েছেন। আমার স্বামী কোথায় তা আর তিনি বলতে পারেননি। এরপর থেকে আমার স্বামীর ফোনটাও বন্ধ ছিল। আমরা সরকারি যত মেডিকেল আছে

শহীদ কামরুজ্জামান

১৫ দিন পর মর্গে মেলে রক্তাক্ত লাশ

বাবার সঙ্গে ঘুমানোর বায়না ধরে শিশুসন্তানরা

শহীদের সন্তানদের দায়িত্ব নিতে সরকারকে আহবান

সবগুলোতে খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাইনি। এরপর ১৯ আগস্ট ২০২৪ ঢাকার শেরেবাংলা থানার উপপরিদর্শক মুহিবুল্লাহ আমার স্বামীর মৃত্যুর বিষয়টি অবগত করেন। পরে আমরা সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গ থেকে লাশ গ্রহণ করি।

দাফনের আগে মাথা ও শরীরজুড়ে আটটি গুলির রক্তাক্ত ক্ষত দেখতে পাই। আমার স্বামী দেশের জন্য শহীদ হয়েছেন। এখন আমি চাই সরকার আমার সন্তানদের দায়িত্ব নিক।

পপির বড় ভাই জাহাঙ্গীর আলম বলেন, এ ঘটনায় ময়নাতদন্ত করে লাশ দাফন করা হয়েছে। আমরা চাই বাবাহারা এই এতিমদের পাশে দাঁড়াক সরকার।

গফরগাঁও উপজেলার চরআলগী ইউনিয়নের চরকামারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, ঢাকা থেকে পুলিশের এক কর্মকর্তা আমার কাছে ফোন করে কামরুজ্জামানের ছবি পাঠায়। ওই ছবি দেখে চিনতে পেরে কামরুজ্জামানের পরিবারকে জানাই। তারা লাশ শনাক্ত করে বাড়িতে এনে দাফন করে।

### সন্তানদের অব্যক্ত অনুভূতি

জারিন রশ্মির বয়স মাত্র ১১, মেজো ছেলে আফনান আল জামানের বয়স আট বছর ও ছোট্ট গালিব আবরাবের বয়স মাত্র ১৩ মাস। এতটুকু বয়সেই বাবাহারা এই তিন শিশু। রোজ রাতে বাবার সঙ্গে ঘুমানোর বায়না ধরে জারিন ও গালিব। সকালে ঘুম ভাঙলে বাবাকে না পেয়ে রোজই মন খারাপ করে থাকে এই এতিম ভাইবোন। তাদের এই কাকুতি-মিনতি পরিবারের অন্যদেরও শোককে জাগিয়ে তোলে।

### অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা

শহীদ মো: কামরুজ্জামানের আত্মত্যাগ দেশের গণতন্ত্র ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তার অনাকাঙ্ক্ষিত শাহাদতের ফলে স্ত্রী ও তিন শিশুসন্তান অর্থনৈতিকভাবে চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের প্রতি নিম্নোক্ত মানবিক ও অর্থনৈতিক সহায়তার প্রস্তাবনা রাখা হলো:

১. শহীদ পরিবারের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান: শহীদ পরিবারকে মাসিক ন্যূনতম ১৫,০০০ টাকা জীবিকা সহায়তা ভাতা প্রদানের দাবি জানানো হচ্ছে। ভাতার অন্তর্ভুক্ত থাকুক খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও আবাসন বাবদ সহায়তা।

২. সন্তানদের শিক্ষাব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিতে: শহীদ কামরুজ্জামানের তিন সন্তান (জারিন - ১১, আফনান - ৮, গালিব - ১৩ মাস) যেন বিনামূল্যে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও বৃত্তির আওতাভুক্ত হয়। উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষাব্যয় সরকার বহন করবে এমন একটি স্থায়ী ট্রাস্ট ফান্ড গঠন প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৩. স্থায়ী আবাসন ব্যবস্থা: শহীদ পরিবারের নামে নিজ এলাকায় একটি ঘর নির্মাণ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

৪. স্ত্রীর কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া।

৫. আইনি সহায়তা ও তদন্ত দাবি: কামরুজ্জামানের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার স্বচ্ছ তদন্ত ও দায়ীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে একটি বিচারিক কমিটি গঠনের প্রস্তাবনা রাখা হলো।

**নিউজ মিডিয়ায় প্রকাশিত খবরের লিঙ্ক**

1. https://bdtoday.net/national/35110

2.https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/730603

বাংলাদেশ

# পোল্যান্ডে যাওয়া হলো না ছাত্র আন্দোলনে নিহত কামরুজ্জামানের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, গফরগাঁও**

প্রকাশিত: ১৪:৩০, ২১ আগস্ট ২০২৪

আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে ঢাকায় উত্তরায় সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মোঃ কামরুজ্জামান (৩০) নিহত হয়েছেন।

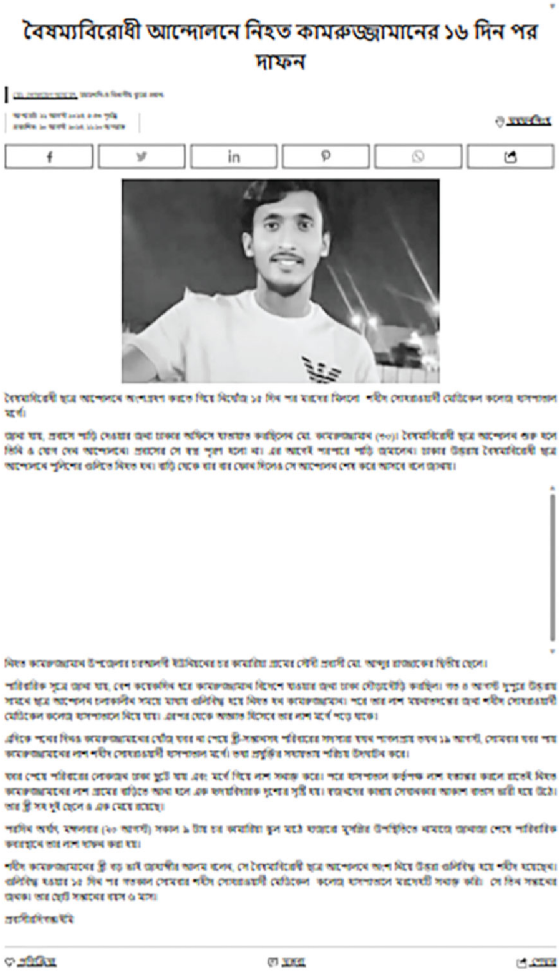

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নিহত কামরুজ্জামানের ১৬ দিন পর দাফন

শহীদ কামরুজ্জামানের মাথা ও শরীরে ছিল ৮ গুলির ক্ষত



শহীদ কামরুজ্জামান

## এক নজরে শহীদ মো: কামরুজ্জামান

| | |
|---|---|
| নাম | : মো: কামরুজ্জামান |
| জন্মস্থান | : চর কামারিয়া গ্রাম, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ |
| পেশা | : প্রাইভেট কার চালক (ঢাকা, উত্তরা) |
| পারিবারিক অবস্থা | : স্ত্রী ও তিন সন্তানের জনক |
| শহীদ হওয়ার তারিখ | : ৪ আগস্ট ২০২৪ |
| স্থান | : উত্তরা, ঢাকা (আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে) |
| দাফন | : ২০ আগস্ট ২০২৪, নিজ গ্রামের কবরস্থানে |
| শহীদ হওয়ার প্রেক্ষাপট | : ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লব চলাকালে ছাত্র-জনতার ন্যায়ের আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর ১৫ দিন নিখোঁজ; পরে লাশ শনাক্ত ও দাফন |
| উল্লেখযোগ্য তথ্য | : পোল্যান্ডে যাওয়ার জন্য আবেদন করলেও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন |

## শহীদ মায়া ইসলাম

ক্রমিক: ৭৯৭

আইডি: ঢাকা বিভাগ: ১৫৯

### মায়া ইসলামের জীবনের দৃশ্যপট

মায়া ইসলাম ছিলেন এক সাহসী, নিরলস ও মমতাময় জীবনের প্রতিচ্ছবি একজন মা, একজন দাদি এবং একজন নিবেদিতপ্রাণ গৃহিণী। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন গড়ে উঠেছিল পরিবারের ভালবাসা, দায়িত্ব আর নিঃস্বার্থ সেবার ওপর ভিত্তি করে। টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার এক গ্রামে ছিল তার শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের শেকড়। সেখানকার মাটির ঘ্রাণ, গ্রামের দুপুর, ধানক্ষেতের পাশে কিশোরী মায়ার ছোট ছোট স্বপ্ন আজও তার স্বজনদের মনে জীবন্ত। তবে সেই মায়া দীর্ঘদিন ধরে রাজধানী ঢাকার রামপুরা এলাকার মেরাদিয়া হাটের একটি সাততলা ভবনের ছয়তলায় ছেলের ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। স্বামী মাহবুব ইসলাম ছিলেন তার ছায়াসঙ্গী। জীবনসায়াহ্নে এসেও তারা হাতে হাত রেখে কাটাচ্ছিলেন সাদামাটা, কিন্তু ভালোবাসায় পূর্ণ একটি সংসার। মাহবুব ইসলাম মালিবাগ বাজারে একটি ইলেকট্রনিকস পণ্যের দোকান চালাতেন, আর মায়া নিজের জীবনের সমস্ত অবসর দিয়ে আগলে রাখতেন নাতি বাসিত খান মুসাকে।

ছেলে মুস্তাফিজুর রহমান ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। সংসারের ভিতরকার যত্ন-আত্তির প্রায় সবটাই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন মায়া। মুসার খাওয়ানো, গোসল করানো, ঘুম পাড়ানো থেকে শুরু করে স্কুলে নিয়ে যাওয়া কিংবা হোমওয়ার্ক করানো সবকিছুতে ছিল তার নিখুঁত নজরদারি ও মাতৃস্নেহের ছায়া। অনেক সময় দেখা যেত, মা-বাবা 'না' বললেও দাদি মায়ার কাছে গেলেই মুসার সব আবদার মেনে নেওয়া হতো। তাদের সম্পর্ক ছিল শুধু রক্তের নয়, ছিল হৃদয়ের গভীর এক টান, যেন এক আত্মার আরেকটি ছায়া। মায়া ইসলামই শেষবারের মতো ছোট্ট নাতির মুখে শোনা একটি নিষ্পাপ আবদার "দাদি, আইসক্রিম খাব" পূরণ করতে গিয়ে শহীদ হন। গোলাগুলির আতঙ্কে যখন কেউ নিচে নামতে সাহস করেনি, তখন তিনি ভরসা হয়ে ছেলেটিকে নিয়ে নেমেছিলেন। আর সেই চরম সাহসিকতাই হয়ে দাঁড়ায় তার জীবনের শেষ দৃশ্য।

তিনি ছিলেন এমন এক মানুষ, যিনি নিজের জীবন দিয়ে ভালোবাসার সংজ্ঞাকে নতুন করে লিখে গেছেন। ছোট্ট এক আবদার পূরণে নিজের জীবন উৎসর্গ করে তিনি কেবল একজন দাদি নন, হয়ে উঠেছেন বাংলার প্রতিটি মায়াবতী নারীর প্রতীক যারা ভালোবাসেন নিঃশর্তে, লড়েন নির্ভীকভাবে, আর ত্যাগ করেন নিঃস্বার্থভাবে। মায়া ইসলাম যেন এক মমতার নাম, এক নীরব প্রতিবাদ, এক জীবনশিল্পীর শ্রদ্ধার্ঘ্য, যে শেষ নিঃশ্বাস অবধি ছিলেন পরিবারের প্রহরী, নাতির আশ্রয়, আর এক অসমাপ্ত গল্পের মাইলফলক।

### আন্দোলন ও শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

ঢাকার উত্তপ্ত জুলাই মাস। রোদে ঝলসে যাওয়া রাস্তাঘাটের ভেতরেও সেদিন মায়া ইসলামের মুখে ছিল কোমল হাসি। কারণ, তার আদরের নাতি বাসিত খান মুসা বারবার বলছিল, "দাদি, আইসক্রিম খেতে চাই!" সাত বছর বয়সী ছেলেটির এই নিরীহ আবদারকে অবহেলা করতে পারেননি তিনি। দেশজুড়ে তখন থমথমে পরিবেশ, ঢাকার রামপুরা-মেরাদিয়া এলাকায় চলছিল কোটা সংস্কার ঘিরে ছাত্র-জনতার আন্দোলন। কিন্তু ছয় তলার ফ্ল্যাট থেকে নেমে মায়া ইসলাম গেটের ভিতর দাঁড়িয়ে ছিলেন ভেবেছিলেন, বাইরে যাবেন না, ভেতরেই থাকবেন। তার সঙ্গে ছিলেন ছোট্ট মুসাও। কিন্তু কে জানত, গেটের ভেতর দাঁড়িয়েও মৃত্যু এসে গোপনে ঘাপটি মেরে আছে? কে জানত, নাতিকে একটু ঠাণ্ডা স্বাদ দেওয়ার আশায় নামা এই দাদি হঠাৎ দেশের ইতিহাসে 'শহীদ' হয়ে যাবেন?

জুলাই বিপ্লবে নারী শহীদ

এক বুলেটে নিহত দাদি
নাতির জীবনও ঝুঁকিতে

গুলিবিদ্ধ মুসার মুখের
ভাষা আর ফিরে আসেনি
সিএমএইচে ভর্তি

মেডিকেলে মায়ার লাশ
নিয়েও ঝামেলা পুলিশের

শহীদ মায়া ইসলাম

**নাতিকে আইসক্রিম কিনে দিতে গিয়ে শহীদ হন মায়া**

মাহমুদা ডলি

জুলাই বিপ্লবে রাজধানীর রামপুরার মেরাদিয়াহাট এলাকায় পুলিশের গুলিতে শহীদ হন মায়া ইসলাম। দিনটি ছিল ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই। বেলা ৩টার দিকে নাতি বাসিত খান মুসাকে আইসক্রিম কিনে দিতে ছয়তলার বাসা থেকে নিচে নামেন ৫২ বছর বয়সি মায়া। কিন্তু কী নির্মম বাস্তবতা তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল তা হয়তো তারা বুঝতেই পারেননি।

বাসার মূল গেট বন্ধ থাকায় গেটের ভেতরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন দাদি-নাতি। ঠিক তখনই বাইরে থেকে ছোড়া পুলিশের একটি গুলি সাত বছর বয়সি নাতি মুসার মাথায় বিদ্ধ হয়ে পেছনে থাকা মায়া ইসলামের তলপেটে ঢুকে যায়। মুসা

▸▸ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

### একটি বুলেট ও দুটি জীবন

২০২৪ সালের ১৯ জুলাই, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে শুরু করেছে। রামপুরার মেরাদিয়া হাট এলাকার আকাশ ভারী হয়ে উঠছিল এক অদৃশ্য আতঙ্কে। চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে গোলাগুলির বিকট শব্দ। রাস্তায় উত্তেজনা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশের মুখোমুখি সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। সেই মুহূর্তে কেউ কল্পনাও করেনি, সামান্য এক আইসক্রিমের আবদার পূরণ করতে বাসা থেকে নামা একজন দাদি ও তার সাত বছরের নাতির জন্য এই বিকেলটা হয়ে উঠবে জীবনের সবচেয়ে রক্তাক্ত সময়।

বেলা ঠিক ৩টা। মায়া ইসলাম ছয়তলার ভাড়া বাসা থেকে নাতি বাসিত খান মুসাকে নিয়ে নেমেছিলেন নিচে। বাসার মূল গেট বন্ধ থাকায় তারা ভেতরেই দাঁড়িয়েছিলেন। তখনও পরিস্থিতি ছিল উত্তেজনাপূর্ণ, কিন্তু খানিকটা শান্ত। মুসার চোখে মুখে ছিল উচ্ছ্বাস দাদি তাকে আইসক্রিম কিনে দিচ্ছেন! কিন্তু মুহূর্তেই সব পাল্টে যায়। হঠাৎ করেই ছুটে আসে একটি গুলি। গুলিটি যেন সময়কে চিরে, শান্ত দুপুরকে ছিন্নভিন্ন করে ভেদ করে দেয় ছোট্ট বাসিত খান মুসার মাথা। গুলিটি তার শরীর ভেদ করে পেছনে থাকা মায়া ইসলামের তলপেটে ঢুকে যায়। দুই প্রজন্ম, দুই প্রাণ, একই গুলির শিকার হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। চারপাশে তখন হাহাকার, চিৎকার আর আতঙ্ক। মুসার ছোট্ট শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে রক্তের ভেতর, আর মায়া ইসলাম, যিনি সারা জীবন আগলে রেখেছিলেন এই ছেলেটিকে, তিনিও পড়ে আছেন ঠিক তার পেছনে একটি অভিভাবক আত্মার নিঃশেষ অবয়ব হয়ে।

সেই মুহূর্তে যেন থেমে যায় সময়। নিথর পড়ে থাকা দাদি-নাতির উপর দিয়ে যেন বয়ে যায় শত সহস্র পরিবারের ভয়াবহ ভবিষ্যতের ছায়া। আর্তনাদে ভেসে যায় একটি ভবন, এক এলাকা, একটি পরিবার। রক্তে ডুবে যায় শুধু দুটি দেহ নয়, ডুবে যায় নিরীহ মাতৃত্বের সব স্বপ্ন, পারিবারিক ভালোবাসার সব আশ্রয়, এবং নিরপাপ শৈশবের এক নির্মল হাসি। এটা ছিল শুধুই একটি গুলি নয় এটা ছিল একটি জীবনদায়ী হাতের ছিন্নতা, একটি পরিবারকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার শব্দ, এবং এক গভীর রাষ্ট্রীয় নিষ্ঠুরতার প্রমাণচিহ্ন। সেই গুলির শব্দ এখনও প্রতিধ্বনিত হয় মাহবুব ইসলামের নিঃসঙ্গ রাতে, মুসার বাবার নীরব কান্নায়, আর সিঙ্গাপুরের এক হাসপাতালের বিছানায় কষ্টে মোচড়ানো ছোট্ট শিশুর চোখে।

এই একটি গুলি কেবল দুটি দেহকে বিদ্ধ করেনি, এটি বিদ্ধ করেছে শত শত পরিবারের হৃদয়। এটা ছিল সেই বাস্তবতা, যেখানে একটি শিশু আর তার দাদির ভালোবাসা থেমে যায় এক রাষ্ট্রীয় বর্বরতার মুখে।

### মুসার জীবন-মৃত্যুর লড়াই

গুলির পরপরই মুসাকে নিয়ে তার বাবা ছোটেন হাসপাতালে। প্রথমে নেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। দুদিন পর তাকে পাঠানো হয় ওয়ার্ডে। অবস্থা খারাপ হলে আবার আইসিইউতে, লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। মুসার চিকিৎসা চলে সিএমএইচ ও পরবর্তীতে তাকে পাঠানো হয় সিঙ্গাপুরে উন্নত চিকিৎসার জন্য। সেই সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরা থেমে থাকেনি। তাদের সহায়তায় সরকার ২২ অক্টোবর মুসাকে বিদেশে পাঠায়। এখন মুসা কিছুটা সুস্থ, তবে ভবিষ্যতের জন্য তার স্বাভাবিক জীবন ফিরবে কি না, কেউ জানে না। মায়া ইসলামের স্বামী মাহবুব ইসলাম বলেন, “আমার নাতি অলৌকিকভাবে বেঁচে আছে। ও-ই এই গণঅভ্যুত্থানের সবচেয়ে ছোট যোদ্ধা।”

### শোক ও বিচারপ্রক্রিয়া

স্ত্রীকে হারিয়ে নিঃসঙ্গতার এক গভীর অন্ধকারে ডুবে আছেন মাহবুব ইসলাম। যিনি সারাটি জীবন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসারের হাল ধরেছিলেন স্ত্রী মায়া ইসলামের সঙ্গে আজ তিনি নিঃস্ব, স্তব্ধ, শূন্য। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া একটি নির্মম হত্যাকাণ্ড তাকে যেন হিম করে দিয়েছে। স্ত্রী শুধু তার জীবনসঙ্গীই ছিলেন না, ছিলেন ছেলের সন্তান মুসার মা-সম প্রাণ। সেই মানুষটিকে এক মুহূর্তে হারিয়ে ফেলে তিনি যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। মাহবুব ইসলামের চারপাশে এখন আর পরিচিত ছায়াগুলো নেই। তার ছেলে মুস্তাফিজুর রহমান এবং পুত্রবধূ নিশামনি দিনরাত ব্যস্ত মুসার চিকিৎসা ও পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে। তারা আছেন সিঙ্গাপুরে একটি দেশের মধ্যেও যেন আরেকটি দূর দেশ। এই একাকীত্বের ভেতর মাহবুব ইসলাম দাঁড়িয়ে আছেন একটি ভেঙে পড়া সংসারের ধ্বংসস্তূপের সামনে। প্রতিটি রাত তার কাছে এক বোঝা যেখানে স্ত্রীকে হারানোর যন্ত্রণার পাশাপাশি আছে নাতির অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়।

মায়া ইসলামের ছেলে মুস্তাফিজুর রহমান, যিনি একদিকে নিজের ছেলের প্রাণের জন্য হাসপাতালের করিডরে করিডরে ছোটেন, অন্যদিকে বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখেন তার প্রিয় মা-কে হারানোর যন্ত্রণা। মুসাকে বাঁচানোর লড়াইয়ের মাঝেই তিনি মৃত্যুশয্যায় থাকা মাকে দেখতে পেরেছেন অ্যাম্বুলেন্সে, কিন্তু জানাজা কিংবা দাফনে অংশ নিতে পারেননি এটা তার হৃদয়ে গেঁথে থাকা এক আজীবনের ক্ষত। তিনি এখন শুধু এক বাবা নন, হয়ে উঠেছেন এক অভিভাবক, এক প্রাচীর ছেলের শারীরিক ও মানসিক পুনর্গঠনের এক নীরব যোদ্ধা। এই ভয়াবহ ঘটনার পর পরিবারটি আশাহত হলেও থেমে থাকেনি। সাহস সঞ্চয় করে ২০২৪ সালের ১ নভেম্বর খিলগাঁও থানায় মায়া ইসলাম হত্যার মামলা দায়ের করেন মুস্তাফিজুর রহমান। মামলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৮৭ জনকে আসামি করা হয়। তালিকায় আছেন তৎকালীন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানসহ সরকার ও প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ।

মাহবুব ইসলাম বলেন, "আমি বিচার চাই। আমার স্ত্রী শহীদ হয়েছেন, আমার নাতি মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। আমাদের পরিবারটা ভেঙে গেছে। এই বিচারপ্রক্রিয়া এখন শুধুই একটি মামলা নয়, এটি হয়ে উঠেছে হাজারো নিরীহ মানুষের একটি প্রতীকী দাবির প্রতিধ্বনি যেখানে জবাবদিহিতা চাওয়া হয় রাষ্ট্রের, এবং সুরক্ষা চাওয়া হয় প্রতিটি ঘরের মায়া, প্রতিটি নাতি মুসার জন্য।

মায়া ইসলামের মৃত্যুর ঘটনায় মামলা হয় খিলগাঁও থানায় ১ নভেম্বর। সেখানে শেখ হাসিনাসহ ৮৭ জনকে আসামি করা হয়। তাদের মধ্যে আছেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ অনেকে। মায়ার পরিবার চায়, এই নির্মম হত্যার বিচার হোক। নইলে প্রতিটি আইসক্রিমে একটা গুলি লুকিয়ে থাকবে, প্রতিটি দাদির হাসিতে থাকবে মৃত্যুর ছায়া।

প্রথম আলো

রাজধানী

**কোটা সংস্কার আন্দোলন: বাসাও নিরাপদ নয়, গুলিতে মৃত্যু ছয় নারী ও মেয়েশিশুর**

নিহতদের মধ্যে ছয়জন নারী, কিশোরী ও মেয়েশিশু। গুলিবিদ্ধ হন ১৮-২০ জুলাইয়ের মধ্যে। হাহাকার, আক্ষেপে দিন কাটে পরিবারগুলোর।

**নাজনীন আখতার** ঢাকা

প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৪, ১৩: ০৬



মা মায়া ইসলাম (৬০) গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। ছেলে বাসিত খান মুসা (৭) মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন। মাকে হারিয়ে, ছেলের দুশ্চিন্তায় এখন হাসপাতালেই দিন কাটে মুস্তাফিজুর রহমানের (২৯)।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলন চলার সময় গত ১৯ জুলাই (শুক্রবার) ঢাকার রামপুরার বাসার নিচে সিঁড়ির কাছে গুলিবিদ্ধ হন মুস্তাফিজুরের মা ও ছেলে। তিনি গত রোববার প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলার সময় প্রশ্ন করছিলেন, বাসায়ও কেন মানুষ নিরাপদ থাকতে পারল না?

মায়া ইসলামের মতো নিজের বাসায় নিরাপদ থাকতে পারেননি সদ্য মা হওয়া সুমাইয়া আক্তার (২০), কিশোরী নাঈমা সুলতানা (১৫), শিশু রিয়া গোপ (৬), তরুণী নাছিমা আক্তার (২৪) ও গৃহকর্মী মোসাম্মৎ লিজা আক্তার (১৯)।

কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং পরবর্তী সংঘাত-সহিংসতায় অন্তত ৫৮০ জন মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে অন্তত ছয়জন নারী, কিশোরী ও মেয়েশিশু। তাঁদের সবার মৃত্যু হয়েছে ১৮, ১৯ ও ২০ জুলাই গুলি লেগে। এই আন্দোলন দমনে পুলিশ, র‍্যাব ও বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের (বিজিবি) বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে ব্যাপক গুলিবর্ষণের অভিযোগ রয়েছে।

নিহত ছয়জন নারী, কিশোরী ও মেয়েশিশুর মধ্যে তিনজনের মাথায়, দুজনের পেটে ও একজনের গলায় গুলি লেগেছিল। সুমাইয়া, নাঈমা ও লিজা বাসার বারান্দায় গুলিবিদ্ধ হন। রিয়া ও নাছিমা গুলিবিদ্ধ হন ছাদে থাকা অবস্থায়। মায়া ইসলাম গুলিবিদ্ধ হন বাসার নিচতলায় 'কলাপসিবল গেটে'র ভেতরে থাকা অবস্থায়।

৫ আগস্ট শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন। জুলাই মাসেই ঢাকায় মানুষ নিহত হওয়ার ঘটনায় মামলা করা শুরু করে পুলিশ। ওই সব মামলায় বলা হচ্ছিল, সন্ত্রাসীদের ছোড়া এলোপাতাড়ি গুলিতে মৃত্যুগুলো হয়েছে।

অবশ্য ৮ আগস্ট গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন গত রোববার সাংবাদিকদের বলেছেন, পুলিশকে প্রাণঘাতী অস্ত্র দেওয়া ঠিক হয়নি। যারা পুলিশকে লাঠিয়াল বাহিনীর মতো ব্যবহার করেছে, তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

**নাতির জন্য আইসক্রিম কিনতে যাচ্ছিলেন মায়া**

মায়া ইসলামের ছেলে মুস্তাফিজুর প্রথম আলোকে জানান, তাঁর বাসা রাজধানীর রামপুরা থানার সামনে মেরাদিয়া হাট এলাকায়। সাততলা বাড়ির ছয়তলার একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকেন তিনি। সেখানে তাঁর বাবা, স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে মা মায়া ইসলাম থাকতেন।

**প্রস্তাবনা**

১. শহীদ মায়া ইসলামকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রদান।

২. পরিবারকে নগদ অর্থ ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা প্রদান।

৩. মুসার বিদেশে চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় সরকারিভাবে বহন।

৪. পরিবারকে ঢাকায় একটি স্থায়ী সরকারি বাসা ও একজন সদস্যকে সরকারি চাকরির ব্যবস্থা।

৫. মুসার জন্য পূর্ণ শিক্ষাবৃত্তি ও মানসিক পুনর্বাসনের সহায়তা।

৬. আইনি লড়াইয়ের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনজীবী ও সহায়তা প্রদান।

এই সহায়তাগুলো শুধু একটি শহীদ পরিবারের প্রতি দায়িত্ব নয়, বরং রাষ্ট্রের নৈতিক দায় ও মানবিক কর্তব্য।

নাতিকে আইসক্রিম কিনে দিতে গিয়ে শহীদ হন মায়া ইসলাম

শহীদ মায়া ইসলাম - ছবি : বাসস

প্রতিবেদন: বরুণ কুমার দাশ

ঢাকা, ২৫ মার্চ, ২০২৫ (বাসস) : সেদিন ছিল ১৯ জুলাই। বেলা ৩ টার দিকে নাতি বাসিত খান মুসাকে নিয়ে আইসক্রিম কিনতে বাসার নিচে নামেন মায়া ইসলাম। বন্ধ থাকার কারণে নিচে নেমে মূল গেটের ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। সেখানে তার সাথে ছিল নাতি মুসা খান। তারপর বাইরে থেকে আসা এক গুলি মুসার মাথায় লেগে তা বের হয়ে পেছনে থাকা দাদির তলপেটে ঢুকে যায়।

মাত্র সাত বছরে পা দিয়েছে বাসিত খান মুসা। মা নিশামনিকে বলেছিল, 'মাম্মি, বাইরে গুলির শব্দ হচ্ছে।' বাইরে গিয়ে গোলাগুলি দেখবে কি না জিজ্ঞেস করলে ওর মা ছেলেকে বাইরে যেতে 'না' করেন। পরে একসময় বাইরের পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত হয়ে এলে নাতি মুসাকে আইসক্রিম কিনে দিতে ছয় তলার বাসা থেকে নিচে নেমে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান দাদি মায়া ইসলাম আর নাতি মুসা খান হয় মারাত্মক আহত।

এ ঘটনা ঘটে ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই বেলা ৩টার দিকে রাজধানীর রামপুরা থানার সামনে মেরাদিয়া হাট এলাকায়। কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সেদিন ওই এলাকায় পুলিশ ও ছাত্রলীগের সাথে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ চলছিল। পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছিল।এসময় একটি গুলিতে প্রাণ হারান মায়া ইসলাম। একই গুলিতে আহত মুসা খান এখন সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন।

রাজধানীর মালিবাগ বাজারে নিজ দোকানে রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস-এর প্রতিবেদকের সাথে আলাপকালে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শহীদ মায়া ইসলামের স্বামী মাহবুব ইসলাম একথা জানান।

ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান জানান, তার বাসা রাজধানীর রামপুরা থানার সামনে মেরাদিয়া হাট এলাকায়। সাততলা বাড়ির ছয়তলার একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকেন তিনি। সেখানে তার স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে তার বাবা ও মা মায়া ইসলামও থাকতেন। মালিবাগ বাজারে একটি ইলেকট্রনিক পণ্যের দোকান রয়েছে তার। তাদের গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলায়।

মায়া ইসলামের মৃত্যুর ঘটনা

মাহবুব ইসলাম বলেন, বেশির ভাগ সময় মুসাকে ওর দাদিই আগলে রাখতেন। খাওয়ানো, গোসল করানো, স্কুলে নিয়ে যাওয়া, সব করতো ওর দাদি। সব আবদার ছিল তার দাদির কাছে। সেই দিনও দুপুর থেকেই নাতিটা আইক্রিম খাবে বলে বায়না ধরে। কিন্তু চার দিকে গোলাগুলি চলছিল, তাই কেউ নিচে নামেনি।

## একনজরে শহীদ মায়া ইসলাম

| | |
|---|---|
| পুরো নাম | : মায়া ইসলাম |
| জন্মস্থান | : মির্জাপুর, টাঙ্গাইল |
| বয়স মৃত্যুকালে | : ৫২ বছর |
| বাসস্থান | : মেরাদিয়া হাট, রামপুরা, ঢাকা (ছেলের বাসায়) |
| স্বামী | : মাহবুব ইসলাম (ব্যবসায়ী, মালিবাগ বাজারে ইলেকট্রনিক দোকান) |
| সন্তান | : ১ ছেলে (মুস্তাফিজুর রহমান), ১ মেয়ে |
| নাতি | : বাসিত খান মুসা (ইংলিশ ভার্সন নার্সারির ছাত্র, শহীদ বাবুল একাডেমি) |
| শহীদ হওয়ার তারিখ | : ১৯ জুলাই ২০২৪ |
| শহীদ হওয়ার স্থান | : মেরাদিয়া হাট, রামপুরা, ঢাকা |
| মৃত্যুর কারণ | : পুলিশের গুলিতে নিহত |
| চিকিৎসা কেন্দ্র | : ১. বনশ্রী হাসপাতাল<br>২. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু |
| দাফনস্থল | : গ্রামের বাড়ি, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল |

# জীবন, প্রতিবাদ, শাহাদত ও হারানোর বেদনা

**শহীদ মোঃ হৃদয়**
ক্রমিক : ৭৯৮
আইডিঃ ঢাকা বিভাগ ১৬০

সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এক তরুণের নাম মোঃ হৃদয়। যাকে আমরা চিনি না, তবে যার মৃত্যু আমাদের বিবেককে প্রশ্নবিদ্ধ করে। একটি স্বপ্ন, একটি পরিবার, একটি জীবন সবকিছুই গুম করে দেওয়া হয় শুধু একটি প্রতিবাদে অংশ নেওয়ার কারণে। এ গল্প হৃদয়ের, এ গল্প প্রতিরোধের, এ গল্প রাষ্ট্রের নির্মম বাস্তবতার। ২০২৪ সালের জুলাই আগস্ট। সারা দেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন যখন চূড়ান্ত রূপ নিচ্ছে, তখন এক তরুণ তার জীবন নিয়ে দাঁড়ায় রাস্তায়। নাম তার মো: হৃদয়। স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে বাবা মায়ের অভাব দূর করা কিন্তু সেই স্বপ্ন খুনি হাসিনার পালিত পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় ৫ আগস্ট গাজীপুরের কোনাবাড়িতে। সে শুধু মারা যায়নি, তাকে গুমও করা হয়েছে। আজও তার মা চোখে সেই দৃশ্য নিয়ে অপেক্ষায় থাকেন "আমার বাবাটারে একবার শুধু দেখি, এই চাওয়া।"

## শহীদ পরিচিতি

মো: হৃদয় একটি নাম, যে নাম আজ শুধু স্মৃতিতে, অশ্রুতে, প্রতিবাদে উচ্চারিত হয়। গোপালপুর উপজেলার আলমনগর গ্রামের এক নিভৃত পল্লীতে ২০০৪ সালের ১ মে দরিদ্র ভ্যানচালক লাল মিয়া ও গৃহিণী রেহেনা বেগমের ঘরে জন্ম নেয় এই সন্তান। জন্মের সময় হয়তো কেউ ভাবেনি, একদিন এই ছেলেই দেশের এক অন্ধকার সময়ে নিজের রক্ত দিয়ে জ্বালাবে আলোর মশাল। তার পিতা লাল মিয়া, জীবনের প্রায় পুরোটা সময় কাটিয়েছেন ভ্যান চালিয়ে পরিবারের মুখে আহার জুগিয়ে। বয়সের ভার আর ক্লান্ত জীবনের ক্ষত তাঁকে আজ প্রায় অচল করে দিয়েছে। আর মা রেহেনা বেগম, একজন সাধারণ গৃহিণী হলেও হৃদয়ের চোখে ছিলেন লড়াকু বীর নারী যিনি সংসারের দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করে তোলার স্বপ্ন দেখতেন। হৃদয় এসএসসি পাস করে ভর্তি হয় হেমনগর ডিগ্রি কলেজে, মানবিক বিভাগে। তাঁর স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া শেষ করে সমাজে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা, বাবা-মায়ের কাঁধে হাত রেখে ভরসা দেওয়া। কিন্তু শুধু স্বপ্নে কি জীবন চলে? অভাব আর বাস্তবতার কঠিন চাপে বাধ্য হয়ে সে গাজীপুরে চলে যায়। চাচার সাহায্যে অটোরিকশা ক্রয় করে দিনে রিকশা চালিয়ে অর্থ জোগাড় করত, রাতে ক্লান্ত শরীরে বইয়ের পাতায় চোখ রাখত। পরিবারে দুই বোন বিবাহিত। তাদের সংসার আলাদা। এই একমাত্র ছেলেকে নিয়েই ছিল মা-বাবার সমস্ত আশার বাতিঘর। রেহেনা বেগম নিজের চোখে ছেলেকে আগলে রাখতেন, যেন এ দুঃসময়ে হারিয়ে না যায়। তিনি বলতেন, "হৃদয় শুধু আমার ছেলে না, সে আমার সাহস।" সেই সাহস আজ রক্তাক্ত, আর হৃদয়ের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় শুধু কান্না আর লুঙ্গির ভেজা রক্তে।

## পারিবারিক অর্থনৈতিক বিবরণ

"দারিদ্র্য মুচড়ে ধরেছিল আমাদের ঘর। ছেলেটা শুধু আমাদের সংসার টিকিয়ে রাখতেই গাজীপুর গিয়েছিল," কথাগুলো বলছিলেন শহীদ হৃদয়ের মা রেহেনা বেগম, অশ্রুভেজা চোখে, কাঁপা কণ্ঠে। একমাত্র সন্তানের শোকে মুহ্যমান এই মায়ের কথাগুলো যেন হাজারো অসহায় মায়ের হৃদয় বিদীর্ণ করা আর্তনাদ। হৃদয়ের জন্ম হয়েছিল অভাবের ভেতর, বেড়ে উঠেছিল অনটনের ছায়ায়। তাদের পুরো পরিবার টিকে ছিল এক পিতার পরিশ্রম আর একজন মায়ের ত্যাগে। লাল মিয়া, হৃদয়ের বাবা, সারা জীবন ভ্যান চালিয়ে সংসারের চাকা টানতেন। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে শরীরটা আর সেইভাবে সাড়া দিচ্ছিল না। হাঁটাচলার শক্তিও নিঃশেষ প্রায়। মা রেহেনা বেগম গৃহিণী, সংসারের হাল ধরতেন যতটুকু পারতেন, কিন্তু আয় বলতে ছিল না কিছুই। তাদের বসতভিটায় ৪-৫ কাঠা জমি ছাড়া নেই আর কিছু। ফসলের জমি নেই, ব্যবসা নেই, নেই সরকারি সাহায্যের ছায়াও। ঘরের চালা ঝুঁকে পড়ে আছে, দেয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারের পাতার মতোই প্রতিটি দিন বদলায় শুধু অভাবের হিসাব নিয়ে। এই ঘরেই বেড়ে উঠেছিল হৃদয়। এসএসসি পাস করে ভর্তি হয়েছিল হেমনগর ডিগ্রি কলেজের মানবিক বিভাগে। কিন্তু নিজের পড়াশোনা চালানো আর সংসারের খরচ বহন করাটা একসাথে হয়ে উঠছিল অসম্ভব। তাই হৃদয় গিয়েছিল গাজীপুর। সেখানে অটোরিকশা চালিয়ে উপার্জন করত। সকালে উঠে হাতে রিকশা, রাতে ঘরে ফিরে বইয়ের পাতা খুলে বসত। কত স্বপ্ন ছিল তার! শুধু নিজেকে গড়া নয় সে চেয়েছিল তার মা-বাবাকে একটা ভালো ঘর উপহার দিতে। চেয়েছিল তাদের মুখে হাসি ফোটাতে, দারিদ্র্য নামক অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে। হৃদয়ের মা বলেছিলেন, "সে বলত, মা, আমি শুধু লেখাপড়াই করবো না। তোমাকে আর আব্বাকে কষ্ট করতে দিব না। একটা দিন আসবে, যেদিন কেউ আমাদের দেখে বলবে এই ঘরটা একটা সাহসী ছেলের ঘর।" কিন্তু সেই সাহসী ছেলের জীবন থেমে গেল, গুলির শব্দে। তার কষ্ট, স্বপ্ন, সংগ্রাম সবকিছু এক মুহূর্তে থেমে গেল পুলিশের বুলেটে। আজও সেই ঘরে জ্বলছে না চুলা। মা রেহেনা বেগম এক হাতে ছেলের জামা চেপে ধরে কাঁদেন, অন্য হাতে চোখ মুছতে মুছতে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন "আমার হৃদয়ের রক্তে কেউ হয়তো জিতেছে, কিন্তু আমি তো আমার পৃথিবীটাই হারালাম।"

## আন্দোলনে যোগদান

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি রক্তাক্ত, দ্রোহের দিন। সেদিন সারাদেশের রাজপথে ছাত্র-জনতা বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নেমেছিল। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি, দুঃশাসন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিল তারা। আন্দোলনের ঢেউ

ছড়িয়ে পড়েছিল গাজীপুরেও। কোনাবাড়ি রোডে হাজারো মানুষের সঙ্গে হৃদয়ও দাঁড়িয়েছিল একসারিতে শান্ত, সাহসী, সংকল্পবদ্ধ। তার হাতে ছিল না কোনো লাঠি কিংবা অস্ত্র, ছিল না কোনো দলীয় পরিচয়পত্র কিংবা রাজনৈতিক প্রতীক। হৃদয়ের হাতে ছিল শুধু এক টুকরো স্বপ্ন, চোখে ছিল প্রতিবাদের দীপ্তি। একদিকে পুলিশের বর্ম, টিয়ারশেল, রাইফেল; অন্যদিকে এক যুবকের খালি বুক, যেখানে জমেছিল বহু দিনের অভিমান আর আশা। সেদিন সে একা ছিল না। পাশে ছিল তার সহযাত্রী ও ভগ্নিপতি ইব্রাহিম হোসেন। সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তের স্মৃতি মনে করে ইব্রাহিম আজও কেঁপে ওঠেন। চোখে পানি ধরে বলেন "আমি আর হৃদয় একসাথে ছিলাম। গুলি শুরু হওয়ার পর আমরা দৌঁড়াতে থাকি। আমি পাশের একটা বাসায় ঢুকে গা ঢাকা দিই। তখনও ও পেছনে ছিল। হঠাৎ দেখি পুলিশরা ওকে ধরে ফেলে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে... আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছি। ভয়ে কিছু বলতে পারিনি, করতে পারিনি। সেই চোখে দেখা দৃশ্যটা এখনো রাতের ঘুমে ছায়ার মতো ফিরে আসে।"

গাজীপুরের রোডে সেই দিনের গুলির শব্দ শুধু একটি প্রতিবাদকে থামায়নি একটি ভবিষ্যৎকে থামিয়ে দিয়েছে। হৃদয়, যে নিজের পরিবারকে বাঁচাতে শহরে এসেছিল, সে নিজেই শহীদের কাতারে নাম লেখাল। তাকে কেউ চিনত না রাজনীতির কর্মী হিসেবে, কিন্তু সেই দিন সে হয়ে উঠেছিল জনগণের কণ্ঠস্বর, একটি নিরস্ত্র প্রতিরোধের প্রতীক।

**শহীদ হওয়ার ঘটনা**

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট, বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট। গাজীপুরের কোনাবাড়ি থানার সামনে, শরীফ জেনারেল হাসপাতালের গেটসংলগ্ন এলাকায় হঠাৎ শুরু হয় গুলির শব্দ। চারদিক তখন আতঙ্কে কাঁপছিল, রাস্তাজুড়ে মানুষ ছুটছিল প্রাণ বাঁচাতে। কেউ বাসার ভেতর ঢুকে পড়ছিল, কেউ দোকানের ঝাঁপ টেনে দিচ্ছিল। ঠিক সেই সময়, এক ভবনের পাশে কোণায় মাথা নিচু করে লুকিয়ে ছিল এক তরুণ হৃদয়। সে পালাতে চায়নি, চিৎকারও করেনি, শুধু বাঁচার মিনতি করেছিল। কিন্তু তা-ও শোনেনি পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শী রবিন মিয়া কাঁপা গলায় বলেন, "হৃদয় ভবনের পাশে লুকিয়ে ছিল। পুলিশ খুঁজে পায়। সে তখন দু'হাত জোড় করে মিনতি করছিল। কিন্তু তারা শোনেনি। বরং মারধর করে, কিল-ঘুষি মেরে চিৎ করে ফেলে দেয়। তারপর ১০-১২ জন পুলিশ মিলে ঘিরে রাখে, এক পুলিশ সামনাসামনি এসে গুলি চালায়। সে সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে যায়।" এই ঘটনার একটি ভিডিও মুহূর্তেই ফেসবুকে ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দেখা যায় এক তরুণ কাঁপতে কাঁপতে কিছু বলতে চাইছে, অথচ আশপাশ ঘিরে রাখা পুলিশরা নির্দয়ভাবে আঘাত করছে। একজন পুলিশ আচমকা গুলি চালায়। তরুণটি দেহ থরথর করে কেঁপে ওঠে, তারপর ঢলে পড়ে মাটিতে। তারপর সেই লাশকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় কয়েকজন

কোনো এম্বুলেন্স, কোনো উদ্ধার নয়, শুধু লুকিয়ে ফেলার তাড়া।

পরিবার ভিডিও দেখে হৃদয়ের পরিচয় নিশ্চিত করে। কারণ ঘটনাস্থলেই পড়ে ছিল একটি রক্তাক্ত লুঙ্গি হৃদয়ের অটো চালানোর সময়কার পোশাক।

কিন্তু সেদিন থেকে আজও হৃদয়ের দেহ মেলেনি। সে হারিয়ে গেছে রাষ্ট্রীয় বর্বরতার এক অন্ধকার খাতে।

আলমনগর ইউনিয়নের সাবেক মেম্বার আব্দুল হামিদ বলেন, কোনাবাড়িতে আমার দোকান আছে। মিছিলের আগেই হৃদয় আমার দোকানের সামনে ছিল। সে সময় তার বোন জামাইও সঙ্গে ছিল। বোনের জামাই দূর থেকে দেখেছে কিভাবে হৃদয়কে গুলি করে মেরেছে পুলিশ। কিন্তু ভয়ে কেউ সামনে যাওয়ার সাহস পায়নি।

### এক মায়ের কান্না

রাত গভীর হলেও হৃদয়ের মায়ের চোখে ঘুম নামে না। একটানা কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন "আমার বাবাটারে ফিরায়া দাও। একটাবার দেখি ওরে।" তার বুকের ভিতর যে কান্না জমে আছে, তা কোনো ভাষায় বলা যায় না। হৃদয়ের বাবা লাল মিয়া যিনি এখন বয়সের ভারে ন্যুব্জ, কোনো কথা বলেন না। শুধু জানালার ধারে বসে থাকেন। চুপচাপ। চোখের কোণে জমা নীরব অশ্রু, বুকের মধ্যে অদৃশ্য গর্জন। হৃদয় যে স্বপ্ন দেখেছিল, পরিবারকে টেনে তুলবে দারিদ্র্য থেকে, সেই স্বপ্ন আজ তার রক্তে লেখা আছে। তবে সেই রক্ত কোথায় গেছে, তার হিসাব নেই কারও কাছে।

### অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা

১. আবাসনের ব্যবস্থা: বসতভিটার উপর পাকা ঘর নির্মাণের জন্য সরকারিভাবে সহযোগিতা

২. মাসিক ভাতা: পরিবারকে অন্তত ১০,০০০ টাকা করে আজীবন মাসিক শহীদ ভাতা প্রদান

৩. ভাইবোনের শিক্ষাব্যবস্থা: হৃদয়ের দুই বোনের সন্তানের জন্য শিক্ষা সহায়তা ও বৃত্তির ব্যবস্থা

৪. বাবার চিকিৎসা ও জীবিকা:অসুস্থ পিতা লাল মিয়ার চিকিৎসা ও জীবিকার জন্য আর্থিক সহায়তা

৫. মায়ের জন্য পল্লী কর্মসংস্থান: মা রেহেনা বেগমের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা বা সেলাই মেশিন সহায়তা

৬. লাশ উদ্ধার ও আইনি সহায়তা: হৃদয়ের লাশ উদ্ধারে সরকারি হস্তক্ষেপ এবং পরিবারকে আইনি সহায়তা

৭. নিরাপত্তা ও মনোবৈজ্ঞানিক সহায়তা: শহীদ পরিবারের সদস্যদের

হেমনগর, টাঙ্গাইল।
স্থাপিত : ১৯৭৯
পরিচয় পত্র
মোঃ হৃদয়
শ্রেণি : একাদশ-দ্বাদশ
বিভাগ : মানবিক
রোল : ৩০
শিক্ষাবর্ষ : ২০২১-২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ হৃদয়
Name: MD. RIDOY
পিতা: মোঃ লাল মিয়া
মাতা: মোছাঃ রেহেনা বেগম
Date of Birth: 01 May 2004
ID NO: 7819238143

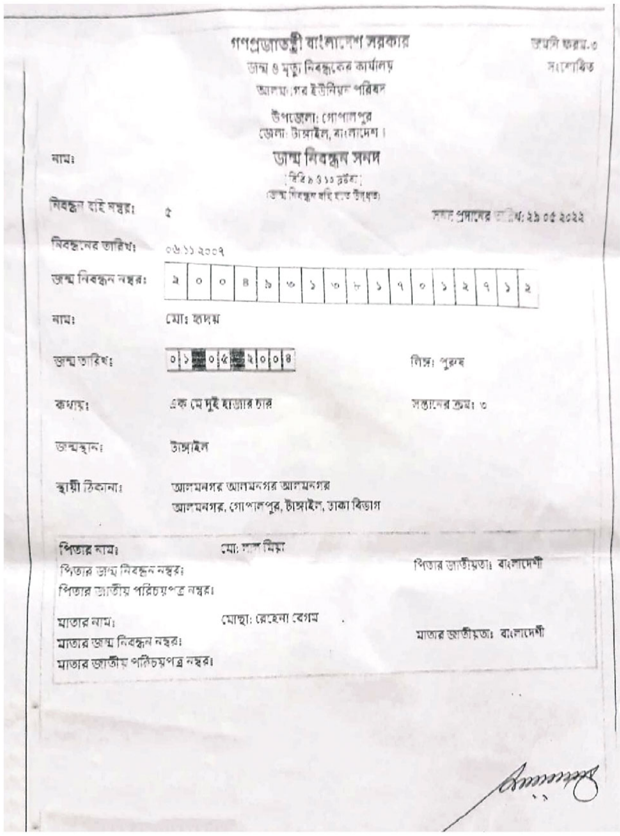
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
আলমনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: গোপালপুর
জেলা: টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ।
জন্ম নিবন্ধন সনদ

নিবন্ধন বহি নম্বর: ৫
সনদ প্রদানের তারিখ: ২৯ ০৫ ২০২২
নিবন্ধনের তারিখ: ০৬.১১.২০০৭
জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ২০০৪৯৩১৩৮১৭০১২৭১২
নাম: মো: হৃদয়
জন্ম তারিখ: ০১ ০৫ ২০০৪
লিঙ্গ: পুরুষ
কথায়: এক মে দুই হাজার চার
সন্তানের ক্রম: ৩
জন্মস্থান: টাঙ্গাইল
স্থায়ী ঠিকানা: আলমনগর আলমনগর আলমনগর আলমনগর, গোপালপুর, টাঙ্গাইল, ঢাকা বিভাগ
পিতার নাম: মো: লাল মিয়া
পিতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:
পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:
পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার নাম: মোছা: রেহেনা বেগম
মাতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:
মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:
মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Alamnagar Union Parishad
Gopalpur, Tangail
(Rule 11, 12)
মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration 15/09/2024
Death Registration Number 20049313817012712
Date of Issuance 15/09/2024

Date of Birth : 01/05/2004
Date of Death : 05/08/2024
In Word : Fifth of August Two Thousand Twenty Four
Sex : Male

| | | | |
|---|---|---|---|
| নাম | মো: হৃদয় | Name | Md Ridoy |
| মাতা | মোছা: রেহেনা বেগম | Mother | |
| মাতার জাতীয়তা | বাংলাদেশী | Nationality | Bangladeshi |
| পিতা | মো: লাল মিয়া | Father | |
| পিতার জাতীয়তা | বাংলাদেশী | Nationality | Bangladeshi |
| মৃত্যুস্থান | গাজীপুর, বাংলাদেশ | Place of Death | Gazipur, Bangladesh |
| মৃত্যুর কারণ | হত্যা | Cause of Death | Murder |

15.09.24
Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
MD. RUBEL SIDDIQI

15.09.24
Seal & Signature
Registrar

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

## এক নজরে শহীদ হৃদয়ের প্রোফাইল

| | |
|---|---|
| শহীদের পূর্ণ নাম | : মো: হৃদয় |
| জন্ম তারিখ | : ০১/০৫/২০০৪ |
| জন্মস্থান | : গোপালপুর, টাঙ্গাইল |
| পেশা | : ছাত্র (সংসারের খরচ যোগাতে অটো রিকশা চালাতেন) |
| প্রতিষ্ঠান | : হেমনগর ডিগ্রী কলেজ, বর্ষ: ১ম, গ্রুপ: মানবিক |
| স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা | : গ্রাম: আলমনগর , ইউনিয়ন: আলমনগর, থানা: গোপালপুর, জেলা: টাঙ্গাইল |
| পিতার নাম | : লাল মিয়া, পেশা: ভ্যান চালক, বয়স: ৬৫ |
| মায়ের নাম | : রেহেনা বেগম, পেশা: গৃহিণী, বয়স: ৬০ |
| পরিবারের সদস্য | : বাবা-মা, বোন : ২ জন (বিবাহিত) |
| ঘটনার স্থান | : কাশিমপুর রোডের শরীফ জেনারেল হাসপাতালের গেট সংলগ্ন, কোনাবাড়ী থানা, গাজীপুর |
| আক্রমণকারী | : পুলিশ |
| আহত হওয়ার তারিখ | : ০৫/০৮/২৪, সময়: বিকাল ৫.৩০ টা |
| শহীদ হওয়ার তারিখ | : ০৫/০৮/২৪, সময়: বিকাল ৫.৩৫ টা |
| শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান | : লাশ এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি |

**শিশু শহীদ রাইফা**

ক্রমিক: ৭৯৯

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১৬১

# একটি নিষ্পাপ ফুলের নির্মম বিদায়

### জন্ম ও বেড়ে ওঠা

২০১৮ সালের ১৫ জুন, কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার পূর্ব পুরুড়া গ্রামে এক নতুন প্রাণের আগমন ঘটে। গরিব কিন্তু প্রাণবন্ত এক পরিবারে জন্ম নেয় ফুটফুটে এক কন্যাশিশু নাম রাখা হয় রাইফা। জন্মের প্রথম দিন থেকেই যেন পরিবারটিতে নতুন আলো নেমে আসে। তার মা-বাবার ক্লান্ত মুখেও হাসির রেখা ফুটে ওঠে ছোট্ট মেয়েটির নিষ্পাপ মুখ দেখে। পিতা মো: বাবুচান ঢাকার অলিগলিতে ফেরি করে মালামাল বিক্রি করেন। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করে কষ্টের বিনিময়ে যা আয় হয়, তা দিয়েই চলে তাদের দশজনের পরিবারের জীবন। মা সেলিনা খাতুন মেয়ে রাইফাকে কোলে রেখে, কখনো কখনো রাজমিস্ত্রীর যোগালির কাজেও যোগ দিতেন। সংসারের অভাব-অনটনের মাঝেও রাইফার চোখে-মুখে সবসময় ঝলকে পড়ত আনন্দের আলো। রাইফা ছিল এই পরিবারে সবচেয়ে ছোট। নয় ভাইবোনের মধ্যে সে যেন ছিল পরিবারের প্রাণকেন্দ্র। বড় ভাই আজিজুল, দেলওয়ার, রিয়াদ যারা নিজেরা দিনমজুরি কিংবা পোশাক কারখানায় কাজ করে সংসারের হাল ধরেছে, তারাও ছোট বোনের জন্য সময় করে আদর ভালোবাসা বিলিয়ে দিত। কাউসার আর আলিমুন ছিল রাইফার খেলার সাথী, প্রতিদিন দুপুরবেলা উঠানে তাদের খেলাধুলা, হাসাহাসিতে মাতিয়ে রাখত পুরো বাড়ি। আর বড় বোন সুরমা, দিনা, সুবর্ণা তিনজনই বিবাহিত। তবে সাজগোজ, গল্পশোনা আর আদরে যেন তারা ছিল রাইফার সবচেয়ে আপন।

পাড়ার লোকজন জানতেনএই মেয়েটি একদিন অনেক দূর যাবে। তার চঞ্চলতা, কোমলতা আর হৃদয়গ্রাহী হাসি পাড়ার প্রত্যেকের মন জয় করে নিয়েছিল অল্প সময়েই। স্কুলে যাওয়া তখনো শুরু হয়নি তার, তবে প্রতিদিন ভাইদের বইখাতা নিয়ে বসে আঁকিবুঁকি করত। সবাই বলত, "রাইফা অনেক মেধাবী হবে একদিন।" অভাবের মাঝে বেড়ে উঠলেও, তার মনোজগৎ ছিল বিস্ময়ে ভরা, স্বপ্নে জর্জরিত। মায়ের আঁচল ধরে বাজারে যেত, বাবার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা রাস্তার ধারে বসে থাকত এইসব স্মৃতি এখন যেন পরিবারের হৃদয়ে ছুরির মতো বিঁধে থাকে। এই শিশু রাইফা ছিল না শুধুই এক সন্তানসে ছিল বাবার পরিশ্রমের প্রতিদান, মায়ের চোখের মুক্তো, ভাইবোনদের হাসির কারণ। দরিদ্র কিন্তু ভালোবাসায় পূর্ণ একটি পরিবারে, সে ছিল এক অনুপম আশীর্বাদ।

**শহীদ হওয়ার ঘটনা**

২০২৪ সালের  ২০ জুলাই, শুক্রবার। সময়টা ছিল সকাল থেকে দুপুরের মাঝামাঝি। জায়গা তারাবো, বিশ্বরোড, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। চারদিকে থমথমে পরিবেশ, ভয় আর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল প্রতিটি অলিতে-গলিতে। বৈষম্যহীন সমাজ, গরিবের অধিকার, মজুরের ন্যায্য মজুরি, আর রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে ফেটে পড়ে জনসাধারণ। মানুষের বুকে দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ যেন রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে আগুনের মতো। সেদিনের মতো সাধারণ সকাল, কিন্তু রাইফার জন্য তা হয়ে দাঁড়ায় জীবনের শেষ সকাল। মাত্র ছয় বছরের শিশু রাইফা, তার মায়ের হাতে রান্না করা গরম ভাত-ডাল খেয়ে, নিজের স্বভাবসুলভ খেলাধুলার ভেতরেই বেরিয়ে পড়ে ঘরের সামনে। অজান্তেই পৌঁছে যায় বিশ্বরোডের এক পাশে। মানুষজনের ভিড়, স্লোগানের ধ্বনি, আর উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ তাকে কৌতূহলী করে তোলে। শিশু মন তো আর বুঝে না রাজনীতি, আন্দোলন কিংবা দমনপীড়ন। এমন সময় শুরু হয় ভয়াবহ হামলা। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে সশস্ত্র পুলিশ ও সরকারি দলের মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীরা। নির্বিচারে ছুড়তে থাকে এলোপাথাড়ি গুলি। আকাশ-বাতাস কেঁপে ওঠে গুলির শব্দে। মানুষের চিৎকারে রাজপথ যেন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। গুলির লক্ষ্য শুধু বিক্ষোভকারীরা নয়, বরং  যে কাউকে বয়স-লিঙ্গ বিবেচনা ছাড়াই। এভাবেই এক টার্গেটেড গুলি এসে বিদ্ধ করে ছোট্ট রাইফাকে। কোমল শরীরটা মুহূর্তেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তার সাদা জামা ভিজে যায় লাল রক্তে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। চারদিকে তখন কেবল চিৎকার, আতঙ্ক আর স্তব্ধতা। কেউ ভাবতেও পারেনি, শিশুরাও এভাবে গুলিবিদ্ধ হতে পারে! তড়িঘড়ি করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয় রাইফাকে। ডাক্তাররা চেষ্টা করেন সবকিছু স্যালাইন, অক্সিজেন, সেলাই, ইনজেকশন। মা সেলিনা তখন ছুটে চলেছেন কন্যার মাথায় পানি দিয়ে জাগানোর আশায়, বাবা বাবুচান শুধু কান্না করেই যাচ্ছেন, আর বলছেন "আমার মেয়ে চোখ তোলে না কেন!" কিন্তু সব আশার অবসান ঘটে  বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে, যখন চিকিৎসক জানান রাইফা আর বেঁচে নেই। নিথর হয়ে গেছে তার নিষ্পাপ দেহ। সেদিন শুধু একটি শিশু মারা যায়নি একটি পরিবার ভেঙে যায়, সমাজ বিবেকহীনতার চূড়ায় পৌঁছায়, রাষ্ট্র তার মানবিকতা হারায়। এরপর রাইফার নিথর দেহ গ্রামে ফিরিয়ে আনা হয়। যে গ্রামে সে জন্মেছিল, হেঁটেছিল ছোট পা ফেলে, যেখানে ভাইদের সঙ্গে খেলত, মায়ের কোল জুড়ে থাকত সেই গ্রামই তাকে এবার গ্রহণ করে চিরতরে। হাজারো মানুষের কান্নার মাঝে জানাজা হয়। কবরস্থানের মাটিতে যখন তাকে সমাহিত করা হয়, তখন আকাশ ভারী হয়ে ওঠে।

রাইফার ছোট্ট কবরটি যেন আজও প্রশ্ন তোলে- কোন অপরাধে এই শিশুটিকে হত্যা করা হলো? “শিশুর রক্ত দিয়ে কী নির্মাণ করছে এই রাষ্ট্র?” রাইফার কবর শুধু কবর নয়, একটা কালো সময়ের নীরব সাক্ষ্য। ইতিহাসের পাতায় লেখা রইল শিশু রাইফার রক্তাক্ত বিদায়, এক অবর্ণনীয় আওয়ামী নৃশংসতার দলিল।

শহীদ শিশু রাইফা শুধু একটি নাম নয়, বরং একটি কালো দিনের নির্মম চিত্র। তাকে হত্যা করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত দমন-পীড়নের এক কুখ্যাত অধ্যায়ে। তার রক্ত যেন বাংলার স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও মানবিকতা পুনরুদ্ধারের আহ্বান হয়ে বয়ে চলে। একটি রাষ্ট্র তখনই ব্যর্থ হয়, যখন সে নিজের ভবিষ্যৎশিশুদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। রাইফার মৃত্যু আমাদের সেই ব্যর্থতা, সেই অন্যায়ের দলিল। এই হত্যাকাণ্ডের বিচারই হতে পারে ভবিষ্যতের শিশুদের নিরাপত্তার পথ।

**রাইফা না থাকায় প্রতিটি সকাল, প্রতিটি সন্ধ্যা কেটে যায় বিষাদের ছায়ায়**

রাইফা যখন মারা গেল, তখন শুধু একটি শিশুর প্রাণ নিভে যায়নি একটি পরিবারের হাসি, স্বপ্ন, আশ্রয়, বেঁচে থাকার অর্থও যেন চিরতরে মুছে গেল। তার মৃত্যুর পর এক গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় রাইফার পরিবার। যে পরিবার প্রতিদিন হাজার কষ্টের মাঝেও এক শিশুর

হাসিতে প্রাণ পেত, এখন সেখানে শুধু শোক আর স্তব্ধতা। মা সেলিনা খাতুন, যিনি কখনো রাজমিস্ত্রীর যোগালি হয়ে, কখনো ইট-বালুর টুকরি বইয়ে সংসারে সাহায্য করতেন, সেই মা আজ আর কাজে যেতে পারেন না। সকাল হলে বুকের ভেতর ফাঁকা একটা জায়গা ছটফট করতে থাকে যেখানে একসময় রাইফা ছিল। মেয়ের মুখটা ভুলতে পারেন না, তার শেষ হাসিটা, শেষ আদরের ছোঁয়াটা যেন মায়ের সারা শরীরে খচখচ করে। রান্নার সময়, খাওয়ার সময়, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় সবসময়ই যেন কানে বাজে রাইফার ডাকে ওঠা সেই কোমল স্বর। পিতা বাবুচান, যিনি ঢাকার অলিগলিতে ফেরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন, এখন আর ঢাকায় ফিরতে চান না। ঢাকার বাতাসেই যেন মিশে আছে মেয়ের কান্না, পুলিশের গুলির শব্দ, হাসপাতালের করিডোরে মৃত্যুর ঘোষণা। তিনি এখন গ্রামের বাড়িতেই থাকেন, নিঃশব্দে। চুপচাপ বসে থাকেন উঠোনের এক কোণে, যেখানে রাইফা একদিন খেলেছিল, হেসেছিল। সংসারে এখন আয় বলতে প্রায় কিছুই নেই। বাবার ফেরির কাজ বন্ধ, মায়ের হাত চলেও মন চলে না। বড় ছেলে আজিজুল, দেলওয়ার আর রিয়াদ কেউ দিনমজুরি করে, কেউ পোশাক কারখানায় অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করে সামান্য আয় করে সংসার চালানোর চেষ্টা করছে। অনেকদিনই রাতে রান্না হয় না, সকালে যা থাকে তা দিয়েই চলে দিনের হিসাব। কখনো হয়তো পুরো পরিবার একসাথে বসে খেতে পারে না, শুধু অভাবের টানে নয় মন খারাপের ভারে। সুবর্ণা, দিনা, কাউসার আর আলিমুন যারা রাইফার সঙ্গে হাসত, খেলত, ঝগড়া করত, তারা এখন কেবল স্মৃতির জোয়ারে বাঁচে। উঠোনে খেলতে গেলে মনে পড়ে এখানে একদিন রাইফা লুকিয়ে পড়েছিল, কিংবা দাদা-দিদির কোলে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কেউ কেউ রাতে ঘুম ভেঙে উঠে বলে, "রাইফা কোথায়?" এ কথা শুনে পুরো বাড়ি আবার ভারী হয়ে ওঠে কান্নায়। পরিবারের হাসি যেন চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। এক শিশুর মৃত্যুর মাধ্যমে শুধু একটা জীবন নয়, হারিয়ে গেছে দশটা জীবনের শান্তি। রাইফার রক্তে রাঙানো স্মৃতি আজও তাদের সকাল, বিকেল, সন্ধ্যা, রাত সবটা সময় ঢেকে রেখেছে। এই পরিবারের প্রতিটি সদস্য এখন যেন বেঁচে আছেন শুধুই একটি রক্তাক্ত স্মৃতিকে বুকে নিয়ে, রাষ্ট্র আর সমাজের নির্মমতা এবং ন্যায়হীনতার বোঝা মাথায় নিয়ে।

**শহীদ সম্পর্কে প্রতিবেশীদের অনুভূতি**

রাইফার মৃত্যু কেবল তার পরিবারকেই নয়, স্তব্ধ করে দিয়েছিল গোটা পাড়া-প্রতিবেশীকেও। পূর্ব পুরুড়া গ্রামের প্রতিটি মানুষ যেন এক সন্তান হারানোর বেদনায় কাতর হয়ে পড়ে। কেউ বিশ্বাসই করতে পারেনি যে এই নিষ্পাপ, হাসিখুশি, খুনসুটিতে ভরা শিশুটি আর নেই। গ্রামের বাতাস পর্যন্ত ভারী হয়ে উঠেছিল কান্নায়।

**কুতুব মিয়া যিনি রাইফাদের পাশের বাড়িতে থাকেন, জানালেন তার দগ্ধ হৃদয়ের কথা:**

"ছোট্ট শিশু রাইসাকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে আওয়ামী সন্ত্রাস খুনি শেখ হাসিনা জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। এমন নির্মমতা, এমন বর্বরতা আমরা কল্পনাও করিনি। কেবল একটি শিশু যার হাতে ছিল না কোনো অস্ত্র, যার মুখে ছিল না কোনো প্রতিবাদ তার দিকেও যদি গুলি চলে, তাহলে আর কে নিরাপদ? আমি এই শিশু হত্যার কঠোর বিচার চাই। এই রক্তের ঋণ রাষ্ট্রকে শোধ করতেই হবে।"

**আরেক প্রতিবেশী, সবুজ চোখ মুছতে মুছতে বললেন:**

"আমি স্তব্ধ। বাকরুদ্ধ। এতটুকু শিশুর কি অপরাধ ছিল? রাইফা তো শুধু খেলতে গিয়েছিল, সে জানতও না আন্দোলন কী, গুলি কাকে বলে। তাহলে কেন পুলিশ তাকে গুলি করলো? কেমন করে তারা পারলো? এই রাষ্ট্রের কাছে আমরা কী চাইব, যখন সে আমাদের সন্তানদের রক্ষা করতে পারে না? আমি রাইফা হত্যার বিচার চাই। শুধু বিচার নয় এই রক্তের ইতিহাস যেন লিপিবদ্ধ হয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।"

এভাবে প্রতিবেশীরা প্রত্যেকে নিজের মতো করে হারিয়েছেন এক আত্মীয়তাসম শিশুকে। প্রতিটি স্মৃতি, প্রতিটি কথায় রাইফা আজও বেঁচে আছে। তার নিষ্পাপ মুখ যেন ঘুরে বেড়ায় পাড়ার অলিতে-গলিতে। কিন্তু তাদের ভেতরে সবচেয়ে বেশি বারবার উচ্চারিত হচ্ছে একটিই বাক্য "আমরা এই শিশু হত্যার বিচার চাই।" শহীদ শিশু রাইফা শুধু একটি নাম নয়, বরং একটি কালো দিনের নির্মম চিত্র। তাকে হত্যা করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত দমন-পীড়নের এক কুখ্যাত অধ্যায়ে। তার রক্ত যেন বাংলার স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও মানবিকতা পুনরুদ্ধারের আহ্বান হয়ে বয়ে চলে। একটি রাষ্ট্র তখনই ব্যর্থ হয়, যখন সে নিজের ভবিষ্যৎশিশুদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। রাইফার মৃত্যু আমাদের সেই ব্যর্থতা, সেই অন্যায়ের দলিল। এই হত্যাকাণ্ডের বিচারই হতে পারে ভবিষ্যতের শিশুদের নিরাপত্তার পথ।

**এক নজরে অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা**

১. শহীদ রাইফার পরিবারকে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান

২. পিতা-মাতার জন্য মাসিক ভাতা চালু

৩. পরিবারের বসতঘর পুনঃনির্মাণ বা মেরামতের ব্যবস্থা

৪. ছোট ভাইবোনদের শিক্ষাবৃত্তির আয়োজন

৫. বড় ভাইদের কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি

৬. মা সেলিনা খাতুনের জন্য বিকল্প আয়ের উৎস গড়ে তোলা

৭. পরিবারের জন্য সরকারিভাবে খাদ্য সহায়তা ও চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিতকরণ

৮. শহীদের নামে স্থায়ী স্মৃতি সংরক্ষণে সরকারি পদক্ষেপ

৯. বিচার ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে আইনি সহায়তা প্রদান

১০. পরিবারকে নিরাপত্তা ও মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান

## এক নজরে শহীদের প্রোফাইল

| | |
|---|---|
| শহীদের পূর্ণ নাম | : রাইফা |
| জন্ম তারিখ | : ১৫/৬/২০১৮ |
| জন্মস্থান | : কিশোরগঞ্জ |
| স্থায়ী ঠিকানা | : গ্রাম: পূর্ব পুরুড়া, ইউনিয়ন: সহশ্রাম ধূলদিয়া, থানা: কটিয়াদি, জেলা: কিশোরগঞ্জ |
| পিতার নাম | : মো: বাবুচান, বয়স: ৫৩, পেশা: ফেরিওয়ালা, মাসিক আয়: ১০,০০০, |
| মায়ের নাম | : সেলিনা খাতুন, বয়স: ৪২, পেশা: রাজমিস্ত্রীর যোগালি |
| পরিবারের সদস্য | : ১০ জন, পিতা-মাতা, ভাই: ৫ জন, বোন: ৩ জন |
| ভাই বোনদের নাম | : ১. আজিজুল, পেশা: লেবার, বয়স: ২৫, সম্পর্ক: ভাই<br>২. দেলওয়ার, পেশা: পোশাক কারখানার শ্রমিক, বয়স:২১, সম্পর্ক: ভাই<br>৩. রিয়াদ মিয়া, পেশা: রাজমিস্ত্রীর যোগালি, বয়স:১৭, সম্পর্ক: ভাই<br>৪. কাউসার, বয়স:১২, সম্পর্ক: ভাই<br>৫. আলিমুন, বয়স: ৮, সম্পর্ক: ভাই<br>৬. সুরমা, বিবাহিত, সম্পর্ক: বোন<br>৭. দিনা, বিবাহিত, সম্পর্ক: বোন<br>৮. সুবর্ণা, বিবাহিত, সম্পর্ক: বোন |
| ঘটনার স্থান | : তারাবো, বিশ্বরোড, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ |
| আক্রমণকারী | : পুলিশ |
| আক্রমণের ধরণ | : পুলিশের গুলি |
| আহত হওয়ার তারিখ | : ২০/৭/২৪, সময়: ১১:০০টা থেকে ১২:০০টা |
| শহীদ হওয়ার তারিখ | : ২০/৭/২৪, সময়: ৪:৩০ মিনিট |
| শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান | : নিজগ্রাম |

## শহীদ রমজান মিয়া জিবন

ক্রমিক: ৮০০
আইডি: ঢাকা বিভাগ: ১৬২

### জন্ম ও পরিবার

আলোকিত এক নাম রমজান মিয়া জিবন। তার নামের মধ্যেই যেন ছিল ভবিষ্যতের এক পূর্বাভাস। 'রমজান' সংযম, ত্যাগ আর ধৈর্যের প্রতীক; আর 'জিবন' একটি সাদামাটা, অথচ সংগ্রামে ভরা পথচলার প্রতিচ্ছবি। নিজের নামের মতোই তিনি যেন নিজের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ধারণ করেছেন সেই অর্থ ও দায়। জন্মগ্রহণ করেন ১৯৯৮ সালের ১০ অক্টোবর, কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর থানার অন্তর্গত দিলালপুর ইউনিয়নের পাঠানহাটি গ্রামে। রমজান বেড়ে উঠেছেন এক নিঃস্ব, কিন্তু আত্মসম্মানে অটল পরিবারের কোলে। তার পিতা মো: জামাল মিয়া ছিলেন পেশায় দিনমজুর। এক সময় নিজ হাতে জমি চাষ করতেন, অন্যের খেতেও কাজ করতেন অক্লান্ত পরিশ্রমে। কিন্তু সময়ের ভারে নুয়ে পড়া শরীর আর দীর্ঘদিনের অসুস্থতা তাকে কর্মক্ষমতা থেকে ছিটকে দেয়। এখন শুধু চোখে বিস্ময় আর কপালে দুশ্চিন্তা। মাতা আমেনা বেগম নামটি যতই মায়াময় হোক, তার জীবন ছিল কঠোর বাস্তবতায় মোড়া। গৃহিণী হলেও সংসারের প্রতিটি দায়-দায়িত্ব তার মায়া ও মমতার পরিধির মধ্যেই চলত। টিনের চালার নিচে, কুঁকড়ে যাওয়া সেই কুটিরে তিনিই ছিলেন এই দরিদ্র সংসারের প্রধান আশ্রয়। রমজান মিয়ার পড়াশোনার পথ বেশি দূর এগোয়নি। অন্ন-বস্ত্রের চাহিদাই যেখানে প্রধান, সেখানে শিক্ষা ছিল বিলাসিতা। দিলালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাজীবন ছিল তার। অথচ সেই স্কুলজীবনই ছিল তার জন্য এক স্বপ্নের জানালা যেখান থেকে সে পৃথিবীকে একটু ভিন্ন চোখে দেখতে শিখেছিল। কিন্তু ভাগ্য তাকে বেশি সময় দেয়নি। বইয়ের ব্যাগ নামিয়ে, হাতে তুলে নিতে হয় হাল ধরার ভার। দারিদ্র্য ছিল তার প্রতিদিনের সঙ্গী। তবে সে দারিদ্র্যের কাছে মাথা নত করেনি। ছোট থেকেই মায়ের আঁচল ধরে বাজারে যাওয়া, বাবার হাত ধরে জমিতে যাওয়া সবই তাকে বাস্তবতা চিনিয়ে দিয়েছিল। খুব কম বয়সেই বুঝে গিয়েছিল, এই পরিবারকে কেউ ভরসা দেবে না, তাকেই হতে হবে আশ্রয়ের প্রতীক। তাই তো হয়তো তার নামের শেষে যুক্ত হয়েছিল 'জিবন' একটি পরিবারের জীবনরেখা হয়ে ওঠার দায়ভারে।

**কর্মজীবন ও সংসার**

কৈশোরেই জীবনের নির্মম বাস্তবতা বুঝে নিতে হয়েছিল রমজান মিয়া জিবনকে। যখন অন্য কিশোরেরা বইয়ের পাতায় স্বপ্ন আঁকে, তখন তিনি পিঠে গাঁঠরি নিয়ে পাড়ি জমান রাজধানী ঢাকার দিকে একটি কাজ, একটি আশ্রয়, একটি বেঁচে থাকার সুযোগের খোঁজে। ঢাকা শহরের কংক্রিটের জঙ্গলে শুরু হয় তার কঠিন এক সংগ্রাম। এক জুতা কারখানায় শ্রমিক হিসেবে পান অস্থায়ী একটি চাকরি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকে শ্রম দিতে হতো, তীব্র গরমে মেশিনের পাশে কাজ করতে হতো ঘামে ভিজে যাওয়া শরীরে। তবু কোনো অভিযোগ ছিল না তার মুখে, ছিল না কোনো বিরক্তি ছিল শুধু একটা দৃঢ় সংকল্প: পরিবারের মুখে হাসি ফোটানো।

মাত্র ৫০০০ টাকা মাসিক আয় এই সামান্য অর্থ দিয়েই চলতে হতো তার চারজনের সংসার। বৃদ্ধ পিতা মো: জামাল মিয়া, অসুস্থতার কারণে কর্মহীন; মাতা আমেনা বেগম, যিনি শুধু মমতার ছায়া দিতে পারেন, কিন্তু অর্থ উপার্জনে অপারগ; স্ত্রী সাহেরা খাতুন, যার চোখে ছিল স্বপ্ন, কিন্তু হাতে ছিল শুধু সংসারের দায়; আর নবজাতক শিশু মো: আয়ান যার দুধ, ওষুধ, আর এক চিলতে নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল শুধু রমজানের কাঁধে। নিজস্ব কোনো বাড়ি ছিল না। তারা আশ্রয় নিয়েছিল অন্যের টিনের চালা ঘরে অস্থায়ী, অনিশ্চিত, কিন্তু তাতেও ছিল এক ধরনের শান্তি। কারণ সেই ঘরের চৌকাঠের দায়িত্বে ছিল একজন পরিশ্রান্ত তৃপ্ত মানুষ রমজান মিয়া, যার মুখে ছিল ক্লান্তির ছায়া, কিন্তু হৃদয়ে ছিল অটুট ভালোবাসা। স্ত্রী সাহেরা খাতুন ছিলেন মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষিতা, কিন্তু জীবনযুদ্ধে তিনিও গৃহিণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। সংসারের প্রতিটি কোণে তার পরিচর্যা ছিল রমজানের শক্তির জোগান। আর তাদের দাম্পত্য জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ ছিল মো: আয়ান মাত্র পাঁচ মাস বয়সী এক কোমল শিশু, যার মুখের দিকে চেয়ে রমজান বুঝতেন, কেন তাকে এত কষ্ট করতে হয়। সন্তানের হাসিমাখা মুখ তার ক্লান্তি ভোলাতো, ব্যথা ভুলাতো, অনিশ্চয়তা ঢেকে দিতো এক চিলতে ভবিষ্যতের আলোয়।

QRRZ

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Dilalpur
Bajitpur, Kishoreganj
(Rule 11, 12)

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

| Date of Registration | Death Registration Number | Date of Issuance |
|---|---|---|
| 16/10/2024 | 19984810634016983 | 16/10/2024 |

Date of Birth : 10/10/1998 Sex : Male
Date of Death : 09/10/2024
In Word : Ninth of October Two Thousand Twenty Four

| | | | |
|---|---|---|---|
| নাম | : মোঃ রজমান মিয়া জীবন | Name | : Md Ramjan Mia Jibon |
| মাতা | : মোছাঃ আমেনা বেগম | Mother | : Mst Amena Begum |
| মাতার জাতীয়তা | : বাংলাদেশী | Nationality | : Bangladeshi |
| পিতা | : মোঃ জামাল মিয়া | Father | : Md Jamal Mia |
| পিতার জাতীয়তা | : বাংলাদেশী | Nationality | : Bangladeshi |
| মৃত্যুস্থান | : কিশোরগঞ্জ, বাংলাদেশ | Place of Death | : Kishoreganj, Bangladesh |
| মৃত্যুর কারণ | : হত্যা | Cause of Death | : Murder |

17.10.24
Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Md. Matiur Rahman
Administrative Officer
2No. Dilalpur Union Parishad
Bajitpur, Kishoreganj.

Seal & Signature
Registrar
Sazal Miah
Panal Chairman-1
2 No. Dilalpur Union Parishad
Bajitpur, Kishoreganj.

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

রমজান মিয়ার জীবন ছিল শিকড়ের মতো নিচে নেমে অন্ধকারে আটকে থেকেও পুরো বৃক্ষটিকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা। তার শ্রমের বিনিময়ে টিকেছিল একটি পরিবার, টিকেছিল এক শিশুর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। তার ঘামেই ভেজা ছিল সংসারের চালচিত্র, আর তার নিরব আত্মত্যাগেই ফুটে উঠেছিল ভালোবাসার গভীরতা।

**আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও যেভাবে তিনি শহীদ হলেন**

২০২৪ সাল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বেদনাবিধুর অধ্যায়ের নাম। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি, ন্যায্য মজুরির অভাব, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি রাষ্ট্রের উদাসীনতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের প্রতিবাদে যখন সারাদেশের শ্রমিক, ছাত্র এবং সাধারণ মানুষ রাজপথে নেমে আসে, তখন রমজান মিয়াও বসে থাকতে পারেননি। তিনি ছিলেন এক জুতা কারখানার সাধারণ শ্রমিক, কিন্তু বুকের ভেতর পুঞ্জীভূত ছিল হাজারো কষ্টের অনুবাদ, অনুচ্চারিত প্রশ্ন আর

অধিকারবঞ্চনার দীর্ঘশ্বাস। এই আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক কোনো কর্মসূচি ছিল না; এটি ছিল ক্ষুধার্ত পেটের, ন্যায্য মজুরির, নিরাপদ জীবনের জন্য এক আহাজারি। ৫ আগস্ট ২০২৪ তীব্র রোদ, শহরের বাতাসে তখন উত্তেজনার গন্ধ। গুলিস্তানের আলু বাজার মোড়ে শ্রমিকেরা সমবেত হয়েছিলেন শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের দাবি তুলে ধরতে। ব্যানার হাতে, মুখে স্লোগান, হৃদয়ে আশা এই ছিল আন্দোলনের চেহারা। কিন্তু হঠাৎই সেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নেমে আসে আগুনের ছায়া। দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে হঠাৎ করেই খুনি হাসিনার আওয়ামী মদদপুষ্ট পুলিশ দল এসে কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করে। চিৎকার, দৌড়াদৌড়ি, রক্ত, কান্না আর আতঙ্কে মুহূর্তেই পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। রমজান মিয়া তখন সবার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সে কারও গায়ে হাত তোলে না, মুখে কঠিন কথা বলে না তবু সে ছিল এক প্রতিবাদী আত্মা, এক সাহসী শ্রমিক, যে জানতো ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোই বড় দায়িত্ব। কিন্তু রাষ্ট্র তার এই নীরব সাহসকে ক্ষমা করেনি। গুলির শব্দে আকাশ কেঁপে ওঠে, আর সেই শব্দের মধ্যেই রমজান মিয়া পড়ে যান মাটিতে। গুলি বিদ্ধ হয় তার শরীরে, ছিন্নভিন্ন করে দেয় ভবিষ্যতের সমস্ত স্বপ্ন। দ্রুত তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। রাজধানীর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চলে দীর্ঘ ৬৪ দিনের চিকিৎসা। রক্ত, ওষুধ, অক্সিজেন, চোখে জল সব কিছুর পরেও ৯ অক্টোবর ২০২৪, সন্ধ্যা ৭টার দিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর মৃত্যু কোনো সাধারণ মৃত্যু ছিল না। এটি ছিল রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক নীরব আত্মবলিদান। একটি পরিবারের ভরসা, একটি শিশুর বাবার হাত, এক স্ত্রীর স্বপ্ন সব কিছুকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে শহীদ হন রমজান মিয়া জিবন। তার নিথর দেহ যখন নিজগ্রাম দিলালপুরের কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়, তখন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল তাঁর চাচা রুমান মিয়ার কণ্ঠে এক আর্তনাদ "সে ছিল আমার ছেলের মতো। সব সময় হাসত, কখনো ওর মুখে ক্লান্তি দেখিনি। ও ছিল আমাদের আশার আলো। আমাদের জীবনটা এখন অন্ধকার।"

এই অন্ধকার কেবল এক পরিবারের নয়, এটি এক সমাজব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি যেখানে শ্রমিকেরা রাস্তায় পড়ে থাকে রক্তাক্ত

দৈনিক জনকণ্ঠ

চলে গেলেন ৫ আগস্ট আন্দোলনে আহত রমজান

অনলাইন ডেস্ক

হয়ে, আর রাষ্ট্র মুখ ফিরিয়ে নেয়। শহীদ রমজান মিয়া জিবন আমাদের স্মৃতিতে থাকবেন না শুধু একজন শ্রমিক হিসেবে, বরং তিনি হয়ে উঠবেন প্রতিবাদের প্রতীক, ন্যায়ের জন্য লড়াই করা এক সাধারণ মানুষের অনন্ত প্রেরণা।

**নিকটাত্মীয়র বক্তব্য**

শহীদ সম্পর্কে চাচার মন্তব্য: আমি মো: রুমান মিয়া, বয়স: ৪১, পিতা: মৃত শাহেদ আলী মিয়া, মাতা: মোছা: মালেকা বেগম। শহীদ রমজান আমার ছেলের মত। সম্পর্কে সে আমার ভাতিজা, সে খুব ভালো ছেলে ছিল, সব সময় হাসি খুশি থাকতো, কাজ নিয়ে ব্যাস্ত থাকতো। কখনও ওর হাসিমুখ ছাড়া দেখিনি। সে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিল।

**এক নজরে অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা**

১. জরুরি ভিত্তিতে এককালীন অনুদান (খাবার, চিকিৎসা, ভরণপোষণ) দেওয়া যেতে পারে

২. শহীদের পরিবারের জন্য মাসিক ভাতা দেওয়া প্রয়োজন

৩. স্থায়ী বসতঘর নির্মাণে সহায়তা করা যেতে পারে

৪. স্ত্রী সাহেরা খাতুনের জন্য ঘরে বসে উপার্জনের সুযোগ (সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ) দেওয়া যেতে পারে

৫. শহীদের সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানকে আজীবন শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে

## একনজরে শহীদের প্রোফাইল

| | |
|---|---|
| নাম | : রমজান মিয়া জিবন |
| বয়স | : ২৬ |
| জন্ম তারিখ | : ১০/১০/১৯৯৮ |
| পেশা | : জুতা কারখানার শ্রমিক |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : ৫ম শ্রেণি, দিলালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| পিতা | : মো: জামাল মিয়া, বয়স: ৬২, পেশা: দিনমজুর, অসুস্থ |
| মাতা | : আমেনা বেগম, বয়স : ৫৫, গৃহিণী |
| বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা | : গ্রাম: পাঠান হাটি, দিলালপুর, ইউনিয়ন: দিলালপুর, থানা: বাজিতপুর, জেলা: কিশোরগঞ্জ |
| মাসিক আয় | : ৫০০০টাকা |
| আয়ের উৎস | : কৃষি কাজ |
| স্ত্রীর নাম | : সাহেরা খাতুন, বয়স: ২২, পেশা: গৃহিণী, শিক্ষ্যাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক |
| ছেলে | : ১ জন, নাম: মো: আয়ান, বয়স: ৫ মাস |
| | পরিবার এর অর্থনৈতিক অবস্থা: রমজান মিয়া পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন, নিজস্ব সম্পদ নাই, পরিবারটি অন্যের বাড়িতে আশ্রিত অবস্থায় দিনাতিপাত করছে |
| আহত হওয়ার তারিখ | : ৫ আগস্ট ২০২৪, সময়: বিকাল ৩.৩০ মিনিট, স্থান: আলু বাজার, গুলিস্তান, ঢাকা |
| শহীদ হওয়ার তারিখ ও স্থান | : ৯ অক্টোবর ২০২৪, সন্ধ্যা ৭.০০টা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-ঢামেক |
| আক্রমণকারী | : পুলিশ |
| কবর | : নিজগ্রাম, দিলালপুর কেন্দ্রীয় কবরস্থান, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ |

# জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

'২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা' শিরোনামে প্রথম পর্যায়ে ৭১৭ জন শহীদের জীবনবৃত্তান্ত, শাহাদাতের প্রেক্ষাপট ও ঘটনার বিবরণসহ (১ম - ১০ম) খণ্ডে মোট ১০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী দ্বিতীয় পর্যায়ে ৮৩ জন শহীদের তথ্য নিয়ে প্রকাশিত হলো (একাদশ ও দ্বাদশ) এই দুই খণ্ড। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত মোট ১২টি খণ্ডে ৮০০ জন শহীদের জীবনী নিয়ে জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক প্রকাশিত হলো।

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের আরও শহীদদের তথ্য-সংগ্রহ চলমান রয়েছে। তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত, শাহাদাতের প্রেক্ষাপট ও ঘটনা নিয়ে পরবর্তী খন্ড সমূহও প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

শহীদের তথ্য যুক্ত করতে আমাদেরকে মেইল করুন-
julyshahid6@gmail.com

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ
بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত।

আলে ইমরান-১৬৯

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

# ২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

দ্বাদশ খণ্ড

www.julyshohid.com

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী